ফিওদর দস্তয়েভস্কি

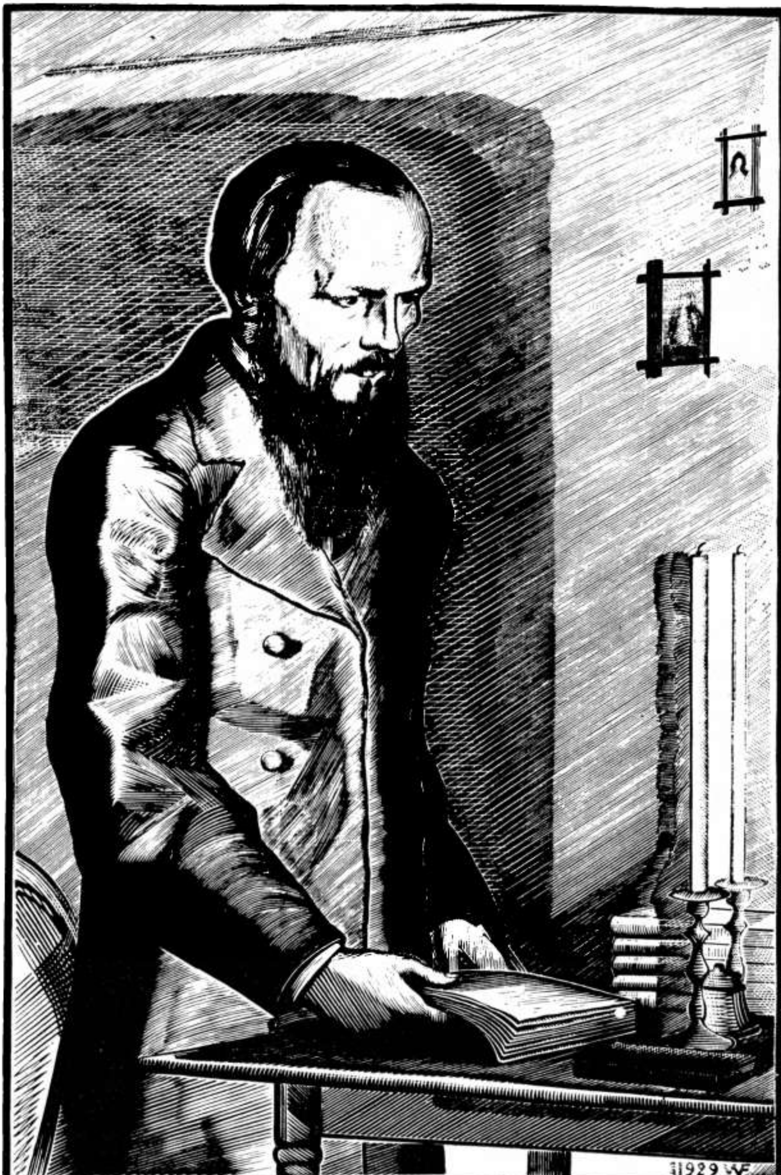


অভাজন

শুক্লা যামিনী

'...আপনারা বলছেন যে দস্তয়েভস্কি তাঁদের নায়কদের মধ্যে নিজেকেই এ'কেছেন, ভেবেছেন সমস্ত লোকই অমনি, কিন্তু তাতে কী! ফল তো হল এই যে ব্যতিক্রমমূলক এইসব চরিত্রে শুধু আমরা, তাঁর স্বজনেরাই নই, বিদেশীরাও চিনতে পারেন নিজেদের, তাঁদেরও আত্মাকে।'

লেভ তলস্তয়


1929 WF

ফিওদর দস্তয়েভস্কি

অভাজন

শুক্লা যামিনী

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: **ননী ভৌমিক**

অঙ্গসজ্জা: **দ্‌মিত্রি ওর্লোভ**

Ф. М. Достоевский

БЕДНЫЕ ЛЮДИ

БЕЛЫЕ НОЧИ

На языке бенгали

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন

১৭, জুবোভস্কি বুলভার

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

© বাংলা অনুবাদ · অবতরণিকা · প্রগতি প্রকাশন · মস্কো · ১৯৮১

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

Д $\frac{70301-356}{014(01)-81}$ 647—80   4702010000

সূচি

অবতরণিকা

মহান রুশ ঔপন্যাসিক 'অভাজন' আর 'শুক্লা যামিনী' লেখেন তাঁর সাহিত্যকর্মের একেবারে শুরুতেই, ১৮৪০-এর দশকে। তাঁর পিটারবুর্গ জীবনের প্রথম দিককার বছরগুলোর কথা স্মরণ করে, যখন তিনি একা একা চিন্তায় ডুবে গিয়ে তাঁর কাছে রহস্যময়, প্রহেলিকাচ্ছন্ন শহরটার পথে পথে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতেন, পথচারীদের মুখে চেয়ে দেখতেন, তার উল্লেখ করে দস্তয়েভস্কি নিজেই বলেছেন কেমন করে এইসব রচনার কথা মনে এসেছিল। তরুণ স্বপ্নজীবী ('আর আমি তখন ছিলাম উদগ্র স্বপ্নজীবী' — নিজের সম্পর্কে বলেছেন তিনি) একদিন কুয়াশাবৃত পিটারবুর্গ সন্ধ্যায় শহরটা দেখতে দেখতে, আর ঐসব কালো কালো, তেলচিটে বাড়িগুলোর ভেতরে কী ঘটছে তা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ গভীরভাবে অনুভব করলেন নিষ্করুণ রুশ বাস্তবতায় পিষ্ট, সৎ দরিদ্র লোকেদের ট্র্যাজেডি। এইভাবেই দেখা দেয় 'অভাজন' উপন্যাস আর 'স্বপ্নজীবিতা' নিয়ে তাঁর তরুণ কল্পনা ও ভাবনা উথলে পড়ে 'শুক্লা যামিনী'তে, যা রুশ সাহিত্যে অতি কাব্যময়, লিখন পারিপাট্যে অতি সুচারু একটি রচনা।

'অভাজন' দস্তয়েভস্কির প্রথম রচনা। ১৮৪৫ সালের বসন্তে এটি তিনি পড়ে শোনান তাঁর বন্ধু, ব্যক্তিগতভাবে তখন তাঁর কাছে একমাত্র পরিচিত তরুণ লেখক দ্মিত্রি গ্রিগরোভিচকে। উচ্ছ্বসিত গ্রিগরোভিচ পাণ্ডুলিপি নিয়ে যান ভবিষ্যতের মহান রুশ কবি নিকোলাই নেক্রাসভের কাছে, তিনিও তখন তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করছিলেন, ভাবছিলেন 'পিটারবুর্গ সংকলন' নামে একটি সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশের কথা। দুজনে

মিলে, অনেক স্থলে প্রায় কেঁদে ফেলে তাঁরা পড়েন দস্তয়েভস্কির পাণ্ডুলিপি এবং ১৮৪৫ সালের পিটারবুর্গের নিরন্ধকার রাত্রিতে, প্রায় সারা রাত যখন আঁধার হয় না, তখন ভোর চারটেয় তাঁরা লেখককে জাগিয়ে তুলে চিৎকার করে ওঠেন, এ যে স্বপ্নেরও অধিক। সেই সকালেই নেক্রাসভ পাণ্ডুলিপি তুলে দেন মহান রুশ সমালোচক ভিস্‌সারিওন বেলিনস্কির হাতে। উনি অবিলম্বে লেখকের সঙ্গে পরিচিত হতে চান। বলেন, 'পঁচিশ বছর বয়সে এমন জিনিস লিখতে পারেন কেবল প্রতিভাধর...'

বহু বছর পরে বেলিনস্কির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা প্রসঙ্গে দস্তয়েভস্কি বলেছেন: 'আমার গোটা জীবনের মধ্যে সে এক উল্লসিত মুহূর্ত।' সমালোচক দস্তয়েভস্কিকে বলেন যে তাঁর বিপুল ভবিষ্যৎ আছে সাহিত্যে। 'শিল্পীর কাছে সত্য যেভাবে উদ্‌ঘাটিত ও সমুন্নত, সেটা আপনার এসে গেছে বর হিশেবে, এ বরটায় মূল্য দিন, বিশ্বস্ত থাকুন তার প্রতি, তাহলে মহৎ লেখক হবেন।'

'পিটারবুর্গ সংকলন' প্রকাশিত হয় ১৮৪৬ সালে। সংকলনের গোড়াতেই নেক্রাসভ দেন দস্তয়েভস্কির 'অভাজন' উপন্যাস। তবে সেটা মুদ্রিত হবার আগেই অসাধারণ লেখক হিশেবে দস্তয়েভস্কি সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু হয়ে যায় পিটারবুর্গে।

'অভাজন' পত্রাকারে উপন্যাস। এধরনের প্রকাশভঙ্গি ইউরোপীয় সাহিত্যে তখন নতুন কিছু নয় (তরুণ গ্যেটে, রুসো, জান্দের উপন্যাস...)। কিন্তু আগে তেমন লেখায় দেখা দিতে পারত কেবল 'মহৎ' নায়কেরা। কিন্তু দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাস ধরে পত্রবিনিময় করেছে যৌবনোত্তীর্ণ, অসুন্দর, অর্ধনিঃস্ব কেরানি মাকার দেভুশকিন আর দরিদ্র তরুণী, কিন্তু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে আসা ভারেঙ্কা দব্রসিওলভা। দস্তয়েভস্কির প্রথম উপন্যাসের বিষয়বস্তুটিও নতুন নয়। দরিদ্র, অসহায়, উপহাস আর হেনস্থার পাত্র কর্মচারীদের নিয়ে দস্তয়েভস্কির পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িকেরা অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু তাদের থেকে দস্তয়েভস্কির ভীরু কেরানির পার্থক্য এই যে দুনিয়ার অন্যায় আর কঠোরতায় ক্ষুব্ধ হয়ে সে 'স্বাধীন চিন্তা' প্রকাশের স্পর্ধা করে। স্পষ্টতই পিটারবুর্গের যেখানে ধনীদের পাড়া আর যেসব কোণেকানাচে ডেরা নেয় গরিবেরা তার বৈপরীত্য অনুভব করে সে বলে, 'কেন এমন হয় যে ভালো

মানুষটা পড়ে রইল অবহেলায় অথচ না চাইতে সৌভাগ্য এসে হাজির হচ্ছে অন্য কারো কাছে?' গরোখোভায়া রাস্তায় এসে ফলাও সব দোকানপাট আর বড়োলোকদের গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কী 'স্বাধীন চিন্তাই' না সে পাঠায় ভারেঙ্কার কাছে! দস্তয়েভস্কির নায়কের জীর্ণ ওভার কোটের নিচে স্পন্দিত হয় একটা মানুষের হৃদয়, যে তার করুণ, দীনহীন, অনালোকিত অস্তিত্বেও তার মানবিক মর্যাদা রক্ষা করতে, নিজের গর্ব ও স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম। সমসাময়িকেরা যে 'অভাজন'কে রুশ সাহিত্যের প্রথম সমাজসচেতন উপন্যাস বলেছেন সেটা অকারণে নয়। দস্তয়েভস্কির প্রথম উপন্যাসের অভিনবত্ব ও মৌলিকতা এইখানে যে তিনি অসীম প্রগাঢ়তায় উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছিলেন দরিদ্র, 'ক্ষুদ্র' মানুষদের অন্তর্জগৎ, তাদের স্বভাবগত মহনীয়তা আর শালীনতা, সবকিছু দুর্বিপাকে অপরের ভাগ্যে, প্রকৃতি ও কবিতার সৌন্দর্যে অন্ধ-বধির হয়ে না থাকতে পারার সামর্থ্য।

দীন লোকেদের সুখের, শ্রদ্ধা পাবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে দস্তয়েভস্কির উপন্যাস। 'অনেকেই ভাবতে পারেন যে দেভুশকিনের চরিত্রে লেখক আঁকতে চেয়েছেন এমন একজন লোককে যার বুদ্ধি ও সামর্থ্য দলিত-পিষ্ট, ভোঁতা হয়ে গেছে জীবনে। এর চেয়ে বড়ো ভুল কী আর হতে পারে। লেখকের ভাবনা অনেক সুগভীর ও মানবিক। মাকার আলেক্সেয়েভিচের চরিত্র দিয়ে তিনি আমাদের দেখিয়েছেন কতকিছু অপরূপ মহনীয় রয়েছে অতি সীমাবদ্ধ মানবিক প্রকৃতিতে,' 'পিটারবুর্গ সংকলনের' সমালোচনায় লিখেছিলেন বেলিনস্কি।

পিটারবুর্গের যেসব রাস্তা দিয়ে হেঁটেছিল মাকার দেভুশকিন, সেখান দিয়েই চলেছে দস্তয়েভস্কির ভিন্নতর নায়ক, 'শুক্লা যামিনী'র সুশিক্ষিত অফিস-কর্মচারী। সেও থাকে পিটারবুর্গের কোনো একটা 'দূরান্ত কোণে'। ঘটনাস্থল পিটারবুর্গের নিরন্ধকার রাত্রির ক্যানেল-তীরে, যেখানে দৈবাৎ তার সঙ্গে অপরিচিতা তরুণী নাস্তেনকার দেখা।

বইটির নায়ক স্বপ্নজীবী। জীবনের ক্লিষ্ট পরিস্থিতি থেকে, তার গদ্যাস্তিমিত মামুলী বাস্তবতা থেকে এই ছোটো মানুষটা আশ্রয় খোঁজে 'স্বপ্ন কল্পনার রাজ্যে', কল্পিত এক অপরূপ জগতে।

কিন্তু 'শুক্লা যামিনী'র জীবন থেকে পরিত্যক্ত নায়ক নিজেকে কখনো

কল্পনা করে উপন্যাসের বীরব্রতীদের ভূমিকায়, কখনো বা ভাবে সে বীর্যবান। এটা তার কাছে অভিশপ্ত নিষ্করুণ বাস্তবতার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ। কিন্তু তার পুঁথিগত সমস্ত স্বপ্নই ছত্রখান হয়ে পড়ে জীবনের সামনে। চারটি শুক্লা যামিনী সে বর পায় ভাগ্যের কাছে — নাস্তেনকার সঙ্গে দেখা, একান্ত সে পার্থিব বালিকা, কিন্তু নিজের সুখ সে জিনে নিতে পারল না। আলোয় ভরা যাদুময় শুক্লা যামিনীগুলির পর দেখা দেয় নিরানন্দ বাদল দিনের প্রভাত।

এ আখ্যানে অধ্যায় নেই, আছে রাত্রি: প্রথম, দ্বিতীয়, ইত্যাদি — সেটা অকারণে নয়। স্বচ্ছ রাত আর ছায়াময় কুয়াশার পিটারবুর্গ নিজেই এ রচনার একধরনের চরিত্র (দস্তয়েভস্কির পরবর্তী 'পিটারবুর্গ' উপন্যাসগুলিতেও তাই দেখা যাবে)।

এ রচনার সবকিছুতেই শুক্লা যামিনী বিছিয়ে দেয় একটা কোমল, করুণ, কিছু বা ছায়াময় কাব্যময়তা, তার আবেশে দৈনন্দিন বাস্তবতার সবকিছুকেই মনে হয় রোম্যান্টিক, সমুন্নত। সকরুণ, মনোভারপ্রপীড়িত কিন্তু আশ্চর্য উজ্জ্বল এই 'শুক্লা যামিনী' দস্তয়েভস্কি প্রথম প্রকাশ করেন ১৮৪৮ সালের ডিসেম্বরে, 'স্বদেশের কড়চা' পত্রিকায়।

সেসময় দস্তয়েভস্কি ছিলেন ৪০-এর দশকের মুক্তি আন্দোলনের বিখ্যাত কর্মী ম. ভ. পেত্রাশেভস্কিকে ঘিরে তরুণ চক্রের একজন শরিক, এখানে আলোচিত হত ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের রচনা, ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা, উত্তেজিত বিতর্ক চলত রুশ বাস্তবতা নিয়ে। 'কল্পনা ও বাস্তব' ছিল তখনকার একটা জরুরি সমস্যা।

নিজের কাব্যধর্মী এই রচনাটি দস্তয়েভস্কি তখন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর পেত্রাশেভস্কিপন্থী কবি-বন্ধু আ. ন. প্লেশ্চেয়েভের নামে, এঁর সঙ্গেই তিনি ১৮৪৯ সালের ডিসেম্বরে পেত্রাশেভস্কি চক্রের অংশীদের সঙ্গে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন মৃত্যুদণ্ডের প্রতীক্ষায়। চূড়ান্ত দণ্ডাদেশে গুলি করে বধ করার বদলে রায় হল কয়েদ-খাটুনি আর নির্বাসন। প্রায় দশ বছর দস্তয়েভস্কি কলম ধরেন নি। সাইবেরিয়া থেকে ফিরে ১৮৬১ সালে যখন তিনি তাঁর প্রথম বৃহৎ উপন্যাস 'বঞ্চিত লাঞ্ছিত' রচনা করলেন, সমসাময়িকেরা টের পেলেন যে তাঁর সৃষ্টিকর্মে 'অভাজনের' মূল প্রসঙ্গ ও চিত্রকল্পের সৃজনী উৎস মোটেই ফুরিয়ে যায় নি। মানববাদী

সাহিত্যিকের প্রধান দিকটায় রয়ে গেছে আগের মতোই 'মানুষের জন্যে বেদনা'। 'হাস্যকর মানুষের স্বপ্ন' নামক গল্পে দস্তয়েভস্কি তাঁর জনৈক স্বপ্নজীবীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন কী তাঁর নিজেরই সৃজনকর্মের প্রেরণা: 'আমি জানি যে লোকে হতে পারে অনুরূপ আর সুখী...'

গালিনা কগান

অভাজন

উহ্, জ্বালালে ওই কাহিনীকারগুলো! বেশ হিতকর, প্রীতিকর, উপাদেয় গোছের কিছু লিখবে, তা না, কেবল হাটে হাঁড়ি ভাঙবে!.. আমি হলে লেখা ওদের একেবারেই নিষিদ্ধ করে দিতাম! দেখুন-না কী দাঁড়াচ্ছে: লেখা পড়লেই ভাবনা না করে তো থাকা যাবে না — আর যত আজেবাজে জিনিস এসে ঢুকবে মগজে। সত্যি লেখা বন্ধ করে দিতে হয়, স্রেফ নিষিদ্ধ করে দেওয়া!

প্রিন্স ভ. ফ. ওদোয়েভস্কি

৮ই এপ্রিল

আদরের ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

কাল রাতে কী আনন্দই না হয়েছিল, কী অসম্ভব আনন্দ! জীবনে এই প্রথম, একগুঁয়ে মেয়ে, আমার কথামতো কাজ করলেন। ঘুম ভেঙেছিল সন্ধ্যে আটটায়, (জানেনই তো, চাকরির পর ঘণ্টা দুই গড়িয়ে নেওয়া আমার অভ্যেস) মোমবাতি এনে, কাগজপত্র গুছিয়ে খাগের কলমটা কাটছি, হঠাৎ এমনি মুখ তুলে তাকাতেই — ওহ্ এমন ধ্বক করে উঠল বুকখানা! তাহলে আপনি বুঝেছেন আমি কী চাইছিলাম, কী চাইছিল আমার মন! যা বলেছিলাম দেখি ঠিক তেমনি করে আপনার জানলার পর্দার কোণটি বালসাম ফুলের টবের সঙ্গে বাঁধা। এমনকি এও মনে হল যেন আপনার ছোট্ট মুখখানা জানলায় ঝলক দিয়ে গেল, আপনি যেন আপনার ঘর থেকে আমায় চেয়ে দেখছেন, আমার কথা ভাবছেন। আর আপনার সেই আদরের মুখখানাকে স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলাম না বলে কী কষ্টই না হচ্ছিল! কী আর বলব, এককালে আমিও সবকিছুই পরিষ্কার দেখতে পেতাম। বার্ধক্যের বড়ো জ্বালা গো। এখন সবকিছুই চোখে কেমন ঝাপসা দেখায়। তাছাড়া সন্ধ্যেয় একটুখানি কাজ করলাম, লিখলাম তো অমনি সকালে চোখ এমন লাল হয়ে উঠবে, জল ঝরতে থাকবে যে বাইরের লোকের কাছে সে মূর্তি দেখাতে লজ্জা করে। তবে কল্পনায় মন আমার আলো হয়ে উঠেছিল আপনার হাসিতে। কী মিষ্টি সেই হাসি! আপনাকে যখন প্রথম চুমু খেয়েছিলাম, মনে আছে আমার — ঠিক তেমনি লাগছিল

দেবী আমার, মনে আছে তো? আর জানেন আমার এমনকি এও মনে হল যেন আঙুল তুলে আমায় শাসাচ্ছেন। সত্যি নাকি, দুষ্টুটা? চিঠিতে সবটা অবিশ্যি-অবিশ্যি খুঁটিয়ে জানাবেন।

আর ঐ পর্দার ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের কায়দাটুকু কেমন লাগল? চমৎকার, তাই না? কাজই করি, কি শুতেই যাই, কি জেগেই উঠি, ওটা দেখলেই আমার জানা থাকবে যে ওখানে বসে বসে আমার কথাই আপনি ভাবছেন, আমাকে মনে পড়ছে আপনার, আর কুশলেই আছেন। পর্দা নামিয়ে দিলে তার মানে হবে: 'শুভরাত্রি, মাকার আলেক্সেয়েভিচ, এখন ঘুমাতে হয়!' আর পর্দা তুলে দেওয়ার মানে: 'সুপ্রভাত, মাকার আলেক্সেয়েভিচ, ভালো ঘুম হয়েছে তো!' কিংবা 'কেমন আছেন, মাকার আলেক্সেয়েভিচ? আমার কথা যদি ধরেন, তা ঈশ্বরের কৃপায়, আমি ভালোই আছি।' দেখছেন, কেমন মাথা খাটিয়ে বার করা? চিঠিপত্র লেখারও তেমন দরকার হবে না! বেশ একটা কৌশল, তাই না? আর ভেবে ভেবে বার তো করলাম আমিই! এসব জিনিস আমার আসে ভালো, তাই না?

এরপর, আমার আদরের রানী ভারভারা আলেক্সেয়েভনা, আপনাকে জানাই যে কাল রাত্রে আশাতীত ভালো ঘুম হয়েছে। তাতে আমি খুব খুশি। যদিও নতুন ফ্ল্যাটে গৃহপ্রবেশ-টবেশের ঝামেলায় সাধারণত ঘুম আসে না। কিছু না কিছু একটা গড়বড় হবেই। কিন্তু সকালে আমি ঘুম ভেঙে উঠেছি একেবারে যেন আকাশের পাখির মতো, ফুর্তি-ফুর্তি ভাব নিয়ে। আর কী সুন্দরই না আজকের সকালটা! আমাদের এখানে জানলা খুলে দিয়েছে, সূর্য উঠেছে, পাখিরা গাইছে, বাতাসে বসন্তের সুবাস, গোটা প্রকৃতি সজীব হয়ে উঠছে, মানে — সবকিছুই বেশ মানানসই — বসন্তে যা হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি। আজ এমনকি কিছু সুখের স্বপ্নেও মন ভাসিয়েছিলাম ভারেঙ্কা, আর সেসবই তো আপনাকে নিয়ে। মনে মনে আপনার তুলনা করছিলাম আকাশের এক ছোট্টো পাখির সঙ্গে — প্রকৃতির শোভা আর মানুষের আনন্দের জন্যে সে পাখির সৃষ্টি। তখন মনে হল ভারেঙ্কা, দুঃখ-কষ্ট চিন্তাভাবনা নিয়ে আমরা যারা থাকি, সেই মানুষদের তো আকাশের ঐ পাখিগুলোর নিশ্চিন্ত নিরীহ সুখকে হিংসাই করাই উচিত। মানে, আর বাদবাকি সব চলল এমনি ধারায় — মানে, এইসব দূর-দূরান্ত তুলনা করছিলাম আর-কি। আমার কাছে একটা

বই আছে ভারেঙ্কা, তাতেও এই ধরনের সব নানা কথা আছে, আর আছেও বেশ বিস্তারিত করে। কত রকমের যে নানা স্বপ্ন আমার মনে আসে, ভারেঙ্কা, সেইজন্যেই তো লিখছি। আর এখন তো বসন্তকাল, তাই ভাবনাগুলো আমার ভারি মনোরম, জ্বলজ্বলে, স্বপ্নগুলো স্নিগ্ধ, গোলাপী রঙে রাঙা। সেইজন্যেই এইসব আমি লিখছি। অবিশ্যি, এসব আমি নিয়েছি বইটা থেকে। লেখক সেখানে মনের এই বাসনা প্রকাশ করে কবিতায়:

কেন আমি নই পাখি হে, শিকারী পাখি!

এমনি ধারা কত কি! আরো নানা কথাও তাতে আছে, কিন্তু যাক গে সেসব! বরং বলুন, আজ সকালে কোথায় গিয়েছিলেন ভারভারা আলেক্সেয়েভনা? আপনি যখন ভারি খুশি হয়ে ঘর থেকে বসন্ত-প্রজাপতিটির মতো ফুরুত করে বেরোলেন তখনো আমি চাকরিতে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে উঠতে পারি নি। আপনাকে দেখেও আমার কী সুখ! সত্যি ভারেঙ্কা, ভারেঙ্কা আমার, দুঃখু করবেন না। কেঁদে কি লাভ বলুন। এটা আমি জানি গো, অভিজ্ঞতা থেকে এ আমার জানা। তাছাড়া, এখন তো আপনি শান্তিতেই আছেন, শরীরও খানিকটা ভালো। তা আপনার ফেদোরা কেমন আছে? ভারি ভালো মেয়েটি! চিঠিতে লিখে জানাবেন ভারেংকা, কেমন চলছে আপনাদের দুজনে। সবকিছুতেই আপনি খুশি তো? ফেদোরা একটু বকবক করে বটে, কিন্তু সেটা গায়ে মাখবেন না। ভগবান দেখবেন! ভারি ভালো মেয়ে ও!

আমাদের এখানকার তেরেসা সম্পর্কে আগেই লিখেছি — এ মেয়েটাও বেশ বিশ্বাসী, দয়ামায়া আছে। চিঠিপত্র কেমন করে দেওয়া নেওয়া করব ভেবে কী ভাবনাই না হয়েছিল! কিন্তু ভগবান ভাগ্যক্রমে তেরেসাকে পাঠিয়েছেন। মেয়েটি নম্র, দয়াধর্ম আছে, মুখে রা নেই, কিন্তু আমাদের বাড়িউলী বড়ো নির্দয়, মেয়েটিকে খাটিয়ে খাটিয়ে মারে।

কী বস্তিতেই যে এসে পড়েছি গো আমার, ভারি বিচ্ছিরি আমার ফ্ল্যাট! আগে ছিলাম একেবারে নিরিবিলিতে — জানেনই তো, শান্ত, চুপচাপ, মাছিটা উড়লেও তার শব্দ কানে আসত। আর এখানে কেবলি গোলমাল, চিৎকার, হৈচৈ। কিন্তু জায়গাটা কেমন তা আপনাকে এখনো

জানাই নি। মনে মনে ভেবে নিন — মোটের ওপর একটা লম্বা বারান্দা, বেদম অন্ধকার আর নোংরা। ডান দিকে বন্ধ দেয়াল। বাঁ দিকে সারি সারি দরজা, ঠিক হোটেলের মতো, এক একটা ঘর একজন দুজন এমনকি তিন তিনজনেও ভাড়া নিয়ে আছে। সবকিছুই এলোমেলো, গন্ডগোলে — একেবারে নোয়ার নৌকো একখানা! তবে মনে হয় লোকগুলো ভালোই— শিক্ষাদীক্ষা আছে। এদের একজন হল রাজকর্মচারী (সাহিত্যের সঙ্গেও কেমন একটা সংস্রব আছে), বেশ পড়াশুনো আছে লোকটার: হোমার, ব্রামবেউস এবং আরো নানা লেখকের কথা বলে, সবার কথাই বলে। বুদ্ধিমান লোক! তাছাড়া আছে দুজন সামরিক অফিসার — সবসময়েই তারা তাস খেলে। একটি নৌবাহিনীর অফিসারও আছে এবং আছে একটি ইংরাজি শিক্ষক। কিন্তু সেসব পরের চিঠিতে। আপনাকে খুশি করার জন্যে ওদের কথা বলব একটু ব্যঙ্গ করে, মানে ওরা ঠিক যা তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে। আমাদের বাড়িউলী হলেন বেশ ছোটোখাটো দেখতে নোংরা গোছের এক বুড়ি; সারা দিন ঘোরেন ড্রেসিং গাউন আর শ্লিপার পরে এবং সারা দিন ধরে তম্বি করেন তেরেসার ওপর। আমি থাকি রান্নাঘরে, মানে সঠিক ব্যাপারটা হল এই: রান্নাঘরের ঠিক লাগোয়া একটা ঘর আছে (তবে আপনাকে বলা উচিত আমাদের রান্নাঘরখানা কিন্তু ভারি সুন্দর, ঝকঝকে, তকতকে), ঘরখানা বড়ো নয়, নিতান্ত সাদামাটা একটা ঘর... অথবা বরং এইভাবে বলা ভালো, রান্নাঘরখানা বড়োসড়ো, তিনটে জানলা। সেটাকে আড়াআড়ি পার্টিশন করে আর একটা ঘর তৈরি করা হয়েছে, বাড়তি এক জনের বাস করার মতো। বেশ বড়োসড়ো, আরামদায়ক, জানলাও আছে, মোট কথা বেশ আরামদায়ক। এইখানেই আমি থাকি। তবে ভাববেন না গো যে আমার কথার কোন একটা উহ্য অর্থ আছে, ভাববেন না যে ওটা রান্নাঘরই! মানে পার্টিশনের ওপাশে এই ঘরেই আমি থাকি বটে, কিন্তু সেটা কিছু নয়। আমি আমার নিজের মতো চুপচাপ একদম একা থাকি। পেতেছি একটা খাট, টেবিল, দেরাজওয়ালা সিন্দুক আর দুটি চেয়ার। একটি দেবপটও টাঙিয়ে নিয়েছি। অবিশ্যি আমার চেয়ে ভালো ঘরও আছে সত্যি, অনেক ভালো ঘরই হয়ত আছে, কিন্তু আসল কথা হল সুবিধা। এসবই তো আমার সুবিধার জন্যে, অন্যকিছুর জন্যে তা ভাববেন না। তাছাড়া আপনার জানলাটা ঠিক

আমাদের আঙিনার ওপারেই। আঙিনাটাও সরু, তাই আপনার যাওয়া আমি মাঝে মাঝে দেখতে পাই—দীনহীন লোক আমি, আমার কাছে সেটা একটা আনন্দ। তাছাড়া এটা সস্তাও বটে! খাওয়া সমেত এখানকার সবচেয়ে দামী ঘরের ভাড়া পঁয়ত্রিশ রুবল—ও টাকা আমার সাধ্যের বাইরে! আমার এ ঘরখানায় পড়ে সাত রুবল, খাওয়া নিয়ে সাড়ে চব্বিশ, অথচ আগে আমার খরচা হত পুরো তিরিশ, ফলে অনেক কিছুই ছাঁটাই করতে হত আমাকে। আগে সবদিন চা খাওয়া সম্ভব হত না, এখন চা চিনি দুটোই জোগাবার মতো পয়সা আমি বাঁচাতে পারি। কী জানেন ভারেংকা, চা খাব না, সেটা কেমন যেন লজ্জার ব্যাপার। এখানকার সবাই বেশ সম্পন্ন, তাই লজ্জা করে। অন্য লোকের কথা ভেবেই চা খেতে হয় ভারেংকা; ঠাট রাখতে, ভদ্রতা করে আর-কি! নইলে আমি পরোয়া করতাম না, অত খুঁতখুঁতি আমার নেই। এর ওপর পকেট খরচা হিশেবে যদি কিছু রাখতে হয়, মানে পোশাকটা কি জামাটা জুতোটার জন্যে, তাহলে কত আর থাকে। পুরো মাইনেটাই খতম। আমি তো আর কাঁদুনি গাই না, তুষ্টই আছি, মাইনেটা তো যথেষ্টই, বেশ কয়েক বছর ধরে চলে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে বোনাসও পেয়েছি। এবার তাহলে, বিদায় রানী আমার। বালজাম আর জিরেনিয়েম ফুলের টব কিনেছি দুটো — বেশি দাম নয়। নাকি আপনার পছন্দ মিগনিয়োনেত? তা মিগনিয়োনেতও আছে, আর শুনুন, যতটা পারেন বিস্তারিত করে লিখবেন। তাছাড়া আমার জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না, এরকম একটা ঘর ভাড়া নিয়েছি বলে কোনো রকম সন্দেহ করবেন না আমায়। না, না, এটা শুধু সুবিধের তাগিদে, ওই সুবিধের লোভে। আমি যে টাকা বাঁচাচ্ছি গো, জমাচ্ছি। টাকা আমার হচ্ছে। ভাববেন না যে আমি এতই সামান্য যে একটা মাছিও বুঝি ডানা ঝেড়ে আমায় উল্টে ফেলে দিতে পারে। না গো না, নিজের ব্যাপারে আমি ঠিকই আছি। দৃঢ়চেতা নিশ্চিন্ত লোকের মতোই আমার চরিত্র। বিদায়, তাহলে বিদায় আমার আদরের দেবী, দেখছি প্রায় পুরো দুই পাতা আমি লিখে ফেলেছি অথচ কাজে যাবার সময় হয়ে গেছে অনেকখন। আপনার ছোট্টো আঙুলগুলোয় আমার চুমু।

আপনার অধম ভৃত্য ও অকৃত্রিম সুহৃদ

মাকার দেভুশকিন

পুঃ, শুধু একটা মিনতি, যতটা সম্ভব বেশি করে লিখবেন। এক পাউন্ড মিষ্টি পাঠালাম ভারেংকা, তৃপ্তি করে খাবেন এবং ঈশ্বরের দোহাই, আমার সম্পর্কে কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না, অনুযোগ করবেন না। পুনরপি বিদায়।

৮ই এপ্রিল

করুণাময় মান্যবর মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

আপনার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ঝগড়া করতে হবে দেখছি। ওগো ভালো মানুষ, বলছি মাকার আলেক্সেয়েভিচ, আপনাকে দিব্যি দিয়ে বলছি আপনার উপহার নেওয়া আমার কাছে কষ্টকরই। উপহার দিতে গিয়ে যে দাম দিতে হচ্ছে, যে কষ্ট আর আত্মকৃচ্ছ্রতা সইতে হচ্ছে তা তো জানি। কতবার না আপনাকে বলেছি, আমার কিছু চাই না, কিছুটি না? এতদিন আপনি আমার যে উপকার করেছেন তা পরিশোধ করার সাধ্যি আমার নেই। ফুলের টব আমার কী দরকার? বালজাম হলেও নয় হত, কিন্তু ঐ জিরেনিয়েমগুলো আবার কেন? মুখ থেকে অসাবধানে কোনো একটা কথা খসলেই আপনি ছুটবেন সেটা কিনতে — যেমন এই জিরেনিয়েমের বেলায়। নিশ্চয় বেশ দাম দিতে হয়েছে? ফুলগুলো কিন্তু কী সুন্দর, ছোটো ছোটো লালচে ক্রুশ! কোথায় পেলেন এমন চমৎকার জিরেনিয়েম? জানলার মাঝখানে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো জায়গায় ওগুলোকে রেখেছি। মেঝের ওপর একটা বেঞ্চি দিয়ে দেব, বেঞ্চির ওপরে রাখব আরো ফুল — দাঁড়ান-না, আর একটু পয়সা জমুক আগে! ফুলগুলো দেখে দেখে ফেদোরার যেন আর আশ মেটে না। আমাদের ঘরখানা এখন স্বর্গ — ঝকঝকে তকতকে! কিন্তু মিষ্টিগুলো কেন? সত্যি আপনার চিঠি পেয়েই আন্দাজ করলাম কিছু একটা গোলমাল হয়েছে — স্বর্গ আর বসন্ত আর সৌরভ ছড়াচ্ছে আর পাখি ডাকছে। মনে হল, একটু কবিতা-টবিতাও আছে নাকি। সত্যি মাকার আলেক্সেয়েভিচ, আপনার চিঠিতে অভাব কেবল কবিতার। তাছাড়া আর সবই তো রয়েছে, কোমল হৃদয়াবেগ, গোলাপী কল্পনা!

পর্দাটা সম্পর্কে কিন্তু আমি ওসবকিছুই ভাবি নি। টবগুলো নতুন করে সাজিয়ে রাখার সময় সম্ভবত পর্দাটা নিজেই আটকে গিয়ে থাকবে। বুঝেছেন!

হ্যাঁ, মাকার আলেক্সেয়েভিচ, যতই বলুন আর যা করেই বোঝাবার চেষ্টা করুন যে আপনার রোজগার আপনি নিজের জন্যেই খরচ করছেন, আমার কাছ থেকে লুকোতে পারবেন না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমার জন্যে আপনি নিজের নিতান্ত প্রয়োজনগুলিকেও ছাঁটাই করতে শুরু করেছেন। যেমন এরকম একখানা ফ্ল্যাটে গিয়ে ওঠার বা কি দরকার পড়ল আপনার, সেখানে তো সারাক্ষণ আপনার দুর্ভোগ আর অশান্তি, অত ঠাসাঠাসি আর অসুবিধা? আপনার একটু আড়াল দরকার — ওখানে তার বালাই নেই। যা মাইনে পান, তাতে এর চেয়ে অনেক ভালোভাবেই থাকতে পারতেন। ফেদোরা বলে, আগে আপনি এর চেয়ে অনেক ভালোভাবেই তো ছিলেন। সত্যিই কি আপনি সারা জীবন কাটালেন একা একা, অভাব অনটন নিরানন্দের মধ্যে, কারো কাছ থেকে মিষ্টি কথা শোনা হয় নি, পরের কাছে মাথা গোঁজার ঠাঁই ভাড়া নিয়ে? দরদী বন্ধু আমার, আপনার জন্যে কী যে কষ্ট হয় কী বলব! অন্তত শরীরটার দিকে নজর রাখুন মাকার আলেক্সেয়েভিচ। লিখেছেন চোখ খারাপ হচ্ছে। তাহলে মোমবাতির আলোয় লিখবেন না, লেখেন কেন? আপনার আপিসের কর্তারা তো এমনিতেই জানে কাজের ব্যাপারে আপনার কত টান।

ফের অনুরোধ করি, আমার জন্যে অত পয়সা খরচ করবেন না। জানি আমায় আপনি ভালোবাসেন, কিন্তু নিজে তো আর বড়োলোক নন... আজ সকালে আমিও ঘুম ভেঙে উঠেছি বেশ ফুর্তির মেজাজে। ভারি ভালো লাগছিল। বেশ কিছু কাল ধরে ফেদোরা কাজ করছে। আমার জন্যেও কাজ নিয়ে এসেছিল সে। ফলে খুশি হয়ে উঠেছিলাম খুব। বাইরে গিয়েছিলাম কিছু সিল্ক কিনে আনার জন্যে, ফিরে এসে বসেছিলাম কাজ নিয়ে। সারা সকাল মনটা বেশ হালকা আর খুশি ছিল! কিন্তু এখন আবার দুশ্চিন্তা হচ্ছে, ভার ভার লাগছে মন, বুক টনটন করছে।

কী যে হবে আমার? কী আছে আমার কপালে? আমার যে কোনো কিছু জানা নেই, ভবিষ্যৎ নেই, কী ঘটবে তার এতটুকু ধারণা পর্যন্ত নেই, এটা ভারি কষ্টকর। আর অতীতের দিকে তাকাতে তো ভয়ই করে। এতই

তা দুঃখের যে ভাবতে গেলেই বুক ভেঙে যায়। সারা জীবন আমাকে কেঁদেই যেতে হবে কুলোকদের জন্যে, আমার সর্বনাশ করেছে যারা!

কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসছে, কাজে বসতে হয়। আরো অনেক কথা লেখার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু সময় নেই। কাজটা জরুরি, তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। চিঠি লেখাটা বেশ ভালো, সন্দেহ নেই, অত একলা লাগে না, তাই বলে আমাদের এখানে আসেন না কেন? কেন মাকার আলেক্সেয়েভিচ? এখন তো বেশি দূরে যেতে হবে না, সময় সময় এটুকু অবসরও নিশ্চয়ই হয়। সত্যি, আসুন! আপনার তেরেসাকে আমি দেখেছি। মনে হয় ভারি অসুস্থ। এত দুঃখ হল যে কুড়ি কোপেক ওকে দিয়েছি। ওহো, একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম: কেমনভাবে আপনার দিন কাটছে, অবশ্য-অবশ্যই তা জানাবেন যথাসম্ভব খুঁটিয়ে। আপনার আশেপাশের লোকগুলো কারা, আপনার সঙ্গে বনিবনাও আছে তো? ভারি জানতে ইচ্ছে করে। দেখবেন, সবকিছু লিখতে হবে কিন্তু! আজ আমি ইচ্ছে করেই পর্দার কোণটা তুলে দেব। সকাল সকাল শুয়ে পড়বেন — কাল দেখেছিলাম, প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত আপনার বাতি জ্বলেছে। তাহলে, আসি! ভারি বিষণ্ণ আর ভারাক্রান্ত আর নিঃসঙ্গ লাগছে আজকে! মানে, দিনটাই এমনি! বিদায়!

আপনার ভারভারা দব্রোসিওলভা

৮ই এপ্রিল

করুণাময়ী মান্যবরা ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

সত্যি গো, সত্যি আমার আদরের রানী, আমার পোড়া কপালে শুধু অমনি একটা দিনই এসেছিল। বুড়ো মানুষ আমি — ঠাট্টা করেছেন আমাকে নিয়ে ভারভারা আলেক্সেয়েভনা! তবে সেটা আমারই দোষ, পুরোপুরি আমার! বুড়ো মানুষ, দুটি খানিক চুল টিকে আছে মাথায়, তার ঐসব শব্দলীলা সাজে না... আরো বলি ভারেঙ্কা, মানুষ মাঝে মাঝে ভারি এক খাপছাড়া প্রাণী। কী আর বলব, মাঝে মাঝে ভেসে যায়। কিন্তু কী হয় তাতে, কী লাভ? কিছুই না, লাভ শুধু কতকগুলো রাবিশ যা

থেকে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করলে বাঁচি। না, রাগ করি নি গো, শুধু ভেবে খারাপ লাগছে যে আমি অমন বোকার মতো উচ্ছ্বসিত ভাষায় কীসব লিখেছি। আজ আমি কাজে গিয়েছিলাম খুব জাঁক করে। মন যেন আলো হয়ে উঠেছিল, অকারণে বুকের মধ্যে যেন একটা উৎসব! বেশ ফুর্তি হচ্ছিল। বেশ ফুর্তি করেই কাগজপত্র টেনে নিয়ে শুরু করেছিলাম প্রথমটা! কিন্তু তারপর কী দাঁড়াল! নজর করে দেখতেই সবকিছু হয়ে উঠল সেই আগের মতোই ছাই-ছাই। কালচে সেই একই রকম কালির দাগ, সেই একই টেবিল আর কাগজপত্র। আর আমিও ঠিক যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম। তবে আর পক্ষিরাজের পিঠে চেপে উধাও হতে যাওয়া কেন? কী থেকে এসব হল? সূর্য উঠেছিল আর নীল হয়ে গিয়েছিল আকাশ, তাই বলে কি? আর কোথায় সৌরভ? যখন আমাদের জানলার নিচের আঙিনায় কী না হয়ে থাকে? তার মানে এসবই আমার আহাম্মকী খেয়াল। এমনও তো হয় যে নিজের ভাবাতিশয্যে লোকে আজেবাজে বকতে শুরু করে। অথচ এসব ঘটে আর কিছু নয়, নির্বোধ ভাবাবেগ থেকে। এই সন্ধ্যেয় বাড়ি ফেরার সময় আমি এসেছি ঠিক হেঁটে তো নয়, যেন কোনোক্রমে নিজেকে ঠেলতে ঠেলতে। হঠাৎ কথা নেই, বার্তা নেই মাথাটাও ব্যথা করতে শুরু করেছিল। মানে, একটা না একটা কিছু লেগেই আছে আমার। (হয়ত পিঠে ঠান্ডা বসেছে।) বোকার অধম আমি, বসন্ত এসেছে বলে এতই খুশি হয়ে উঠেছিলাম যে বেরিয়েছিলাম শুধু একটা পাতলা কোট পরে। আমার অনুভূতিগুলো কিন্তু আপনি ভুল বুঝেছেন গো, তার উথলে ওঠাটা দেখেছেন একেবারেই অন্য দিক থেকে! এ হল একরকম পিতৃসুলভ স্নেহ, নিতান্তই পিতৃসুলভ ভারভারা আলেক্সেয়েভনা। দুঃখী অনাথ আপনি, এই অবস্থায় আমি আপনার আপন পিতার স্থান নিয়েছি মাত্র। একথা বলছি প্রাণ থেকে, একেবারে অকপটে, সত্যিকারের আত্মীয়ের মতো। যতই হোক আমি তো আপনার এক দূর আত্মীয়ই, যদিও সেই যে কথায় বলে, সইয়ের বৌয়ের বকুল ফুল—তবু আত্মীয় তো। আর এখন তো আমি আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আর অভিভাবকই হয়ে পড়েছি, কেননা সবচেয়ে বেশি করে যাদের কাছ থেকে আপনার সাহায্য আর আশ্রয় পাওয়ার অধিকার ছিল সেখানে পেয়েছেন শুধু আঘাত আর বিশ্বাসঘাতকতা। আর কবিতার কথা যদি বলেন, তবে নিশ্চয় বলব

ভারেঙ্কা, যে এ বয়সে আর পদ্য রচনার অনুশীলন আমার শোভা পায় না। পদ্য হল গে বাজে জিনিস! আজকাল পদ্য লিখলে ইস্কুলের ছেলেরা পিটুনি খায়... এই হল গে ব্যাপার।

সুবিধা আর শান্তি আর নানান সব কথা কী লিখেছেন আপনি ভারভারা আলেক্সেয়েভনা? খুঁতখুঁতে লোক আমি নই গো, এটা চাই, ওটা চাই, তেমন স্বভাব আমার নয়। এখনকার চেয়ে ভালো আমি থাকি নি কখনো। বুড়ো বয়সে অত খুঁতখুঁত করার কী আছে? অন্ন বস্ত্র পাদুকা সবই রয়েছে। মজা করায় কী লাভ? আমি তো আর নবাবজাদা নই। না, আমার বাপ অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিলেন না। আমার চেয়েও কম রোজগারে তিনি পরিবার প্রতিপালন করে গেছেন। ননীর পুতুল আমি নই! তবে, সত্যি কথা বলতে, আমার পুরনো ডেরাটা এর চেয়ে ভালো ছিল। সেখানে অনেক স্বস্তি পাওয়া যেত ভারেঙ্কা। আমার এখনকার ঘরখানাও অবশ্য বেশ ভালো, কোনো কোনো দিক থেকে বরং একটু বেশি আনন্দের, বলতে কি, বৈচিত্র্য আছে। এ ঘরের বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই, তবু পুরনোর জন্যে মন কেমন করে বৈকি। আমরা, বুড়ো মানুষেরা, মানে যাদের একটু বয়স হয়েছে তাদের কেমন একটু মায়া পড়ে যায় পুরনো জিনিসপত্রে। ঘরখানা ছিল ছোটো আর দেয়ালগুলো... তবে সে আর বলে কী হবে, মানে দেয়ালগুলো তো ঠিক যেকোনো দেয়ালেরই মতোই, সেটা কোনো কথা নয়। আসলে পুরনো সব জিনিসের কথা মনে পড়লেই ভারি খারাপ লাগে... আশ্চর্য ব্যাপার, কষ্ট লাগে, আবার ভাবতে গেলে যেন আনন্দও হয়। এমনকি যেসব জিনিসগুলো খারাপ, যেগুলোতে মাঝে মাঝে বিরক্ত ধরে যেত, সেগুলোর কথা ভাবলেও তাদের খারাপত্ব ঘুচে গিয়ে আমার কল্পনায় একটা আকর্ষণীয় চেহারা নিয়ে তারা হাজির হয়। চুপচাপ থাকতাম আমরা ভারেঙ্কা, আমি আর সেই বুড়ি বাড়িউলী— এখন আর সে বেঁচে নেই। এখন ওর কথা ভাবলেও মন খারাপ হয়ে যায়। বড়ো ভালো ছিল মেয়েটি, ঘরের জন্যে বেশি টাকা নিত না। মস্ত মস্ত লম্বা লম্বা সূঁই দিয়ে নানান ন্যাতাকানির কাঁথা বুনত, ওই ছিল তার কাজ। ওনার সঙ্গে আমার বাতিক ছিল তো একটাই, কাজ করতাম আমরা দুজনে, একই টেবিলে। বুড়ির এক নাতনি ছিল মাশা— বাচ্চা মেয়েটিকে এখনো মনে পড়ে আমার—এত দিনে সে নিশ্চয় তেরোয় পড়েছে। কী

দুষ্টু ছিল মেয়েটা, কিছু না কিছু কাণ্ড ঘটাবেই — হেসে গড়িয়ে পড়তাম আমরা। এমনি করেই চলত আমাদের তিন জনের। শীতের একটানা সন্ধেগুলোয় আমরা গোল টেবিলের চারপাশে বসে চা খেতাম আর কাজ শুরু করতাম। বাচ্চাটার মন ভুলিয়ে ওর দুষ্টুমি ঠেকিয়ে রাখার জন্যে বুড়ি গল্প বলত। আহা, কী সব গল্প! বাচ্চা তো বাচ্চা, বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোকেরা পর্যন্ত কান পেতে শুনত। কী আর বলব, আমিও পাইপ খেতে খেতে গল্পে মজে কাজের কথা ভুলে যেতাম। আর দুষ্টুমির ডিম সেই বাচ্চাটি ছোট্টো ছোট্টো হাতের ওপর লাল টুকটুকে গালখানা রেখে শুনত মুখ হাঁ করে। যদি ভয়ের গল্প হত তাহলে দিদিমার গা ঘেঁসে সরে আসত সে। কী ভালোই না লাগত তখন ওকে দেখতে! খেয়ালই হত না যে, মোমবাতি নিবে আসছে, আঙিনায় হুহু করছে তুষার-ঝঞ্ঝা। সত্যি, বেশ ভালো কাটত ভারেঙ্কা; এইভাবে প্রায় কুড়ি বছর তো আমরা কাটিয়েছি একসঙ্গে। যাক গে, কী সব বকবকানি! এ প্রসঙ্গ বোধ হয় আপনার ভালো লাগবে না, আমার পক্ষেও সে স্মৃতি কষ্টকর বিশেষ করে এখন। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, কী নিয়ে যেন তেরেসা ব্যস্ত। মাথা ধরেছে আমার, পিঠটাও ব্যথা করছে একটু, আমার ভাবনা-চিন্তাগুলোও এমন বিদঘুটে যে মনে হয় যেন সেগুলোও বুঝি সুস্থ নয়। আজ ভারি খারাপ লাগছে, ভারেঙ্কা! কিন্তু ও কী কথা লিখেছেন আপনি? আপনার বাসায় যাওয়া, সে কী করে হয়? লোকে কত কী বলবে যে? আঙিনা পেরতে তো হবে তা লোকে দেখবে, জিজ্ঞাসাবাদ করবে, আলোচনা চলবে, নিন্দে রটাবে, নানা রকম কদর্থ করবে। না, না, ও হয় না আমার ছোট্টো রানী। তার চেয়ে বরং কাল সান্ধ্য উপাসনার সময় দেখা করব, সেই ভালো, আমাদের দুজনের তাতে ক্ষতি কম হবে। এইরকম একটা চিঠি লেখার জন্যে আমার ওপর রাগ করবেন না, সবটা ফের একবার পড়ে দেখছি, কেমন এলোমেলো অসংলগ্ন। আমি বুড়ো হয়েছি ভারেঙ্কা, লেখাপড়া নেই। যখন বয়স ছিল তখন শিক্ষাদীক্ষা অল্পই পেয়েছি, তারপর এখন ফের শুরু করলেও কিছুই মাথায় ঢোকে না। স্বীকার করতেই হবে, ভারেঙ্কা, কিছু বর্ণনা করে বলার দক্ষতা আমার নেই। কেউ সেকথা না বললেও, এ নিয়ে ঠাট্টা না করলেও জানি যে যখনই আমি বেশ একটু কল্পনা মিশিয়ে কিছু লিখতে গেছি, তখনই জড়ো করে তুলেছি শুধু এক গাদা ছাইপাঁশ। আজ আপনাকে

জানলায় দেখতে পেয়েছিলাম, খড়খড়ি টেনে দিচ্ছিলেন। বিদায় আজ, বিদায়, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। বিদায় ভারভারা আলেক্সেয়েভনা।

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু
মাকার দেভুশকিন

পুঃ, কারো সম্পর্কে ব্যঙ্গাত্মক কিছু আমি আর লিখি না ভারেংকা। হাসি-ঠাট্টা করার বয়স আমার পেরিয়ে গেছে ভারভারা আলেক্সেয়েভনা! তাছাড়া কাউকে নিয়ে যদি আমি হাসি, তাহলে লোকেও যে আমাকে দেখে হাসবে। সেই রুশী প্রবাদ তো আছে: কারো পথে কাঁটা দিলে নিজেই কাঁটায় পড়বে।

৯ই এপ্রিল

করুণাময় মান্যবর মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

উপকারী বন্ধু আমার, ছিঃ, অমন মন খারাপ আর খেয়ালীপনা করতে হয় কখনো? আপনার কি কোনো আঘাত দিয়েছি আমি? হ্যাঁ, প্রায়ই আমি অবিবেচকের মতো চলি, কিন্তু ভাবি নি যে আমার কথাগুলোকে আপনি খোঁচা বলে ধরবেন। আপনার বয়স বা স্বভাব নিয়ে উপহাস করার ইচ্ছা আমার কখনো হয় নি, সেটা জেনে রাখুন। ব্যাপারটা ঘটেছে নেহাৎই আমার চাপল্যের কারণে, হয়ত আরো এইজন্যে যে আমার দিনগুলো বড়ো একঘেয়ে—আর একঘেয়ে লাগলে কী না করতে পারে মানুষ? সত্যি কথা বলতে, আমি ভেবেছিলাম চিঠিতে আপনি নিজেই বুঝি একটু রহস্য করছেন। যখন দেখলাম আপনি আমার ওপর অপ্রসন্ন বোধ করছেন, তখন ভয়ঙ্কর কষ্ট হল আমার। না গো, বন্ধু এবং সহায় আমার, আমার অনুভূতি নেই, কৃতজ্ঞতা নেই, একথা ভাবলে আপনি ভারি ভুল করবেন। শত্রুদের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়ে, তাদের ঘৃণা আর নিপীড়ন থেকে আমায় রক্ষা করে আমার জন্যে আপনি যাকিছু করেছেন, তার মূল্য আমি বুঝি। ভগবানের কাছে চিরকাল আমি আপনার জন্যে প্রার্থনা করে যাব, এবং

ভগবান যদি আমার প্রার্থনা শোনেন, ধর্ম যদি থাকে, তাহলে আপনি সুখী হবেন।

শরীরটা আজ বেশ অসুস্থ। পালা করে এক একবার কাঁপুনি ধরছে, এক একবার গরম লাগছে। আমার জন্যে খুব অস্থির হয়ে পড়েছে ফেদোরা। আমাদের কাছে আসতে আপনি খামোকা সংকোচ বোধ করছেন মাকার আলেক্সেয়েভিচ। লোকেরা নিজের চরকায় তেল দিক! আমাদের মধ্যে পরিচয় তো যথেষ্ট, ব্যস ফুরিয়ে গেল!.. বিদায় মাকার আলেক্সেয়েভিচ, আর কিছু লেখবার নেই, পারছিও না: শরীরটা ভারি খারাপ। আর ফের বলি, আমার ওপর রাগ করবেন না, আমার শ্রদ্ধা আর অনুরাগে বিশ্বাস রাখবেন।

আপনার বিশ্বস্ততম বিনীত সেবিকা
ভারভারা দব্রসিওলভা

১২ই এপ্রিল

করুণাময়ী মান্যবরা ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

কী ব্যাপার গো? কী হল আপনার? বার বার আপনি আমায় ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন! প্রতি চিঠিতে আমি মিনতি জানাচ্ছি, একটু সাবধানে থাকবেন, গায়ে বেশ কিছু জড়িয়ে নেবেন, আবহাওয়া খারাপ থাকলে ঘরের বার হবেন না, সবকিছুতেই একটু সাবধানতা দরকার। কিন্তু, আপনি, আদরের দেবী আমার, আমার কথা শুনছেন না, একেবারে যেন বাচ্চা। আপনি পলকা, খড়কুটোর মতো পলকা, সে তো আমি জানি, একটুখানি বাতাসেই আপনি ঠান্ডা লাগিয়ে বসেন। তাই সতর্ক থাকা উচিত ভারেঙ্কা, নিজের দিকে লক্ষ্য রাখবেন, ভয়ের কিছু থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হবেন, মনোকষ্ট আর দুশ্চিন্তায় ফেলবেন না বন্ধুদের।

আমার দৈনন্দিন জীবন আর আশেপাশের লোকদের সম্পর্কে বিশদে জানতে চেয়েছিলেন? সানন্দে আমি রাজি, আমার রানী। একেবারেই গোড়া থেকে শুরু করা যাক। তাতে বেশ শৃঙ্খলা থাকবে। প্রথমত আমাদের বাড়ির সদর দরজার সিঁড়িটা বেশ শোভন, বিশেষ করে প্রধান সিঁড়িটা।

ঝকঝকে তকতকে চওড়া, সবই লোহা আর দামী কাঠে বানানো। কিন্তু খিড়কির সিঁড়ি সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল। সে সিঁড়ি উঠেছে প্যাক খেয়ে খেয়ে, যেমন স্যাঁৎসেঁতে তেমনি নোংরা, ধাপগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে, দেয়ালগুলো এত চ্যাটচেটে যে ভর দিলে হাত এঁটে যাবে। প্রত্যেকটা চাতালে ভাঙা সিন্দুক, চেয়ার, পোশাকের আলমারি আর কাপড় মেলার দড়ি। বেশির ভাগ জানলাই ভাঙা, এবং সর্বত্রই ধুলো, আবর্জনা, ডিমের খোলা, আর মাছের নাড়িভুঁড়িতে ভরা টব। দুর্গন্ধ... সংক্ষেপে বিশেষ ভালো নয়।

ঘরগুলোর ছক কিরকম তা তো আগেই বলেছি: সুবিধাজনক তা মানতে হবে, তবে... মানে একটু ঘুপচি গোছের। মানে, সত্যি সত্যিই যে দুর্গন্ধ ছাড়ে তা ঠিক নয় — তবে বলা যায় কেমন পচা-পচা, ঝাঁঝালো গন্ধ আর-কি। প্রথমটা অস্বস্তি লাগে, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সয়ে যায়, টেরই পাওয়া যায় না যে সয়ে যাচ্ছে, কেননা নিজের গা থেকেই দুর্গন্ধ বেরয়, পোশাকপরিচ্ছদ হাত-পা থেকেও গন্ধ ছাড়ে, তারপর অভ্যেস হয়ে যায়। শুধু টুনি পাখিগুলো ঝটপট মরে যাচ্ছে। নৌবাহিনীর যে অফিসারটি এখানে থাকে, সে পাঁচ বারের বার টুনি কিনল — এখানকার বাতাসে স্রেফ টেঁকে না ওরা। রান্নাঘরখানা আমাদের বড়োসড়ো, আলো আছে। সকাল বেলায় অবিশ্যি বাতাসটা খানিক ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে, মাছ মাংস রান্না হয় তখন, জল পড়ে সর্বত্র, কিন্তু সন্ধ্যেয় একেবারে স্বর্গ। রান্নাঘরটায় পুরনো জামাকাপড় শুকোতে দেওয়া হয়, তাই আমার ঘরখানা যেহেতু বেশি দূরে নয়, মানে রান্নাঘরের লাগোয়াই, তাই কাপড়-চোপড়ের গন্ধে একটু অস্বস্তি হয়। কিন্তু তাতে যায় আসে না বিশেষ, কিছুদিন থাকলে ওটা সয়ে যাবে।

একেবারে ভোর থেকেই বাড়িখানায় সাড়া পড়ে যায়। সকলেই জেগে উঠে চলাফেরা করে, দুমদাম শব্দ শুরু হয়। যাদের দরকার তারা কাজে যাবে বলে ওঠে, কেউ কেউ এমনিই উঠে পড়ে। সবাই চা খাই প্রথমে। সামোভারগুলোর মালিক বেশির ভাগই আমাদেরই বাড়িউলী, তবে সংখ্যায় বেশি নয় সেইজন্যে লাইন দিতে হয়। কেউ যদি লাইন না দিয়ে কেটলি নিয়ে এসে হাজির হয়, তাহলে তার দফারফা। আমার কপালে তাই ঘটেছিল প্রথম বার... কিন্তু সে আর লিখে কী হবে! সেই উপলক্ষে সকলের

সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। প্রথম পরিচয় হয় নৌবাহিনীর অফিসারের সঙ্গে। লোকটা বেশ খোলামেলা; বাপ মা বোন (তুলার এক অফিসারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে) এবং ক্রনশতাদ্‌ত্‌ শহর সম্পর্কে সমস্ত গল্প করে সে আমায় শুনিয়েছে। আমায় সে সবকিছুতে সাহায্য করবে বলেছে এবং তক্ষুনি চায়ে নেমন্তন্ন করে বসে। তার খোঁজ পাওয়া গেল সেই ঘরে যেখানে তাস খেলার বিরাম নেই। চায়ের পর ওরা আমাকেও জুয়া খেলায় যোগ দেবার জন্যে পেড়াপিড়ি করতে লাগল, আমাকে নিয়ে একটু রগড় করতে চেয়েছিল কিনা জানি না। তবে সারা রাত ধরে ওরা খেলেছে এবং আমি যখন ঢুকলাম তখনো খেলে চলেছে ওরা। ফরফর করে তাস ভাঁজা চলছে, খসখস করে লেখা হচ্ছে খড়ি দিয়ে, সারা ঘরে তামাকের এত ধোঁয়া যে চোখ কড়কড় করে। জুয়া খেলতে আমি আপত্তি করায় ওরা সঙ্গে সঙ্গেই আমায় জানিয়ে দিলে যে আমি দর্শন কপচাচ্ছি। অতঃপর আমার সঙ্গে কেউ একটি কথাও কইলে না। সত্যি কথা বলতে, তাতে আমি খুশিই হয়েছি। ওখানে আমি আর যাচ্ছি না। জুয়াড়ী, একেবারে জুয়াড়ী সব! লেখা-টেখার ব্যাপারে যে রাজকর্মচারীটি আছেন, তিনিও তাঁর ঘরে মাঝে মাঝে পার্টি দেন। কিন্তু সেখানকার সবকিছুই বেশ নির্দোষ, নিরীহ ভদ্র, মার্জিত, সবই উ'চু স্তরের।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথাও বলি ভারেঙ্কা, আমাদের বাড়িউলীটি হল একটি পাজি বুড়ি, আস্তো এক ডাইনী। তেরেসাকে তো আপনি দেখেছেন। কিরকম বলুন তো? রোগা, ছাল ছাড়ানো, টে'সে যাওয়া মুরগীর ছানার মতো। বাড়িতে লোক বলতে তো শুধু দুজন — তেরেসা আর বাড়িউলীর চাকর ফালদোনি। লোকটার নাম হয়ত অন্য কিছু হতে পারে। কিন্তু ফালদোনি বলে ডাকলে লোকটা সাড়া দেয়। সকলেই তাকে ডাকে ওই নামে। লোকটার পাটকিলে চুল, একটা চোখ কানা, কোন জাত কে জানে। বোঁচা নাক, একেবারে অভদ্র — তেরেসার ওপর কেবলই চোটপাট করে আছে, হাতাহাতি হবারও উপক্রম হয়। মোটের ওপর আমার এখানকার জীবন তেমন ভালো বলা যায় না... কিছুতেই রাতে সকলে একসঙ্গে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল, এটা কিছুতেই হবার নয়। কিছু লোক থাকবেই যারা তাস খেলবে। তাছাড়াও মাঝে মাঝে এমন সব কান্ড হয়, যা বলতেও লজ্জা করে। আমার দিক থেকে এসব অবশ্য সহ্য হয়ে গেছে, কিন্তু ভেবে

পাই না, পরিবার পরিজন নিয়ে লোকে এই হট্টগোলের মধ্যে বাস করতে পারে কী করে? গোটা একটি গরিব পরিবার একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে, বাকিগুলোর পাশাপাশি নয়—একটু দূরে, আলাদা এক কোণে। নিরীহ লোক ওরা, চোখেই প্রায় পড়ে না, পার্টিশন দিয়ে একখানা ঘরে থাকে। উপাধি গর্শকভ, বেকার কেরানি একজন, সাত বছর আগে কী কারণে যেন চাকরি গেছে। লোকটা বেঁটেখাটো, একেবারে পাকাচুল—এমন ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরে চলাফেরা করে যে তাকিয়ে দেখা যায় না। আমার চেয়েও অনেক খারাপ! দুঃস্থ দুর্বল একটি লোক (মাঝে মাঝে করিডরে দেখা হয় আমাদের)। হাঁটুদুটো ওর কাঁপে, হাত কাঁপে, মাথাও কাঁপে—কে জানে কী রোগ! ভীরু গোছের মানুষ, ভয় পায় সবাইকে, থাকে একলা একলা। আমি নিজেও মাঝে মাঝে মুখচোরার মতো থাকি, কিন্তু ওর অবস্থা আরো খারাপে। বউ আছে লোকটার, আর তিনটে বাচ্চা। বড়ো ছেলেটা ঠিক বাপের মতোই, দুবলা-পিনপিনে। এককালে রূপ ছিল বৌটার—এখনো দেখে বোঝা যায়। কিন্তু এমন ন্যাতাকানি পরে থাকে বেচারি। শুনেছি, বাড়িউলীর কাছে ওরা ধারে। ওদের ওপর বাড়িউলী বিশেষ সদয় নয়। এও শুনেছি গর্শকভের নাকি চাকরি গিয়েছিল কি একটা বিপদে পড়ে—কিছু একটা মোকদ্দমা নাকি তদন্ত, নাকি সাক্ষী, কী জন্যে ঠিক জানি না ব্যাপারটা। কিন্তু ভারি গরিব ওরা, ঈশ্বর, কী অসম্ভব গরিব! ওদের ঘরটা সর্বদাই শান্ত, চুপচাপ, মনে হবে যেন লোকই থাকে না সেখানে। ছেলেগুলোর পর্যন্ত কোনো চ্যাঁচামেচি নেই। ছেলেরা কখনো হৈচৈ খেলাধুলো করছে না এমন হয় না। ভারি খারাপ লক্ষণ। একবার সন্ধ্যেয় ওদের ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেসময় বাড়িটা অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ। কানে এল ফোঁপানির একটু শব্দ, তারপর একটু ফিসফাস, ফের ফোঁপানি। বোধ হয় কেউ কাঁদছিল কিন্তু এমন চাপা গলায়, এমন করুণভাবে যে বুকটা আমার ভেঙে যাচ্ছিল। সারা রাতই ওদের কথা ভেবেছি, ভালো ঘুমোতে পারি নি।

যাই হোক, বিদায় আমার ভারেঙ্কা, আমার মহামূল্য বন্ধু! যেমন পেরেছি বর্ণনা করে সবই জানালাম। সারা দিন শুধু আপনার কথাই মনে হয়েছে আজ। আপনার জন্যে বুক টনটন করেছে। আমি যে জানি গো, আপনার গরম কোট নেই। পিটারবুর্গের এই বসন্ত—এই বাদলা হাওয়া

আর তুষারপাত যে আমার মরণ, ভারেঙ্কা। বিগলিত এই আবহাওয়া থেকে ঈশ্বর আমায় বাঁচান! আমার লেখার ধরন দেখে রাগ করবেন না যেন, স্টাইল-ফাইল কিছুই আমার নেই ভারেঙ্কা, স্টাইল নেই। অন্তত কিছুটা থাকলেও হত! যা মনে আসে তাই লিখে শুধু আপনাকে একটু আনন্দ দিতে চাই। ভালো মতো যদি কিছু শিক্ষাদীক্ষা থাকত জীবনে, তাহলে অবিশ্যি অন্য কথা। কিন্তু কী শিক্ষাই না আমার জুটেছে—এক কানাকোড়িও দাম নয় তার!

আপনার চিরবিশ্বস্ত সুহৃদ
মাকার দেভুশকিন

২৫শে এপ্রিল

করুণাময় মান্যবর মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

আজ দেখা হল খুড়তুতো বোন সাশার সঙ্গে! মাগো! ও মেয়েটাও মরতে বসেছে বেচারি! অন্যের কাছ থেকে এও শুনছি যে আন্না ফিওদরভনা নাকি আমার খোঁজখবর করছেন। মনে হচ্ছে আমাকে কখনোই রেহাই দেবেন না উনি। উনি বলছেন যে 'আমাকে' নাকি উনি 'ক্ষমা করতে' চান, অতীতের কথা সব ভুলে যাবেন, আর অবশ্য নিজেই নাকি আসবেন আমায় দেখতে। ও'র বক্তব্য, আপনি মোটেই আমার আত্মীয় নন, উনি আমার বেশি আপন, আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলানোর কোনো অধিকার আপনার নেই। আপনার দয়া আর দানের ওপর নির্ভর করে বাঁচা নাকি আমার পক্ষে লজ্জার কথা, অমর্যাদাকর, আমায় গালাগালি দিচ্ছেন অকৃতজ্ঞ বলে। উনি বলছেন আমি নাকি তাঁর অন্নজলের কথা ভুলে গেছি, অনশন মৃত্যু থেকে মাকে আর আমাকে নাকি উনিই বাঁচিয়েছেন, আমাদের খাওয়াতে গিয়ে আড়াই বছর ধরে ও'র ঢের খরচা হয়েছে, এসব ছাড়াও তিনি আমাদের দেনা মকুব করে দিয়েছেন। আমার মাকে পর্যন্ত উনি কৃপা করেন নি! আমার যে কী করেছেন, বেচারি মা যদি তা জানতেন! কিন্তু ভগবান সবই দেখছেন!.. আন্না ফিওদরভনা বলেন, আমার বোকামির জন্যেই নিজের সৌভাগ্য আমি ধরে রাখতে

পারি নি, উনিই আমায় সৌভাগ্যের পথ দেখিয়েছিলেন, অন্য কোনো কিছুতে তাঁর দোষ নেই। আমি নিজেই আমার সুনাম বাঁচাতে পারি নি বা চাই নি। তাহলে দোষটা কার, হায় ভগবান! উনি বলেন যে শ্রীযুক্ত বিকভ ঠিকই করেছেন, কে বিয়ে করবে সেই মেয়েকে, যে... কিন্তু কী লাভ এসব লিখে! এরকম অন্যায় কথা শোনাই যে কষ্টকর মাকার আলেক্সেয়েভিচ! আমার কী হয়েছে জানি না। বসে বসে কাঁপছি, কাঁদছি, ডুকরে উঠছি। দু'ঘণ্টা লেগেছে এই চিঠি লিখতে। খুব আশা করেছিলাম, উনি শেষ পর্যন্ত হয়ত স্বীকার করবেন উনি আমার ওপর অন্যায় করেছিলেন। কিন্তু এই দাঁড়াচ্ছে! শুধু, দোহাই ভগবান, আপনি আমার একমাত্র হিতৈষী, আমার জন্যে চিন্তা করবেন না। ফেদোরা সবসময়েই একটু বাড়িয়ে বলে। আমার অসুখ করে নি। কাল ভোল্কভো কবরখানায় মায়ের স্মৃতি তর্পণে গিয়ে অল্প একটু ঠাণ্ডা লেগেছে মাত্র। কিন্তু আমার সঙ্গে কেন এলেন না আপনি, কত করে বলেছিলাম! আহা, বেচারি, বেচারি মা আমার, কবর থেকে উঠে একবার যদি এসে দেখে যেতে, কী আমার করেছে ওরা!..

ভ. দ.

২০শে মে

ভারেঙ্কা, লক্ষ্মীটি আমার!

কিছু আঙুর পাঠাচ্ছি; লোকে বলে, অসুখ থেকে সেরে ওঠার সময় আঙুর খুব কাজ দেয়। ডাক্তাররাও বলে, তেষ্টা মেটাতে আঙুর খাওয়া ভালো। শুধু সেইজন্যেই পাঠালাম। কিছু ফুলার পিঠে চেয়েছিলেন, তাই ফুলারও কিছু পাঠালাম। ক্ষিদে কেমন হচ্ছে গো! ঐটে হল আসল কথা। যাক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ব্যাপারটা সব চুকে টুকে গেল, কষ্টের দিন শেষ হয়ে আসছে আমাদেরও। সেজন্যে ওপর-আলাকে কৃতজ্ঞতা জানাই আর ঐ বইগুলোর ব্যাপারে এখনো কোথাও জোগাড় করে উঠতে পারি নি। শুনছি একটা নাকি ভালো বই আছে, ভারি চমৎকার করে লেখা। বলছে খুবই ভালো বই। আমি নিজে পড়ি নি, কিন্তু সকলেই খুব প্রশংসা

করছে। নিজের জন্যে ওটা চেয়েছি, কথাও দিয়েছে, কিন্তু আপনি পড়বেন কি? এ ব্যাপারে আপনি বড়ো খ‍ুঁতখ‍ুঁতে — আপনার র‍ুচিতে মেলা কঠিন। সে আমি ভালোই জানি গো। কবিত্বময় কিছ‍ু বোধ হয় আপনার পছন্দ, ভালোবাসা আর বেদনায় ভরা এমন কিছ‍ু। ঠিক আছে, কবিতা-টবিতাও জোগাড় করে দেব। এখানে একটা খাতা আছে, কবিতা টুকে রাখা আছে তাতে।

আর আমি? আমি তো ভালোই আছি। আমার জন্যে মোটেই ভাবনা করবেন না লক্ষ্মীটি। আর ফেদোরা আমার সম্পর্কে আপনাকে যা বলেছে সব বাজে কথা। ওকে বলে দেবেন যে ও মিথ্যে করে বলেছে, অবিশ্যি-অবিশ্যি বলে দেবেন যে ও নিন্দের বেসাতি!.. আমি আমার নতুন আপিসের উর্দিটা মোটেই বিক্রি করি নি। কেনই বা করতে যাব, কী প্রয়োজন আপনিই বল‍ুন? শ‍ুনেছি, চল্লিশ চাঁদি র‍ুবল বাড়তি মাইনে আমার শিগগিরই পাবার কথা। তাহলে বিক্রি করতে যাব কেন? আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই গো। ভারি ব্যস্তবাগীশ, এই ফেদোরাটা। আমরা বেঁচে বর্তে থাকব গো! শ‍ুধ‍ু, রানী আমার, ভালো হয়ে উঠুন। ঈশ্বরের দোহাই, স‍ুস্থ হয়ে উঠুন, ব‍ুড়ো লোকটাকে কষ্ট দেবেন না। কে আপনাকে বললে যে আমি রোগা হয়ে গেছি? ফের যত রটনা! একেবারে মিথ্যে রটনা! বেশ স‍ুস্থ আমি, এমন মোটা হয়ে গেছি যে নিজেরই লজ্জা করছে — খেয়ে-পরে দিব্যি আরামে আছি। কেবল আপনি সেরে উঠুন! এবার আসি, আমার আদরের দেবী, আপনার ছোটো ছোটো সবকটি আঙ‍ুলগ‍ুলোতে আমার চুম‍ু রইল।

আপনার চিরন্তন অবিচল স‍ুহৃদ
মাকার দেভুশকিন

প‍ুঃ, ফের হ্যাঁ, ওটা কী কথা লিখেছেন?.. কী পাগলামি! অত ঘন ঘন আপনার কাছে যাওয়া কেমন করে সম্ভব? আপনাকেই তা জিগ্যেস করছি। অন্ধকার রাতের আড়ালে কি? কিন্তু রাত তো এখন প্রায় হয়ই না, ঋতুটাই এই। তাছাড়া আপনার অস‍ুখের সময় জ্ঞান ছিল না যখন, তখন

তো আপনাকে ছেড়ে আমি প্রায় নড়ি নি। জানি না কী করে তা পেরেছিলাম। লোকের কৌতূহলে, জিজ্ঞাসাবাদে যাওয়া বন্ধ করতে হল। এমনিতেই কত কী রটতে শুরু করেছে। তেরেসার ওপর অবশ্য আমার ভরসা আছে—কথা বলে বেড়ানো ওর স্বভাব নয়। কিন্তু নিজেই ভেবে দেখুন, লোকে যদি আমাদের সম্পর্কে সবকিছু টের পেয়ে যায়, কী হবে তাহলে? কী না ভাববে তারা, কী না বলে বেড়াবে! বুক বেঁধে থাকুন লক্ষ্মীটি, সেরে ওঠা পর্যন্ত সবুর করুন। তখন বাড়ির বাইরে কোথাও রাঁদেভু* করা যাবে।

১লা জুন

শ্রদ্ধাস্পদেষু মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

খুব ইচ্ছে হচ্ছিল এমন একটা কিছু করি যা আপনার ভালো লাগবে, আপনার কাছ থেকে যে ভালোবাসা ও সাহায্য পেয়েছি তার জন্যে। সময় কাটাতে আমার দেরাজ ঘাঁটাঘাঁটি করে এই পুরনো খাতাখানা পেয়েছি; সেটা পাঠালাম। লিখতে শুরু করেছিলাম আমার সুখের দিনগুলোয়। প্রায়ই আপনি উৎসুক হয়ে জানতে চেয়েছেন আমার অতীত জীবন, আমার মা, পক্রোভস্কি, আন্না ফিওদরভনার সঙ্গে আমার বসবাস এবং পরিশেষে আমার সাম্প্রতিক বিপদের কথা। খাতাখানা পড়ার খুব ইচ্ছে ছিল আপনার। ভগবান জানেন কেন জানি আমি জীবনের নানা মুহূর্তের কথা ওতে লিখে রেখেছিলাম, এগুলো পড়ে আপনি তৃপ্তি পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু লেখাগুলো ফের পড়ে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। এর শেষ লাইনগুলো যখন লিখেছিলাম, তখন থেকে মনে হয় আমি বুঝি দুগুণ বুড়িয়ে গেছি। বিদায় মাকার আলেক্সেয়েভিচ, আজকাল ভাবি একঘেয়ে লাগে, প্রায়ই ভুগছি অনিদ্রায়। এ এক অসহ্য আরোগ্য লাভ!

ভ. দ.

---

* সাক্ষাৎকার (ফরাসী)।

১

বাবা যখন মারা গেলেন তখন আমার বয়স মাত্র চোদ্দ। ভারি সুখের ছিল আমার ছেলেবেলা। তার শুরুটা এখানে নয়, এখান থেকে অনেক দূরে, মফস্বলে, গণ্ডগ্রামে। ত. প্রদেশের কুমার বাহাদুর প.-এর বিরাট জমিদারিতে বাবা ছিলেন গোমস্তা। কুমার বাহাদুরের এলাকাধীন একটি গ্রামে আমাদের জীবন কাটত চুপচাপ, অলক্ষ্যে, সুখে, শান্তিতে... আমি ছিলাম চঞ্চল প্রকৃতির, মাঠঘাট বন আর বাগিচায় ছুটে বেড়াতাম সবসময়, কেউ ভাবনা-চিন্তা করত না। নিজের কাজ নিয়ে বাবা থাকতেন সারাক্ষণ ব্যস্ত আর মা থাকতেন ঘর-সংসার নিয়ে। শিক্ষা দেবার মতো কেউ ছিল না আমার, তাতে খুশিই লাগত। সকাল হলেই আমি ছুটতাম পুকুরপাড়ে, নয়ত বনের ধারে, নয়ত যারা ঘাস কাটছে কি খড় গাদি করছে তাদের কাছে। কোনো ভাবনা ছিল না, রোদ্দুরে গা পুড়ছে কি, বাড়ি থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি কি, অথবা ঝোপঝাড়ে হাত পা ছড়ে গেল কি পোশাক ছিঁড়ে গেল কে জানে। পরে বাড়িতে বকুনি খেলেও কিছু এসে যেত না।

গাঁ ছেড়ে কোথাও না গিয়ে সারা জীবন আমার যদি এক জায়গাতেই কাটত, তাহলে দুঃখ ছিল না। কিন্তু ছেলেবেলাতেই আমায় গাঁ ছাড়তে হল। আমার তখন বারো বছর বয়স — পিটারবুর্গে চলে এলাম আমরা। যাত্রার বিষণ্ণ আয়োজনের কথা ভাবলে কী কষ্টই না হয় — আমার যতকিছু প্রিয় বস্তু তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে কী কান্নাই না কেঁদেছিলাম, বাবার গলা জড়িয়ে ধরে চোখের জলে কত মিনতি করেছিলাম, অন্তত আরো কিছু দিন গাঁয়ে থেকে যেতে। বাবা বকুনি দিয়েছিলেন আমায়। মা কাঁদছিলেন। বললেন, দরকার আছে, যেতেই হবে। বুড়ো কুমার বাহাদুর প. মারা গিয়েছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা বাবাকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। পিটারবুর্গের কিছু লোকের কাছে বাবা খানিক টাকা ঢেলেছিলেন। ভাবলেন, আমাদের অবস্থার উন্নতি করা যাবে, ভেবেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতি দরকার। একথা মা আমাকে বলেছিলেন পরে। রাজধানীতে এসে আমরা বাসা নিলাম পিটারবুর্গস্কায়া পাড়ায় — বাবার মৃত্যু পর্যন্ত সেইখানেই আমরা ছিলাম।

নতুন জীবনে অভ্যস্ত হতে কী কষ্টই না গেছে! শহরে এসে

পৌঁছেছিলাম আমরা শরতে। গাঁ ছেড়েছিলাম ঝকমকে রোদ-ভরা গরম এক দিনে। ক্ষেতের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গোলা-বাড়িগুলো শস্যে ভরতি, কিচির-মিচির করে উড়ে এসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। সবকিছুই ভারি হাসিখুশি ঝকঝকে। কিন্তু শহরে যখন এসে পৌঁছলাম তখন সেখানে কেবল বৃষ্টি, শরতের পচা পচা হিম, কাদা, অজানা অচেনা সব লোকের ভিড়, কেমন পরপর, তুষ্টি নেই কিছুতে, রাগী-রাগী! কোনো রকমে সংসার পেতে বসলাম। মনে আছে সবাই শশব্যস্ত, ঘর গুছাতে উদ্‌ভ্রান্ত। বাবা বাড়িতে প্রায় থাকতেনই না, আর মার স্বস্তি ছিল না এক দণ্ডও। আমার কথা কেউই ভাবত না। আমাদের নতুন বাসায় পরদিন সকাল বেলাটা—ওঃ, কী বিচ্ছিরই না লেগেছিল। আমাদের জানলার সামনেই কী একটা হলদে বেড়া, রাস্তায় সারাক্ষণ কাদা—রাস্তায় লোক চলাফেরা করত খুব কম—এত ঠাণ্ডা যে সকলেই আপাদমস্তক ঢাকা-ঢুকো দিয়ে হাঁটত।

সারা দিন বাড়িটা লাগত ভয়ঙ্কর একঘেয়ে, মনমরা। আত্মীয় বন্ধু ছিল না বললেই হয়। আন্না ফিওদরভনার সঙ্গে বাবার ঝগড়া ছিল। (ওনার কাছে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলেন বাবা।) ঘনঘন লোকে আসত কাজকর্মের ব্যাপারে। প্রায়ই তারা ঝগড়াঝাঁটি, তর্কবিতর্ক, চেঁচামেচি লাগাত। তারা চলে যাবার পরে প্রতিবারই বাবার মন খারাপ হত, মেজাজ যেত বিগড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি পায়চারি করতেন একোণ থেকে ওকোণ, ভুরু কুঁচকে থাকতেন, কোনো কথা বলতেন না কারোর সঙ্গে। ভয়ে কোনো কথা বেরুত না মার মুখ দিয়ে। আমিও কোনো কোণে গিয়ে বসে থাকতাম বই নিয়ে, নড়াচড়ারও সাহস হত না।

পিটারবুর্গে আসার তিন মাস পরে আমাকে বোর্ডিং ইস্কুলে পাঠানো হল। অপরিচিত লোকজনের মধ্যে প্রথমে কী কষ্টেই না দিনগুলো কেটেছে! সবকিছুই সেখানে ভারি নীরস—সবসময়েই শিক্ষয়িত্রীদের ধমক; আর মেয়েরা ছিল ঠাট্টা তামাসার ভক্ত আর আমি একেবারে বুনো। সবকিছুই ছিল কড়া শাসনে, পান থেকে চুন খসবার জো নেই! সবকিছুই চলত ঘণ্টা ধরে, একসঙ্গে বসে খাওয়া, আর একঘেয়ে সব মাস্টার, প্রথম প্রথম বিচ্ছিরি লাগত, কষ্ট হত। ঘুমোতে পর্যন্ত পারতাম না—সারা রাত কাঁদতাম, একটানা একঘেয়ে ঠাণ্ডা রাত! সন্ধ্যে বেলায় সবাই মুখস্থ

করতে, পড়া করতে বসত; আমার নড়তে-চড়তে পর্যন্ত ভয় হত; ক্রিয়াপদ আর বাক্যগঠনের পাঠ সামনে নিয়ে মন চলে যেত ঘরের পানে, ভাবতাম মা, বাবার কথা, আমার বুড়ি ধাই-মায়ের কথা, তার বলা রূপকথাগুলোর কথা — আর কী কষ্টই যে হত! বাড়ির ছোটোখাটো সামান্য জিনিসগুলোর কথা ভেবেও আনন্দ হত। ইচ্ছে হত, কেবলি ইচ্ছে হত কী ভালোই না হয় বাড়ি যেতে পারলে! আমাদের সেই ছোটো ঘরখানায় গিয়ে বসি — সামোভার ঘিরে সবাই আত্মীয়স্বজন; তেমনি চেনাজানা ঘরোয়া যদি হত। ভাবতাম, তাহলে মাকে কী করেই না জড়িয়ে ধরতাম। বসে ভাবতে ভাবতে কাঁদতাম লুকিয়ে লুকিয়ে, বুকের মধ্যে ফোঁপানি চেপে বেমালুম ভুলে যেতাম সমস্ত ব্যাকরণ। পরের দিনের পড়া না হলেও সারা রাত স্বপ্ন দেখতাম মাস্টারদের, বড় দিদিমণির, মেয়েগুলোর — ভাবতাম সারা রাত পড়া মুখস্থ করেছি, কিন্তু পরের দিন আবার যে কে সেই। নীল-ডাউন করিয়ে রাখত — খেতে দিত শুধু একটি পদ। সারাক্ষণ ভারি মন খারাপ হয়ে থাকত আমার। প্রথম প্রথম মেয়েগুলো আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করত, পেছনে লাগত আমার, পড়া বলতে গেলে আমায় ঘুলিয়ে দিত; সার বেঁধে চা কি খাবার খেতে যাবার সময় চিমটি কাটত আমাকে, খামোকা নালিশ করত প্রধান শিক্ষিকার কাছে। কিন্তু শনিবার সন্ধ্যে বেলা যখন আমার ধাই-মা আসত — আহ্, কী যে আনন্দ তখন। পাগলার মতো আনন্দে জড়িয়ে ধরতাম বুড়িকে। আমাকে সে ভালো করে ঢাকাঢুকি দিয়ে পোশাক পরিয়ে নিত — আমার সঙ্গে হেঁটে তাল রেখে উঠতে পারত না। আর আমি কেবল বকবক করে চলতাম। বাড়ি পৌঁছনো মাত্র মন হাসিখুশি — সকলকে জড়িয়ে ধরতাম এমনভাবে যেন বছর দশেক পরে দেখা! শুরু হত কত কথা, কত গল্প। সকলের কাছেই ছুটে যেতাম অভিনন্দন জানাতে, হেসে চেঁচামেচি করে লাফিয়ে বেড়াতাম। বাবার সঙ্গে শুরু হত আমার পড়াশুনা নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা — বিদ্যে কেমন এগুচ্ছে, শিক্ষকরা কে কেমন, ফরাসী ভাষা আর লোমন্দের ব্যাকরণ কতদূর চলল, — সকলেই ভারি হাসিখুশি। সেসব কথা মনে পড়লে আজো পর্যন্ত ভালো লাগে। যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম পড়াশুনা করে বাবাকে খুশি করতে — দেখতাম আমার জন্যে তিনি তাঁর শেষ কপর্দকও ব্যয় করছেন, কী করে তিনি সামাল দিচ্ছিলেন ঈশ্বর জানেন। দিন দিন তিনি মনমরা,

অসন্তুষ্ট আর বদরাগী হয়ে উঠছিলেন। স্বভাবটা ও'র বিগড়ে গিয়েছিল। ব্যবসা ও'র দিনকে দিন খারাপের দিকে যাচ্ছিল, দেনায় ডুবে ছিলেন। ভয়ে মা না পারতেন কাঁদতে না কিছু বলতে—হট্ করে চটে উঠতেন তিনি। রুগ্ণ হয়ে যেতে লাগলেন মা, রোগা হতে হতে, বিছছিরি একটা কাশি ধরল ওঁর। ইস্কুল থেকে ফিরে দেখতাম সকলেরই মুখ ভার। মা চুপি চুপি কাঁদছেন, বাবা রেগে আছেন। শুরু হত বকা-ঝকা, ভর্ৎসনা। বাবা বলতেন, আমি তাঁকে কোনো আনন্দ, কোনো সান্ত্বনা দিতে পারছি না। আমার জন্যে তাঁরা তাঁদের শেষ পয়সাটুকুও ঢেলেছেন অথচ আমি আজও শিখতে পারি নি ফরাসী বলা। মোটের ওপর যতকিছু অসাফল্য আর দুর্ভাগ্য তার জন্যে দোষ ধরা হত মায়ের আর আমার। কিন্তু কী করে কষ্ট দেওয়া যায় আমার বেচারি মাকে! মায়ের মূর্তি দেখলেই বুক মোচড় দিয়ে উঠত আমার। গাল বসা, চোখ গর্তে—ক্ষয়রোগীর মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আর আমার হত সবচেয়ে দুর্ভোগ। তুচ্ছ কিছু একটা নিয়ে শুরু হত আর কোথায় যে গড়াত ঈশ্বর জানেন। মাঝে মাঝে ভেবেই পেতাম না, ব্যাপারটা কী নিয়ে। আমার বিরুদ্ধে কতই-না নালিশ—আমার ফরাসী-জ্ঞান নেই, আমি মাথা মোটা, প্রধান শিক্ষিকা হলেন একটি নির্বোধ—তিনি কর্তব্যে অবহেলা করেন এবং আমাদের নীতি-শিক্ষা সম্পর্কে একেবারে উদাসীন, বাবা নিজে এখনো কোনো কাজ জোটাতে পারেন নি, আর লোমন্দের ব্যাকরণটি হল একটি বাজে ব্যাকরণ, জাপোলস্কির বই অনেক ভালো, এক গাদা টাকায় আমার জন্যে ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে, আমার অনুভূতি নেই,—পাষাণ। মোট কথা, ক্রিয়াপদ আর বাক্যগঠন মুখস্থ করে আমি সব শক্তি অপচয় করেছি, কিন্তু সবকিছুর জন্যেই আমি দোষী। আমার বাবা যে আমায় ভালোবাসতেন না তা নয়। বরং উল্টো। মা আর আমায় তিনি পাগলের মতো ভালোবাসতেন। কিন্তু ঐ হল তাঁর স্বভাব।

চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট বিফলতায় বাবা একেবারে চরমে গিয়ে পেঁছিলেন, হয়ে উঠলেন সন্দিগ্ধ, খিটখিটে। প্রায়ই মরীয়া হয়ে উঠতেন তিনি, স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতেন না, ঠাণ্ডা লেগে অল্প একটু অসুখেই এমন হঠাৎ মারা গেলেন যে বেশ কয়েক দিন ধরে আমরা হতভম্ব হয়ে রইলাম। মা এমন নিঝুম হয়ে গেলেন যে তাঁর জন্যেই ভয় হতে লাগল।

বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে এসে ছেঁকে ধরল তাঁর পাওনাদাররা। যা কিছু ছিল, সব ছেড়ে দিতে হল। আমাদের আসার মাস ছয়েক পরে পিটারবুর্গস্কায়া পাড়ায় বাবা যে ছোট্ট বাড়িখানা কিনেছিলেন, সেটাও বিক্রি করে দিতে হল। শেষ পর্যন্ত কী করে সব রফা-নিষ্পত্তি হল জানা নেই, শুধু আমাদের না রইল বাড়ি, না একটা আশ্রয়, না কোনো উপায়। কঠিন অসুখে মা ক্ষয়ে যাচ্ছিলেন: নিজেদের খাওয়ার কিছু ছিল না, দিন গুজরানের কোনো আশা নেই, সামনে সমূহ সর্বনাশ। আমার বয়স তখন মাত্র চোদ্দ পেরিয়েছে। আন্না ফিওদরভনা সেই সময় প্রথম আমাদের কাছে আসেন। উনি বার বার করে বোঝালেন যে উনি কোন এক জমিদারনি এবং আমাদের আত্মীয়। মাও বললেন, উনি আত্মীয় হন, তবে খুব দূর সম্পর্কের। বাবা বেঁচে থাকার সময় উনি কখনো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন নি। এখন এলেন চোখে জল নিয়ে, বললেন আমাদের ভাগ্য নিয়ে তিনি ভাবিত হয়েছেন। শোক এবং দুরবস্থায় সহানুভূতি জানালেন। একথাও তিনি জানিয়ে দিলেন যে বাবারই দোষ, সাধ্যের বাইরে তিনি খরচা করতেন, একটু বেশি উঁচুতে উঠেছিলেন, নিজের ওপর ভরসা করেছিলেন একটু বেশি মাত্রায়। বললেন যে আমাদের সঙ্গে উনি চান সম্পর্ক ভালো রাখতে, দুপক্ষের বিবাদ ভুলে যেতে চান। মা যখন বললেন, তাঁর মনে কখনো কোনো বিরূপতা ছিল না, তখন উনি কেঁদে ফেললেন। তারপর মাকে নিয়ে গেলেন গির্জায় এবং মৃত প্রিয়জনের (আমার বাবার) জন্যে স্মৃতি তর্পণের বায়না দিলেন। এরপর মায়ের সঙ্গে তিনি ভাব করে নিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে।

নানা রকম ভূমিকা আর বাখানি করে আমাদের দুর্দশা, আমাদের সহায়-সম্বলহীন নিরুপায় অবস্থার কথা বেশ ফলাও করে জানিয়ে দিয়ে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর ওখানে ঠাঁই নিতে। মা ধন্যবাদ জানালেন বটে, তবু অনেক দিন মন স্থির করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু যেহেতু আর কোনো উপায় ছিল না, আর কিছু করবার ছিল না, তাই শেষ পর্যন্ত তিনি আন্না ফিওদরভনাকে জানালেন, তাঁর আমন্ত্রণ আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করছি। স্পষ্ট মনে পড়ে সেই সকালটা, যেদিন আমরা পিটারবুর্গস্কায়া পাড়া থেকে উঠে গেলাম ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপে। ঝকঝকে, শুকনো, শরতের হিমেল সকাল — মা কাঁদছিলেন, আমারও

ভারি কষ্ট হচ্ছিল। কেমন একটা আবছা ভয়াবহ আশঙ্কায় বুকটা যেন ভেঙে যাচ্ছিল... ভারি কষ্টের দিন গেছে সে সময়।

২

গোড়ায় গোড়ায় আমরা, মানে আমি আর মা আমাদের নতুন বাসায় থিতু হয়ে বসতে পারি নি, আন্না ফিওদরভনাকে আমাদের দুজনেরই কেমন ভয়-ভয় করত, বিদঘুটে লাগত। ষষ্ঠ পঙক্তিতে নিজের বাড়িতে বাস করতেন আন্না ফিওদরভনা। বাসের ঘর ছিল মোট পাঁচটি — তিনটিতে ছিলেন আন্না ফিওদরভনা এবং আমার পিসতুতো বোন সাশা — অনাথা মেয়ে, মা-বাবা নেই, ওকে উনি মানুষ করছিলেন। তারপর চতুর্থ ঘরখানায় থাকতাম আমরা। আমাদের পাশেই পঞ্চম ঘরখানায় ভাড়াটে ছিল পক্রোভস্কি নামে একটি গরিব উচ্চশিক্ষার্থী। আন্না ফিওদরভনা বেশ ভালোই থাকতেন, যা অনুমান করা সম্ভব তার চেয়েও বড়োলোকের মতো। কিন্তু তাঁর বিষয়-আশয় ছিল তাঁর কাজকর্মের মতোই রহস্যময়। সবসময়ই উনি ব্যস্তসমস্ত, সর্বদাই চিন্তিত, দিনে বার কয়েক করে বাইরে ঘুরে আসতেন। কিন্তু ঠিক কী নিয়ে উনি অমন ব্যস্ত তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। তাঁর চেনা-জানা লোক বিস্তর আর হরেক রকমের। বাড়িতে তাঁর লোক আসার বিরাম ছিল না। ঈশ্বর জানেন কে তারা — কী কাজে আসত মিনিটখানেকের জন্যে। দরজার ঘণ্টা বাজলেই মা আমাকে আমাদের ঘরের ভেতর পাঠিয়ে দিতেন। আন্না ফিওদরভনা এতে ভয়ানক চটে যেতেন মার ওপর, অনবরত বলতেন সেই এক কথা, আমরা ভারি অহঙ্কারী, অত অহঙ্কার আমাদের সাজে না — অহঙ্কারের কী আছে আমাদের! ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর মুখ আর বন্ধ হত না। অহঙ্কার নিয়ে এইসব খোঁটা আমি বুঝি নি তখনো। তেমনি কেবল এখনই বুঝেছি অন্তত আন্দাজ করতে পারি, আন্না ফিওদরভনার ওখানে থাকতে মার অত অনিচ্ছা ছিল কেন। বদমেজাজী মেয়ে ছিলেন উনি। অনবরত আমাদের জ্বালাতেন। আদৌ কেন যে আমাদের থাকবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছিলেন, তা এখনো আমার কাছে রহস্য। প্রথম দিকে খানিকটা নরমই ছিলেন তিনি, কিন্তু দু'দিন

না যেতেই যখন দেখলেন আমরা সত্যিই অসহায়, একান্তই কোথাও যাবার জায়গা আমাদের নেই, তখন তাঁর আসল মূর্তি প্রকাশ পেল। পরে ফের তিনি আমার ওপর খুব সদয় হয়ে উঠেছিলেন — এমনকি অশোভন রকমের সদয়, তোষামোদ পর্যন্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম দিকে আমাকেও সইতে হয়েছে মায়ের মতো। ক্ষণে ক্ষণে আমাদের তিনি খোঁটা দিতেন, বার বার করে তিনি তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের কথা তুলতেন — এছাড়া যেন আর কিছুই তাঁর বলবার ছিল না। বাইরের লোকেদের কাছে তিনি আমাদের পরিচয় দিতেন তাঁর গরিব আত্মীয় বলে — অসহায় বিধবা আর অনাথা, কৃপা করে খ্রীষ্টানসুলভ করুণায় আমাদের তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। খাবার সময় কড়া নজর করে দেখতেন ক'গ্রাস আমরা মুখে তুলছি, কিন্তু যদি না খেতাম, তাহলেও আবার এক কাণ্ড বাধিয়ে বসতেন: আমাদের নাকি কিছু রুচছে না, মাপ করো গো, যা আমার আছে তাতেই নিজেকে ধন্যি মানি, এর চেয়ে ভালো কখনো জুটেছে আমাদের? ক্ষণে ক্ষণে বাবাকে গাল পাড়তেন; বলতেন, যেমন সকলের চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকতে গিয়েছিলেন তেমনি দাঁড়াল সবচেয়ে খারাপ, বৌ-মেয়েকে ভাসিয়ে দিয়েছেন, ভাগ্যিস একজন উপকারী আত্মীয় ছিল — সমব্যথী খ্রীষ্টান — নইলে, ভগবান জানেন, না খেয়েই মরতে হত রাস্তায়। কী না বলতেন উনি! সেসব কথা শুনে কষ্ট যত না হত, তার চেয়েও বেশি হত বিতৃষ্ণা। মা ঘন ঘন কাঁদতেন, দিন দিন তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে শুরু করল: স্পষ্টতই তিনি ক্ষয়রোগে পড়েছিলেন। তা সত্ত্বেও আমরা সকাল থেকে রাত অবধি কাজ করে যেতাম — ফরমাশ নিয়ে সেলাই ফোঁড়াই করতাম। এতেও খুব অসন্তুষ্ট হতেন আন্না ফিওদরভনা, বলতেন তাঁর বাড়িখানা ফ্যাশনের দোকান নয়। কিন্তু নিজেদের জামাকাপড় তো দরকার, আচমকা কোনো খরচার পয়সা জোটাতে হবে তো। আমাদের নিজেদের বলতে কিছু টাকাও হাতে রাখা খুবই দরকার। তাছাড়া টাকা জমাচ্ছিলাম এই আশায় যে একসময় অন্য কোথাও উঠে যাওয়া যাবে। কিন্তু মায়ের স্বাস্থ্যের যেটুকু বাকি ছিল কাজ করতে গিয়ে তাও শেষ হয়ে গেল। রোগ নিশ্চয় কীটের মতো কুরে কুরে খাচ্ছিল তাঁর জীবন, মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। আর সবই আমি বুঝতাম, সবই দেখতাম, সবই সহ্য করতাম, সবই ঘটছিল আমার চোখের সামনে!

একটার পর একটা দিন কাটতে লাগল একইরকম। আমরা থাকতাম খুব চুপচাপ, যেন শহরে নেই। আন্না ফিওদরভনা যখন নিজেই দেখলেন যে আমাদের ওপর তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন ক্রমে তিনিও একটু শান্ত হয়ে এলেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধতা করার কথা কেউ কখনো স্বপ্নেও ভাবত না। তাঁর মহল থেকে আমাদের ঘরখানা ছিল আলাদা, মাঝখানে একখানা বারান্দা। পাশের কামরাটায় থাকত পক্রোভস্কি — সে তো আগেই বলেছি। ফরাসী আর জার্মান ভাষা, এবং ইতিহাস ও ভূগোল — অর্থাৎ আন্না ফিওদরভনার উক্তি মতো, সর্ব বিদ্যায় সাশাকে শিক্ষা দিত ছেলেটি, পরিবর্তে থাকতে খেতে পেত। সাশার বয়স তখন তেরো, বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল যদিও খানিকটা দামাল, দুরন্ত। আন্না ফিওদরভনা একবার মাকে বলেছিলেন, ইস্কুলে আমার পড়া তো শেষ হয় নি, আমিও যদি পড়ি মন্দ হবে না — মা সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। সাশার সঙ্গে আমিও সারা বছর পড়লাম পক্রোভস্কির কাছে।

পক্রোভস্কি ছিল গরিব, খুবই গরিব একটি তরুণ। স্বাস্থ্য খারাপ বলে পড়াশুনোয় নিয়মিত্ যেতে পারত না, তবু যে তাকে উচ্চশিক্ষার্থী বলা হত সে শুধু নেহাৎ অভ্যেসের বশে। থাকত সে সামান্যভাবে, শান্তিতে, চুপচাপ, আমাদের ঘর থেকে তার উপস্থিতিই টের পাওয়া যেত না। দেখতেও ছিল অদ্ভুত — হাঁটা চলা তার বিদঘুটে, আনাড়ীর মতো, নমস্কার করে কথা বলত এমন অদ্ভুত ঢঙে যে প্রথম প্রথম হাসি চেপে রাখা আমার দায় হত। সবসময়েই ওর পেছনে লাগত সাশা, বিশেষ করে ও যখন পড়া দিত। এর ওপর লোকটা ছিল আবার খিটখিটে স্বভাবের — কেবলি রেগে যেত। সামান্য একটুকুতেই আমাদের ওপর চিৎকার করে, নালিশ জানিয়ে, পড়া শেষ হবার আগেই ছুটে যেত প্রায়ই নিজের ঘরে। সেখানে দিনের পর দিন বসে থাকত বইয়ে মুখ গুঁজে। বই ছিল ওর অনেক — সবগুলিই খুব দুর্লভ আর দামী। অন্যকিছু জায়গায় পড়িয়েও খানিক টাকা রোজগার করত সে। আর টাকা হাতে পেলেই ছুটত বই কিনতে।

পরে ওকে জেনেছি আরো ভালোভাবে, লোকটি ভারি ভালো মানুষ — যত জনকে দেখেছি সবচাইতে সেরা। মা ওকে খুব সম্মান করতেন, পরে ও-ই হয়ে উঠেছিল আমার সবচেয়ে বড়ো বন্ধু, মায়ের পর অবশ্য।

কিন্তু এত বুড়িধাড়ী মেয়ে আমি, প্রথম প্রথম সাশার সঙ্গে আমিও ওর

পেছনে লাগতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেবে ভেবে ওকে খুঁচিয়ে রাগিয়ে দেবার নতুন নতুন ফন্দি বার করতাম আমরা। রাগলে ওকে ভারি বিদঘুটে দেখাত, আর কী মজাই না লাগত আমাদের! (এখন সেসব কথা ভাবলে লজ্জাই পাই।) একবার আমরা ওকে প্রায় কাঁদিয়ে ছেড়েছিলাম। পরিষ্কার শুনলাম ও বিড়বিড় করে বলছে, 'উঃ, কী নিষ্ঠুর এই বাচ্চা মেয়েগুলো!' শুনে হঠাৎ আমার থতমতো লাগল, লজ্জা হল, বিছছিরি লাগল, কষ্ট হল ওর জন্যে। মনে আছে, আকর্ণ লাল হয়ে উঠে নিজেও প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় মিনতি করেছিলাম, যেন কিছু মনে না করেন, নির্বোধ তামাসাগুলোর জন্যে যেন রাগ না করেন আমাদের ওপর। ও কিন্তু বই বন্ধ করে, পড়া শেষ না করেই চলে গেল নিজের ঘরে। সারা দিন আমি অনুশোচনায় জ্বললাম। আমরা ছেলেমানুষেরাই যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে ওকে কাঁদিয়ে ছেড়েছি, ভাবতে অসহ্য লাগছিল। আমরা তো জানতামই ও কাঁদবে, আমরা তো চেয়েই ছিলাম ও কাঁদুক, ওর সহ্যের সীমা ভাঙুক! দুটি বাচ্চায় মিলে আমরা দুঃখী বেচারিকে তার দুর্ভাগ্যের কথা মনে করিয়ে দিয়েছি জোর করে! সে রাতে আমি ঘুমতে পারি নি, দুঃখে, কষ্টে, অনুশোচনায়। লোকে বলে অনুশোচনায় নাকি মন হালকা হয়। একদম বাজে! আমার দুঃখের সঙ্গে কেমন করে একটু আহত অহমিকাও জড়িয়ে ছিল বুঝি, জানি না। আমি চাই নি ও আমাকে বাচ্চা মেয়ে বলে গণ্য করবে। তখন আমার বয়স পনেরো।

সেদিন থেকে কি করে আমার সম্পর্কে পক্রোভস্কির ধারণা বদলানো যায়, তারই হাজার রকমের ফিকির ভেবে ভেবে কল্পনা আমার ক্লিষ্ট উঠল। কিন্তু আমি ছিলাম লাজুক গোছের, ভারি ভীতু, কিছুই স্থির করে উঠতে পারলাম না, রইলাম শুধু স্বপ্ন নিয়ে (আর কী সেসব স্বপ্ন!)। শুধু সাশার সঙ্গে তামাসায় যোগ দেওয়া বন্ধ করলাম; ওতেই ওর রাগ পড়ে গেল। কিন্তু আমার অহমিকার কাছে এটুকু নিতান্তই কিছু নয়।

এবার আমার পরিচিতদের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত, সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক এবং সবচেয়ে করুণ একটি মানুষ সম্পর্কে দুটো কথা বলি। আমার নোটখাতাটার এই জায়গায় তার কথা তুলছি কারণ এ পর্যন্ত তাকে আমি প্রায় কোনো রকম লক্ষ্যেই আনি নি। অর্থাৎ পক্রোভস্কি সংক্রান্ত সবকিছুই হঠাৎ ভারি আশ্চর্য লাগল আমার কাছে!

এ বাড়িতে মাঝে মাঝে আসত একটি ছোটোখাটো বুড়ো মতো লোক — ময়লা পোশাক-আশাক, পাকাচুল, আড়ষ্ট ভাবভঙ্গি — মোটের ওপর ভারি অদ্ভুত। প্রথম দেখেই মনে হত লোকটা কিসে যেন সবসময়েই সঙ্কুচিত হয়ে আছে, নিজেকে নিয়েই যেন তার লজ্জা। সেইজন্যেই লোকটা এমন জড়োসড়ো হয়ে আছে, এমন ঢঙ করছে, ছটফট করে উঠছে যে প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যেত লোকটার মাথার ঠিক নেই। বাড়িতে এসে ঢোকার সাহস হত না ওর, দাঁড়িয়ে থাকত সদর বারান্দায় কাচের দরজার বাইরে। কেউ যদি কাছ দিয়ে যেত, আমি অথবা সাশা অথবা কোনো চাকরবাকর যাকে সে নিজের ওপর সদয় বলে জানত, অমনি সে হাতছানি দিয়ে ডাকত আমাদের, নানা রকম ইশারা করত। কেবল মাথা নেড়ে ওকে যখন বোঝানো হত যে বাড়িতে বাইরের কেউ নেই, যখন খুশি সে আসতে পারে, কেবল তখন বন্ধ দরজাটি খুলত সন্তর্পণে, আনন্দে হাসি ফুটত মুখে, হাতে হাত ঘষত খুশিতে, এবং পা টিপে টিপে সোজা চলে যেত পক্রোভস্কির ঘরে। লোকটা পক্রোভস্কির বাবা।

বেচারা বৃদ্ধের খুঁটিনাটি পুরো কাহিনী আমি পরে শুনেছি। এক সময় চাকরি করত সে। কোনো রকম গুণপনা ছিল না, একেবারে সবচেয়ে নিচু ধাপের নেহাৎ তুচ্ছ একটা পদ। প্রথম বৌ, পক্রোভস্কির মা, মারা যাবার পর ও দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করার কথা ভাবে এবং বিয়ে করে একটি মধ্যবিত্তাকে। নতুন বৌয়ের আমলে বাড়ির সবকিছুই ওলটপালট হয়ে গেল। মেয়েটি কাকেও শান্তি দিত না, সবাইকে রাখত হাতের মুঠোয়। পক্রোভস্কি তখনও ছেলেমানুষ, দশ বছর বয়স। সৎ মা তাকে দু'চোখে দেখতে পারত না, কিন্তু কপাল ভালো ছিল ওর। ছাত্র পক্রোভস্কির বাপের সঙ্গে জানা ছিল এবং তার উপকার করেছিলেন এমন একজন জমিদার — নাম তাঁর বিকভ, তিনি ছেলেটির দায়িত্ব নেন এবং কোন একটা ইস্কুলে পাঠালেন তাকে। ছেলেটি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কারণ, তার বিগতা মাকে তিনি জানতেন, তরুণী মহিলাটির হিতৈষিণী হিশেবে হাজির হয়েছিলেন আন্না ফিওদরভনা, এবং তিনিই কেরানি পক্রোভস্কির সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেন। আন্না ফিওদরভনার বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ ছিলেন বিকভ মশাই। দয়াপরবশ হয়ে তিনি কনের যৌতুক হিশেবে দেন পাঁচ হাজার রুবল। সে টাকাটার কী হল তা জানা যায় নি। আন্না ফিওদরভনার কাছ থেকে আমি

এইটুকুনই শুনেছিলাম। ছাত্র পক্রোভস্কি তার পারিবারিক বিষয় সম্পর্কে কথা কইতে পছন্দ করত না। শুনেছিলাম, পক্রোভস্কির মা নাকি খুব সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু অমন একটা অসার্থক বিয়ে, অমন নগণ্য একটা লোককে বিয়ে তিনি কেন করেছিলেন, ভেবে অবাক লাগে... অল্প বয়সেই মারা যান উনি, বিয়ের চার বছর পরেই।

ইস্কুলের পড়া শেষ করে তরুণ পক্রোভস্কি কী একটা উচ্চ শিক্ষায়তনে এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকে। বিকভ মশাই প্রায়ই পিটারবুর্গে আসতেন — ছেলেটির অভিভাবকতা তিনি পরিহার করেন নি। অস্বাস্থ্যের কারণে যখন ছেলেটি পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল, তখন বিকভ তাকে আন্না ফিওদরভনার কাছে সুপারিশ করে পাঠান। ফলে যা দরকার সবকিছু সাশাকে পড়ানোর কড়ারে আন্না ফিওদরভনা তাকে থাকতে খেতে দেন।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পক্ষের বৌয়ের নিষ্ঠুরতায় দুঃখে-কষ্টে বুড়ো পক্রোভস্কির অতি জঘন্য বদভ্যাস শুরু হয়, প্রায় সবসময়েই মদ খেয়ে থাকতে শুরু করল সে। বৌ ওকে ধরে পেটাত, শুতে দিত রান্নাঘরে, অবশেষে এমন এক অবস্থায় ওকে এনে ফেলল, যে কিলঘুষি আর দুর্ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে গেল সে, নালিশ পর্যন্ত করত না। আসলে বয়স খুব একটা বেশি না হলেও নেশায় তার বুদ্ধিশুদ্ধি প্রায় লোপ পেয়েছিল। ওর মধ্যে মানবিক সদ্‌গুণ বলতে একমাত্র যেটুকু ছিল, তা শুধু পুত্রের জন্যে অসীম স্নেহ — ছেলেটা হুবহু তার মায়ের চেহারা পেয়েছে। হয়ত মমতাময়ী সেই প্রথমা স্ত্রীর স্মৃতির জন্যেই কি এই ভেঙে-পড়া বুড়ো মানুষটার পুত্রস্নেহের এমন প্রাবল্য? বুড়োর মুখে আর কিছু নয় শুধু ছেলের কথা। বরাবর সপ্তাহে দুবার এসে দেখে যেত। বেশি আসার সাহস পেত না কেননা বাপের উপস্থিতি সইতে পারত না পুত্র পক্রোভস্কি। ছেলের সমস্ত দোষ ত্রুটির মধ্যে প্রধান ছিল বাপের প্রতি অশ্রদ্ধা। বুড়োটাকেও মাঝে মাঝে মনে হত দুনিয়ার সবচেয়ে অপ্রীতিকর জীব। প্রথমত, লোকটা ছিল ভয়ঙ্কর কৌতূহলপরায়ণ। দ্বিতীয়ত, নিতান্ত অর্থহীন আর বাজে কথাবার্তা ও জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেলের পড়ায় ব্যাঘাত ঘটাত এবং শেষত মাঝে মাঝে দেখা দিত মত্ত অবস্থায়। বাপের বদভ্যাস, তার অযথা কৌতূহল ও অবিরাম বকবকানি ছেলে ছাড়িয়েছিল খানিকটা। আর শেষে দাঁড়াল এই যে বাপ সব ব্যাপারে ছেলেকে প্রায় দেবতার মতো

মান্য করতে শুরু করলে, তার অনুমতি ছাড়া মুখ খুলতেও সাহস পেত না।

পেতেঙ্কার (ছেলেকে এই নামেই বুড়ো ডাকত) জন্যে বুড়োর বিস্ময় আর আনন্দের সীমা ছিল না। ছেলেকে যখন দেখতে আসত, তখন প্রায় সর্বদাই দেখা যেত বুড়োর মুখচোখে একটা ভীরু ভীরু শঙ্কিত ভাব — সম্ভবত এইজন্যে যে কিরকম অভ্যর্থনা জুটবে, তা জানা থাকত না। সাধারণত ঢুকতে বহুক্ষণ ইতস্তত করত সে, আর দৈবাৎ যদি আমার দেখা পেত, তাহলে ঝাড়া বিশ মিনিট ধরে সে জিজ্ঞাসাবাদ করে চলত: কেমন আছে পেতেঙ্কা? শরীর ভালো তো? মেজাজটা ঠিক কেমন? জরুরি কোনো কাজে ব্যস্ত নয় তো? ঠিক কী করছে? লিখছে কি, পড়ছে, নাকি কোনো ভাবনা নিয়ে আছে? যথেষ্ট পরিমাণে বুড়োকে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করলে তবে সে ঢুকবে বলে মন ঠিক করত, আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে দরজা খুলত। প্রথমে মুখটি বাড়িয়ে দিত। যদি দেখত যে ছেলে রাগ করে নেই, কি মাথা নেড়ে অভিবাদন করেছে, তখন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে ওভার কোট টুপি খুলত — টুপিটা তার সর্বদাই থাকত দলামোচড়া, ফুটো-ফুটো, এবং কানাভাঙা। কোট টুপি ঝুলিয়ে রাখত, সবই চুপে চুপে, নিঃশব্দে, তারপর সাবধানে বসত কোনো একটা চেয়ারে আর সারাক্ষণ পেতেঙ্কার দিকে চেয়ে থেকে তার সমস্ত ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে বুঝি তার মেজাজ কিরকম আন্দাজ করার চেষ্টা করত। পেতেঙ্কার মেজাজ সামান্য খারাপ থাকলে এবং সে তা টের পেলে তক্ষুনি উঠে দাঁড়াত, বিড়বিড় করে বোঝাবার চেষ্টা করত যে সে এই পথ দিয়েই যাচ্ছিল, একটু বসে গেল আর-কি। তারপর কোনো কথা না বলে বিনীতের মতো কোট আর সেই টুপিটা নিয়ে ফের সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে যেত — দুঃখের ভার চাপা দেবার জন্যে, ছেলের কাছে তা প্রকাশ না করার জন্যে জোর করে হাসি ফোটাত মুখে।

আবার যদি ভালো অভ্যর্থনা জুটত, তাহলে বুড়োর আনন্দ আর ধরত না। তার মুখ ভরে, প্রতিটি ভাবভঙ্গিতে ফুটে বেরুত তৃপ্তি। ছেলে যদি ওর সঙ্গে কথা কইত, তাহলে সর্বদাই চেয়ার ছেড়ে একটু উঠে দাঁড়াত সে, উত্তর দিত বিনীত ভঙ্গিতে, প্রায় দাসের মতো, সসম্ভ্রমে, এবং বাছা বাছা অর্থাৎ অতি হাস্যকর একটা ভাষায়। কথা বলায় বেচারার দক্ষতা ছিল

না, গুলিয়ে ফেলত, ঘাবড়ে যেত, হাতদুটো নিয়ে, নিজেকে নিয়ে কী করবে যেন ভেবে পেত না, এবং অনেকখন ধরে জবাবটা মনে মনে বিড়বিড় করে যেন ঠিক করে নিতে চাইত। জবাবটা যদি ভালোমতো দাঁড়াত তাহলে বৃদ্ধ টান-টুন হয়ে, ওয়েস্ট কোট, টাই আর ফ্রক কোট ঠিকঠাক করে নিয়ে মর্যাদার ভাব করত। মাঝে মাঝে এত খুশি হত, এতই সাহস পেত যে আস্তে উঠে যেত বইয়ের তাকের কাছে, কোনো একটা বই টেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ কিছু না কিছু পড়তে শুরু করে দিত তা সে বইটা যাই হোক। এটা সে করত একটা ভান করা নির্বিকার ভাব নিয়ে যেন ছেলের বই নিয়ে কর্তাত্বি করতে পারে সর্বদাই, যেন পেতেঙ্কার পিতৃভক্তিতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু একবার দেখেছিলাম পক্রোভস্কি বইগুলোতে হাত না দিতে বলায় কিরকম ভয় পেয়ে গিয়েছিল বেচারি। বিব্রত হয়ে সে বইটা গুঁজে রাখল উল্টো করে তারপর ভুল সংশোধন করতে গিয়ে ফের ঢুকিয়ে রাখল পিঠের দিকটা আগে করে। আর লাল হয়ে হাসল, ভেবে পেল না কী করে স্খালন করা যায় তার অপরাধ। সুবুদ্ধি দিয়ে পক্রোভস্কি বাপের বদভ্যাস খানিকটা ছাড়ায়, আর যদি পর পর তিনবার ওকে প্রকৃতিস্থ দেখত তাহলে পঁচিশ কি পঞ্চাশ কি আরো বেশি কোপেক ওকে দিত বিদায়ের সময়। মাঝে মাঝে এক জোড়া বুট কি টাই কি ওয়েস্ট কোট কিনে দিত। তা পেয়ে বুড়োর গর্ব কী, যেন একটি লক্কা পায়রা। মাঝে মাঝে ও আসত আমাদের কাছে, সাশা আর আমার জন্যে আনত মশলাদার বিস্কুট আর আপেল, আলাপ করত পেতেঙ্কার সম্পর্কে। আমাদের উপদেশ দিত মন দিয়ে পড়াশুনা করতে, এবং বোঝাত যে পেতেঙ্কা একটি আদর্শ সুপুত্র, তার ওপরে আবার বিদ্বান পুত্র। এই কথা বলে সে এমন হাস্যকরভাবে আমাদের দিকে চেয়ে বাঁ চোখ মটকাত, এমন মজা করে অঙ্গভঙ্গি করত যে হেসে ফেটে পড়তাম আমরা। মাও লোকটাকে পছন্দ করতেন, কিন্তু আন্না ফিওদরভনাকে বুড়ো দেখতে পারত না, অথচ ওঁর সামনে বুড়ো একেবারে কীটানুকীট।

শিগগিরই পক্রোভস্কির কাছে আমার পড়াশুনা শেষ হয়ে গেল। আগের মতোই আমাকে সে ভাবত ছেলেমানুষ — সাশার মতোই ইস্কুলের একটি দামাল মেয়ে। এতে মনে ঘা লাগত আমার, কেননা আমার আগের ব্যবহার আমি শোধরাবার চেষ্টা করছিলাম প্রাণপণে, কিন্তু সে নজরই

দিত না, তাতে ক্রমেই বেশি করে রাগ হত আমার। পড়া ছাড়া ওর সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় বলতামই না — বলতেই পারতাম না। লাল হয়ে উঠে কেমন থতমতো খেতাম — তারপর কোণে গিয়ে কাঁদতাম হতাশায়।

একটা অদ্ভুত ঘটনায় আমাদের নৈকট্যে সাহায্য না হলে এর পরিণতি কী দাঁড়াত কে জানে। একদিন সন্ধ্যেয় মা যখন আন্না ফিওদরভনার কাছে বসে আছেন, তখন আমি চুপি চুপি পক্রোভস্কির ঘরে গিয়ে ঢুকি। জানতাম ও বেরিয়ে গেছে। কেন যে ওর ঘরে ঢোকার খেয়াল হল বলতে পারি না। এক বছরেরও বেশি পাশাপাশি থাকলেও এর আগে কখনো ওর ঘরে আমি উঁকি দিই নি। বুক এমন ঢিপ ঢিপ করছিল যেন ভেঙে পড়ে বুঝি। অদ্ভুত এক কৌতূহলে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম চারিদিকে। ঘরে আসবাবপত্র সামান্য, রেখেছেও অগোছালো করে। দেয়ালে বইয়ের পাঁচটি তাক। চেয়ার টেবিলগুলো কাগজে ভর্তি। সর্বত্র শুধু বই আর কাগজ! অদ্ভুত কী সব চিন্তা ঢুকল মাথায় — সেইসঙ্গে খেদের কেমন একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি। মনে হল আমার বন্ধুত্ব আর ভালোবাসায় ওর কী এসে যায়? ও হল বিদ্বান লোক — আর আমি একেবারে মুখ্যু, কিছুই জানি না আমি, কিছুই পড়ি নি, একটি বইও নয়... বইয়ের ভারে ভেঙে পড়ো-পড়ো লম্বা তাকগুলোর দিকে আমি চেয়ে রইলাম ঈর্ষা নিয়ে। হতাশা, মন-পোড়ানি, কেমন একটা ক্ষেপামি পেয়ে বসল আমায়। ইচ্ছে হল এবং তক্ষুনি স্থির করে বসলাম, ওর বইগুলো পড়ে ফেলতে হবে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকটি, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ঠিক জানি না, হয়ত আমার ধারণা হয়েছিল, ও যা জানে, সব জেনে নেবার পর নিশ্চয় আমি ওর বন্ধুত্বের যোগ্য হতে পারব। ছুটে গেলাম প্রথম তাকটার দিকে, না ভেবে-চিন্তে তাড়াহুড়ো করে আমি হাতের কাছে যা পেলাম, টেনে নিলাম পুরনো ধুলো-মাখা একটা বই, কখনো রাঙা হয়ে কখনো ফ্যাকাশে মেরে ভয়ে আর উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ঘরে নিয়ে এলাম চুরি করা বইখানা। ঠিক করেছিলাম, মা ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রে মোমবাতির আলোয় পড়ে শেষ করব।

কিন্তু ঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি বইটা খুলে কী হতাশই না হলাম। দেখা গেল জিনিসটা ল্যাটিনে লেখা, পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া পোকায় কাটা একটি বই। তৎক্ষণাৎ ফিরে গিয়ে বইটা শেল্‌ফে তুলে রাখতে গেছি, এমন সময়

বারান্দায় শোনা গেল গোলমাল আর কাছেই পায়ের শব্দ। তাড়াহুড়ো করছিলাম আমি। ছটফট করছিলাম — এমন ঠেসে রাখা ছিল হতচ্ছাড়া বইটা যে বার করা মাত্রই আশেপাশের বইগুলো আপনা থেকে সরে এসে ওর জায়গাটা ভরে দিয়েছে। কিছুতেই ফের ওটাকে ঠেসেঠুসে ঢোকাতে পারছিলাম না। তবে যথাশক্তি জোর দিয়ে ঠেলতে শুরু করলাম। মরচে-ধরা যে পেরেকগুলোর ওপর শেল্‌ফ্‌টা টাঙানো ছিল, তারা বোধ হয় ভেঙে পড়ার জন্যে এই মুহূর্তেরই অপেক্ষায় ছিল, এবং ভেঙেও পড়ল। এক দিকে ঝুলে পড়ল শেল্‌ফ্‌টা। সশব্দে বইপত্র ছড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। দরজা খুলে পক্রোভস্কি ঢুকল ঘরে।

বলে রাখা ভালো যে তার জিনিসপত্রের ওপর কেউ কিছু কর্তাত্বি করলে পক্রোভস্কি সইতে পারত না। আর তার বইগুলো ছুঁলে তো কথাই নেই! তাই সরু মোটা নানা চেহারা এবং নানা কলেবর, নানা আকৃতির বইগুলো যখন শেল্‌ফ্‌ থেকে খসে পড়ে লাফাতে লাগল টেবিল চেয়ারের তলা থেকে শুরু করে ঘরের সবখানে তখন আমার যে কী আতঙ্ক তা সহজেই বোঝা যায়। ভাবলাম পালাই, কিন্তু তখন বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। মনে হল গেছি, 'এবার সব শেষ, একেবারে শেষ! দফারফা! দশ বছরের বাচ্চার মতো দুষ্টুমি করেছি, দামালপনা করেছি। বোকা মেয়ে আমি, বেদম বোকা একটা মেয়ে!!' পক্রোভস্কি একেবারে রেগে আগুন। চেঁচিয়ে উঠল, 'বা, এটাও বাকি ছিল তাহলে! এরকম দুষ্টুমি করতে লজ্জা করে না আপনার? শান্ত হবেন কি কখনো?' এবং কুড়তে গেল বইগুলো। সাহায্য করার জন্যে আমিও নিচু হতেই সে ধমকে উঠল, 'থাক থাক হয়েছে! যেখানে আপনাকে ডাকা হয় নি সেখানে না গেলেই বরং ভালো করবেন।' কিন্তু আমার বিনীত মুখভাবে বোধ হয় একটু নরম হয়ে এসেছিল সে। সেদিনকার শিক্ষকের অধিকার খাটিয়ে সেদিনের মতো উপদেশদানের সুরে খানিকটা শান্তভাবে সে বলে চলল, 'কবে আপনার চৈতন্য হবে? কবে একটু ভেবে দেখবেন: নিজের দিকে একটু চেয়ে দেখুন, আপনি তো আর ছেলেমানুষ নন, কচি খুকিটি নন। পনেরো বছর বয়স!' এবং সম্ভবত আমি যে সত্যিই আর ছেলেমানুষ নই সেটা যাচাই করার জন্যে আমার দিকে তাকিয়েই সে আকর্ণ লাল হয়ে উঠল। আমি কিছু বুঝি নি, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই ছিলাম তার দিকে। ও উঠে দাঁড়িয়ে অপ্রস্তুতের

মতো এগিয়ে এল আমার কাছে, ভয়ানক তার বিব্রত অবস্থা, কিসব বললে, মনে হয় যেন মাপ চাইলে এই জন্যে যে ওর নজরে পড়েছে আমি বড়ো হয়ে উঠেছি। অবশেষে ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল আমার। ঠিক কী যে আমার হল তখন জানি না। থতমতো খেলাম আমি, লাল হয়ে উঠলাম, ওর চেয়েও বেশি লাল হয়ে মুখ ঢেকে ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম ঘর থেকে।

ভেবে পাচ্ছিলাম না কী করি, লজ্জা রাখার ঠাঁই ছিল না আমার। ওর ঘরে গেছি, তা দেখে ফেলেছে ও, এটাই তো এক সাংঘাতিক কথা! তিন দিন ধরে ওর দিকে চাইতে পারি নি আমি, লজ্জায় এত লাল হয়েছি যে চোখে জল এসে গেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব হাস্যকর চিন্তা ভিড় করেছে মাথায়। তার মধ্যে একটা সবচেয়ে উদম ভাবনাটা হল এই, যাই ওর কাছে সব খুলে বলি, কবুল করি,—সবটা জানিয়ে ওকে বোঝাই যে আমি যা করেছি সেটা নিতান্ত একটি বোকা মেয়ের মতো নয়, ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে। যাব বলে মন প্রায় ঠিক করে ফেলেছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সাহসে কুলোল না! বেশ বুঝি, কী যে করে বসতাম। এখনো ভাবতে লজ্জা করে।

দিন কয়েক পরে মা হঠাৎ খুব কঠিন অসুখে পড়লেন। দু'দিন শয্যা থেকে ওঠেন নি। তৃতীয় দিন রাত থেকে জ্বর খুব বেড়ে গেল, ভুল বকতে লাগলেন। মার শুশ্রূষায় এক রাত আমি ঘুমোই নি, তাঁর খাটের কাছে বসে থাকতাম, ওষুধপত্র আর জল খাওয়াতাম। দ্বিতীয় রাতে আমি একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। থেকে থেকেই ঘুম আসছিল, চোখের সামনে যেন সবুজ সবুজ ছোপ জেগে উঠছে, মাথা টলছে, যেকোনো মুহূর্তেই ক্লান্তিতে ঢলে পড়তে পারতাম, কিন্তু মা'র ক্ষীণ কাতরানির শব্দ আমায় জাগিয়ে দিচ্ছিল, মুহূর্তেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠছিলাম, কিন্তু ঠিক ফের এসে আচ্ছন্ন করছিল তন্দ্রা। সে এক ভারি যন্ত্রণা! আমি বলতে পারব না, ঠিক মনে নেই আমার, কিন্তু ঘুম আর জাগায় যখন এমনি যন্ত্রণাকর লড়াই চলছে তখন হঠাৎ একটা ভয়ংকর স্বপ্ন, একটা বিভীষিকা আমার বিপর্যস্ত মনের ওপর কেমন যেন ভেসে উঠল। আতঙ্কে জেগে উঠলাম আমি। ঘরটা অন্ধকার, রাতের মোমবাতি নিবে আসছে, হঠাৎ সারা ঘরে তার আলো কখনো ছড়িয়ে পড়ছে, কখনো সামান্য ঝলক দিচ্ছে দেয়ালে, কখনো বা একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কেন জানি একটা ভয় — কেমন একটা আতঙ্ক ঘিরে ধরল আমাকে, দুঃস্বপ্নে উত্তেজিত হয়ে উঠল

আমার কল্পনা; কণ্ঠে পিষে যাচ্ছিল আমার বুক। ...অজ্ঞাতসারে কী একটা অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে আমি লাফিয়ে উঠলাম চেয়ার থেকে। ঠিক সেইসময় দরজা খুলে পক্রোভস্কি ঘরে ঢুকল।

শুধু এইটুকু মনে আছে, চৈতন্য ফিরে আসতে দেখি পক্রোভস্কি আমায় ধরে আছে। সযত্নে সে আমায় আরাম কেদারায় বসিয়ে এক গেলাস জল খেতে দিলে, তারপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিগ্যেস করে গেল। উত্তরে কী বলেছিলাম মনে নেই। আমার হাতটা টেনে নিয়ে ও বললে, 'আপনার অসুখ করেছে, নিজেই আপনি অসুস্থ, জ্বর উঠেছে আপনার, নিজেকে আপনি ধ্বংস করছেন, কেয়ার করছেন না নিজের স্বাস্থ্যের, শান্ত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন দেখি। দু'ঘণ্টা পরে ডেকে দেব। একটু সুস্থির হয়ে নিন, শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন!' আপত্তির একটা কথাও আমায় বলতে না দিয়ে ও জিদ করতে লাগল। ক্লান্তিতে আমার শক্তি তখন আর নেই, দুর্বলতায় চোখের পাতা তুলতে পারছি না। আধ-ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেব এই ভেবে আমি আরাম কেদারায় আধ-শোয়া হয়ে রইলাম। কিন্তু ঘুমোলাম সকাল পর্যন্ত। পক্রোভস্কি কেবল তখন আমাকে ডেকে দিয়েছিল, কেননা তখন মা'কে ওষুধ খাওয়াবার সময়।

পরের দিন, দিনের বেলা খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়ে মায়ের বিছানার পাশে আরাম কেদারায় বসার আয়োজন করছি, স্থির সঙ্কল্প করেছি এবার ঘুমিয়ে পড়া চলবে না, এমন সময় ঠিক এগারোটায় পক্রোভস্কি আমাদের ঘরের দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে দিতেই বলল, 'একা একা বসে থাকতে আপনার একঘেয়ে লাগবে, এই বইটা নিন, সময় কাটাতে পারবেন।' বইটি নিলাম। মনে নেই, কী বই ওটা, আদৌ বোধ হয় তার কোনো পাতা উলটাই নি, যদিও ঘুম আসে নি সারা রাত। অদ্ভুত এক উত্তেজনা আমায় জাগিয়ে রেখেছিল। এক জায়গায় বসে থাকতে পারছিলাম না, কয়েক বার উঠে পায়চারি করেছিলাম ঘরময়। ভেতরকার কেমন একটা তৃপ্তি যেন ছড়িয়ে পড়েছিল আমার সারা সত্তায়! ও যে আমার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, তাতে ভারি আনন্দ হয়েছিল আমার। আমাকে নিয়ে ওর উদ্বেগে, যত্নে গর্ব হচ্ছিল। সারা রাত আমি বসে বসে ভাবলাম আর স্বপ্ন দেখলাম। পক্রোভস্কি আর আসে নি, জানতাম আসবে না। ভাবতে লাগলাম, পরের রাত নিয়ে।

পরদিন সন্ধ্যেয় সকলে শুতে গেলে, পক্রোভস্কি তার ঘরের দরজা খুলে চৌকাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা কইলে। কী কথা আমরা বলাবলি করেছিলাম, তার একটুও এখন আর মনে নেই, শুধু মনে আছে, সংকোচ হচ্ছিল আমার, থতমতো খাচ্ছিলাম, রাগ হচ্ছিল নিজের ওপর, অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলাম আলাপ শেষ হয়ে যাক, অথচ নিজেই তো আমি তা একান্ত চেয়েছিলাম, সারা দিন ধরে তার স্বপ্ন দেখেছি, মনে মনে আমার প্রশ্ন আর জবাব আউড়ে নিয়েছি বার বার... সেই সন্ধ্যে থেকে শুরু হল আমাদের বন্ধুত্ব। মায়ের সারাটা অসুখের প্রত্যেকটা দিন আমরা রাত্রিতে কয়েক ঘণ্টা করে একত্রে কাটাতাম। ক্রমে ক্রমে আমার লজ্জা কেটে যেতে লাগল, যদিও তখনো প্রত্যেকবার আলাপের পরই নিজের ওপর রাগ কিছু না কিছু থাকত। আর গোপনে গোপনে এই দেখে আমার আনন্দ আর গর্ব হত যে ও তার সেই বিচ্ছিরি বইগুলোকে ভুলতে শুরু করেছে আমার জন্যে। একদিন সেই বইয়ের শেল্‌ফ্‌ উল্টে ফেলা নিয়ে রহস্যচ্ছলে কথা ওঠে। অদ্ভুত সে এক মুহূর্ত, কেমন যেন 'বড়ো বেশি' মন খুলে একেবারে অকপট হয়ে গিয়েছিলাম আমি; উত্তেজনা, বিচিত্র এক উন্মাদনা পেয়ে বসেছিল আমায়, সবকিছু খুলে বললাম ওকে, বললাম যে আমি চেয়েছিলাম শিখতে, কিছু জ্ঞান অর্জন করতে, কেউ আমায় খুকি বলে, ছেলেমানুষ বলে ভাববে তা সহ্য হচ্ছিল না... আবার বলি, অদ্ভুত এক মেজাজে পেয়েছিল আমাকে — ভেতরটা দরদে ভরপুর, চোখে এসে পড়েছিল জল। কিছুই না লুকিয়ে সবকিছুই ওকে বললাম আমি। বললাম, আমি ওর বন্ধু, ওকে ভালোবাসতে চাই, মনেপ্রাণে এক হয়ে যেতে চাই ওর সঙ্গে, ওকে চাই সান্ত্বনা দিতে। অদ্ভুতভাবে ও তাকাল আমার দিকে, কেমন অবাক আর বিব্রতভাবে, কিছু বললে না। হঠাৎ ভারি কষ্ট, ভারি দুঃখ হল আমার। মনে হল ও কিছু বুঝল না, হয়ত হাসছে মনে মনে। ফোঁপানির একটা দমক কিছুতেই চেপে রাখতে না পেরে আমি ছেলেমানুষের মতো কেঁদে ফেললাম। ও আমার হাতদুটি নিয়ে চুমু খেয়ে চেপে ধরল বুকে, বোঝালে, সান্ত্বনা দিলে। খুবই বিচলিত হয়ে উঠেছিল। কী সে আমায় বলেছিল মনে নেই — শুধু আমি একবার কাঁদি একবার হাসি, ফের কাঁদি, লাল হয়ে উঠি, আনন্দের আবেগে একটি কথাও বলতে পারি নি আমি। তবে উদ্‌ভ্রান্ত

অবস্থায় থাকলেও লক্ষ্য করলাম, ও কেমন আড়ষ্ট আর অস্বস্তি বোধ করছে। হয়ত আমার উচ্ছ্বাস, আমার ভাবাবেগ, আকস্মিক উদগ্র বন্ধুত্বের প্রকাশ দেখে বিস্ময়ের ঘোর তার তখনো কাটে নি। হয়ত প্রথমটায় শুধু ওর কৌতূহলই জেগেছিল, কিন্তু পরে ওর দ্বিধা আর থাকে না, আমার প্রীতি, আমার সাদর সম্ভাষণ আর মনোযোগ ও গ্রহণ করেছিল আমার মতোই আর তাতে সাড়া দিয়েছিল একইরকম মনোযোগে, হৃদ্যতায়, আমার সত্যিকার বন্ধুর মতো, আপন ভাইয়ের মতো। কী ভালোই না লেগেছিল আমার, কী মধুর!.. কিছুই আমি লুকিয়ে রাখতাম না, গোপনতা ছিল না আর। এটা সে বেশ দেখতে পাচ্ছিল, দিনের পর দিন ও আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল আমার কাছে।

রাতে, আমার বেচারি রুগ্‌ণ মায়ের বিছানার প্রায় একেবারে পাশেই বাতির দপদপে আলোয় আমাদের সাক্ষাতের সেই বেদনা-মধুর মুহূর্তগুলোয় আমরা কী না বলাবলি করেছি, সত্যি মনে নেই। মনে যা আসত, যা কিছু ছাড়া পেত বুকের মধ্যে থেকে, যা ইচ্ছে হত সবই বলতাম আমরা, আর যেন প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলাম সুখে... আহ্, একইসঙ্গে বেদনার আর আনন্দের দিন ছিল সেগুলি, — এখন মনে করতে গেলে যেমন আনন্দ তেমনি কষ্ট লাগে। সুখেরই হোক কি দুঃখেরই হোক, স্মৃতি মাত্রেই বুঝি কষ্টের, অন্তত আমার কাছে। কিন্তু সে কষ্টটাও কেমন মধুর। বুক যখন ভার হয়ে থাকে, কষ্ট হয়, মন পোড়ায়, তখন দুপুরের গরমে পোড়া ক্লান্ত ফুলের ওপর সিক্ত সান্ধ্য-শিশিরের মতো স্মৃতি আমাদের প্রাণ তাজা করে তোলে।

মা ভালো হয়ে উঠছিলেন, কিন্তু রোগশয্যার পাশে আমি তখনো রাত জেগে থাকতাম। প্রায়ই পক্রোভস্কি আমায় বই দিয়ে যেত। প্রথমে সেগুলো পড়তাম নেহাৎ জেগে থাকার জন্যে, পরে পড়তে শুরু করলাম আরো একটু মন দিয়ে এবং পরিশেষে উদ্‌গ্রীব হয়ে। এযাবৎ অজানা, অচেনা নতুন নতুন অনেক কিছুই উদ্‌ঘাটিত হল আমার সামনে। নতুন নতুন ভাবনা, অনুভূতিতে হঠাৎ ছাপিয়ে উঠল বুক। আর যে বিষয়বস্তু বুঝতে যত উত্তেজনা লাগত, নিজেকে বিব্রত আর জিনিসটা কঠিন মনে হত ততই সেটা প্রিয় হয়ে উঠত আমার কাছে, ততই মধুর লাগত মনে মনে। বুকের মধ্যে একসঙ্গে ভিড় করে এসে এগুলি আমাকে এক দণ্ড

রেহাই দিত না। কী একটা বিচিত্র বিশৃঙ্খলা আলোড়িত করে তুলত আমার সমস্ত সত্তা। তবে এই আত্মিক অভিযান সত্ত্বেও আমি একেবারে বেসামাল হয়ে যাই নি। বড়ো বেশি স্বপ্নাতুর ছিলাম তাই আমার বাঁচোয়া।

মা ভালো হয়ে যেতে আমাদের সান্ধ্য সাক্ষাতের পালা শেষ হল, বন্ধ হয়ে গেল দীর্ঘ আলাপ। তখন থেকে দু'-একটুকরো বাক্যবিনিময় হত আমাদের কদাচিৎ — সেসব কথা এমনিতে তুচ্ছ কিন্তু আমি তা ভরে তুলতাম আমার নিজস্ব মানে, নিজস্ব মূল্যে, বিশেষ একটা অনুমানে। জীবন আমার তখন পরিপূর্ণ। আমি সুখী, প্রশান্ত, মৃদুমন্দ সে সুখ। কয়েক সপ্তাহ কাটল এমনি করে...

বুড়ো পক্রোভস্কি একদিন আমাদের দেখতে এল। অনেকখন সে বকবক করল আমাদের সঙ্গে, সেদিন ছিল একটু অস্বাভাবিক ভালো মেজাজে, ভারি খুশি, কথা যেন তার ধরে না। হাসল, রহস্য করল নিজের ধরনে এবং পরিশেষে তার আহ্লাদের কারণ জানিয়ে আমাদের বলল যে ঠিক আর এক সপ্তাহ পরে পেতেঙ্কার জন্মদিন, সেদিন যাই হোক, অবশ্য-অবশ্যই সে তার ছেলেকে দেখতে আসছে তার নতুন ওয়েস্ট কোট পরে, বৌ তাকে নতুন বুট কিনে দেবে বলে কথা দিয়েছে। মোটের ওপর বুড়ো একেবারে খুশিতে ডগমগ, মাথায় যাকিছু আসছিল তাই নিয়ে বকবক করে চলল অনবরত।

ওর জন্মদিন! দিনরাত আমি শুধু সেই কথাই ভাবতে লাগলাম। ঠিক করে ফেললাম আমিও ওকে একটা কিছু জন্মদিনের উপহার দেব আমাদের বন্ধুত্বের স্মারক হিশেবে। কিন্তু কী দেব? শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, কিছু বই দেওয়া যাক। জানতাম সাম্প্রতিক সংস্করণে পুশকিনের সম্পূর্ণ রচনাবলি পাবার ইচ্ছে ছিল ওর, ঠিক করলাম পুশকিনই কিনব। সেলাই করে করে আমি প্রায় তিরিশ রুবলের মতো জমিয়েছিলাম। টাকাটা রাখা ছিল তাতে আমার একটা নতুন পোশাক কেনার জন্যে। তক্ষুনি রাঁধুনি বুড়ি মাত্রিওনাকে পাঠালাম পুশকিনের পুরো সেটের দাম জেনে আসতে। কিন্তু হায়রে কপাল! মলাট সমেত এগারোটি বইয়ের দাম কমপক্ষে ষাট রুবল। কোথায় পাব এত টাকা? ভেবে কূল পাচ্ছিলাম না। ইচ্ছে হচ্ছিল না মা'র কাছে চাই। তিনি অবিশ্যি আমাকে নিশ্চয় সাহায্য করতেন কিন্তু সেক্ষেত্রে বাড়ির সকলেই ব্যাপারটা জেনে ফেলত এবং তার ওপর ধরে

নেওয়া হত, সারা বছর পক্রোভস্কি পড়িয়েছে বলে উপহারটা কৃতজ্ঞতাবশে তারই পারিশ্রমিক। আমি চাইছিলাম উপহারটা হবে একান্তই আমার, সবার অলক্ষ্যে। আর আমার জন্যে সে যে মেহনত করেছে, তার জন্যে আমি তার কাছে থাকব চিরকালের ঋণী, শোধ দেব শুধু আমার বন্ধুত্ব দিয়ে। অবশেষে একটা পথ পাওয়া গেল।

জানতাম, গস্তিনি দ্ভোর-এ মাঝে মাঝে প্রায় নতুনের মতো দেখতে পুরনো বই বিক্রি হয়, দর কষাকষি করতে পারলে অর্ধেক দামে তা পাওয়া সম্ভব। ঠিক করলাম গস্তিনি দ্ভোরেই যাব। পরের দিন আমাদের কিছু কেনা কাটার দরকার ছিল এবং যেহেতু মায়ের শরীর খারাপ আর সৌভাগ্যবশত আন্না ফিওদরভনারও আলসেমি লাগছিল, তাই কাজটা পড়ল আমার ওপরে। মাত্রিওনার সঙ্গে বেরুলাম।

কপাল ভালো, খুব তাড়াতাড়িই সুন্দর করে বাঁধানো এক সেট পুশকিনও পাওয়া গেল। দরাদরি করতে শুরু করলাম। দোকানদার প্রথমে বাজারের চেয়েও বেশি দাম হাঁকল। কিন্তু পরে যদিও বিনা কষ্টে নয়, বার কয়েক ফিরে চলে যাবার পর দোকানী নেমে এল দশ চাঁদি রুবলে। কী আমার মজা লেগেছিল এই দরাদরি করতে!.. বেচারি মাত্রিওনা বুঝে পাচ্ছিল না কী হল আমার, অতগুলো বই কেনার খেয়াল চাপল কেন। কিন্তু কী মুশকিল! আমার মোট পুঁজি কেবল তিরিশ রুবল ব্যাঙ্ক নোটে, এবং দোকানী আর সস্তাতে ছাড়তে রাজি নয়। শেষে আমি মিনতি করতে লাগলাম, অনেক অনুনয়-বিনয় করার পর ও রাজি হল, দর নামালে শুধু আরো আড়াই রুবল। ঈশ্বরকে সাক্ষী মেনে বললে, এটা সে কমালে শুধু আমার জন্যে, আমি নাকি ভারি সুন্দরী এক ভদ্রকন্যা, দুনিয়ায় আর কারো জন্যে সে কিছুতেই ছাড় দিত না। তবু আড়াই রুবল এখনো বাকি! দুঃখে প্রায় কেঁদেই ফেলতাম। এমন সময় অতি অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনায় আমার সমস্যা মিটল।

অদূরে, অন্য একটা বইয়ের টেবিলের কাছে দেখলাম বুড়ো পক্রোভস্কিকে। তাকে ছেঁকে ধরছে চার-পাঁচটি বইয়ের দোকানী, ওরা ওকে প্রায় পাগল করে দিয়েছে। জ্বালিয়ে মারছে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের বইটির সুপারিশ করছে। কত কী যে ওরা দেখাচ্ছে আর কী না ওর কেনার ইচ্ছে। তাতেই বেচারি বৃদ্ধ কেমন বিপর্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে

ওদের মাঝখানে, কোনটা নিতে হবে কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছে না। আমি গিয়ে জিগ্যেস করলাম, কী করছে সে। আমায় দেখে বুড়ো একেবারে আনন্দে আটখানা। ভারি ভালোবাসত বুড়ো আমাকে, হয়ত তার পেতেঙ্কার চেয়ে কম নয়। বললে, 'বই কিনছি, ভারভারা আলেক্সেয়েভনা, পেতেঙ্কার জন্যে কিছু বই। শিগগিরই ওর জন্মদিন, বই ও ভালোবাসে কিনা, তাই ওর জন্যে বই কিনছি...' বুড়োটার কথা বলার ধরন এমনিতেই হাস্যকর, তদুপরি তখন সে ভয়ানক বিব্রত। যে বইয়েরই দাম জিগ্যেস করে, এক কি দুই কি তিন চাঁদি রুবল। বড়ো বড়ো বইগুলোর দাম অবশ্য সে আর জিগ্যেস করছিল না, শুধু ঈর্ষাভরে তাকিয়ে দেখছিল, পাতা উলটিয়ে নাড়াচাড়া করে ফের রেখে দিচ্ছিল টেবিলে। অস্ফুট স্বরে বলছিল, 'না, না, ওটা বড়ো দামী। বরং ঐগুলো দেখি তো?' এই বলে ফের সে পাতলা পাতলা মাসিক পত্র, গানের বই আর সংকলনগুলো বাছছিল: এসবই অতি সস্তা। আমি বললাম, 'এসব কিনছেন কেন? বেহদ্দ বাজে বই।' ও বললে, 'আরে না, না। দেখুন-না কেমন ভালো ভালো বই আছে এখানে, চমৎকার চমৎকার বই!' শেষের কথাগুলো ও এমন করুণ স্বরে টেনে টেনে গাইলে, যে মনে হল এই দুঃখে ও বুঝি কেঁদে ফেলে আর-কি যে ভালো বইগুলোর দাম বড়ো বেশি। এই বুঝি এক ফোঁটা চোখের জল ওর ফ্যাকাশে গাল থেকে গড়িয়ে নামবে ওর লাল নাকের ওপর। জিগ্যেস করলাম, কত টাকা ওর আছে। 'তা এই তো,' বলে বুড়ো তেলচিটে একটুকরো খবরের কাগজে মোড়া তার গোটা তহবিলটা বার করে দেখালে। 'একটা আধ রুবল, একটা কুড়ি কোপেকি সিক্কা, আর তামার পয়সায় আরো কুড়ি কোপেক।' ওকে টেনে নিয়ে এলাম আমার বইয়ের দোকানীর কাছে। 'এই দেখুন, পুরো এই এগোরোখানা বইয়ের দাম—সাড়ে বত্রিশ রুবল। আমার আছে ত্রিশ রুবল; আপনি আড়াই রুবল দিন—বইগুলো কিনে একসঙ্গে উপহার দেওয়া যাবে।' আনন্দে পাগলা হয়ে উঠল বুড়ো, চাঁদি আর তামার মুদ্রাগুলি সে ঢেলে দিলে। দোকানদারও আমাদের গ্রন্থমালার বোঝাটি চাপিয়ে দিলে তার ঘাড়ে। সারা পকেটে ঢুকিয়ে, হাতে আর বগলে বইগুলো নিয়ে বুড়ো বাড়ি গেল, প্রতিশ্রুতি দিলে, বইগুলো সে পরদিন আমার কাছে এনে দেবে চুপিচুপি।

পরদিন বুড়ো তার ছেলেকে দেখতে এল। সেখানে যথারীতি

ঘণ্টাখানেক থেকে এল আমাদের ওখানে। যৎপরোনাস্তি হাস্যকর একটা গোপনীয়তার ভাব করে বসল আমার কাছে। হাসল নরম করে, গোপন কিছু একটা রহস্য যে তার দখলে আছে তার গর্বিত পরিতৃপ্তিতে হাত ঘষলে খুশিতে এবং জানালে যে বইগুলো সে গোপনে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে, মাত্রিওনার হেফাজতে তা রাখা আছে রান্নাঘরে। পরে স্বভাবতই আলাপ চলল প্রত্যাশিত উৎসব নিয়ে। সবিস্তারে বুড়ো বর্ণনা করলে, কী করে উপহারটি দেওয়া হবে। আর নিজের প্রসঙ্গে বুড়ো যতই মেতে উঠছিল, যতই কথা কইছিল, ততই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে বুড়োর মনের মধ্যে কিছু একটা খোঁচা দিচ্ছে, সেকথা বলার সাহসই তার নেই, ভয়ই পাচ্ছে। আমি চুপ করে অপেক্ষায় রইলাম। বুড়োর হাস্যকর হাবভাব, মুখভঙ্গি, আর বাঁ চোখের মটকানির মধ্যে এতক্ষণ যে গোপন আনন্দ, গোপন পরিতৃপ্তির ভাবটা সহজে চোখে পড়ছিল তা অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্রমেই সে হয়ে উঠল অস্থির আর উদ্বিগ্ন। শেষে আর চেপে থাকতে পারল না ও।

ভয়ে ভয়ে অস্ফুট স্বরে ও শুরু করলে, 'শুনুন ভারভারা আলেক্সেয়েভনা, মানে কী জানেন, ভারভারা আলেক্সেয়েভনা?..' ভয়ানক গোলমেলে অবস্থায় ছিল বুড়ো, 'মানে ব্যাপারটা হল এই: জন্মদিন এলে দশখানা বই নিয়ে আপনি নিজেই, মানে আপনার পক্ষ থেকে ওকে দিন, আমি দেব এগারো নম্বরেরটা, মানে আমার নিজস্ব উপহার বলে। তাহলে, বুঝেছেন, আপনারও উপহার দেওয়ার মতো কিছু থাকছে, আমারও উপহার দেওয়ার মতো কিছু থাকছে, আমরা দুজনেই নিজের নিজের একটা উপহার দিলাম...' বলতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলে বুড়ো চুপ করে গেল। আমি চেয়ে দেখলাম ওর দিকে; ভয়ে ভয়ে সে অপেক্ষা করে আছে আমার রায় শোনার জন্যে। জিগ্যেস করলাম, 'একসঙ্গে উপহার দেওয়াটা আপনার পছন্দ হচ্ছে না কেন, জাখার পেত্রোভিচ?' 'মানে, এমনি ভারভারা আলেক্সেয়েভনা, এই এমনি, আমি তো মানে... আসলে...' কথা গোলমাল করে ফেলল বুড়ো, লাল হয়ে উঠল, কথা বেধে গিয়ে, আর এগুতে পারছিল না।

অবশেষে সে বুঝিয়ে বললে, 'ব্যাপারটা হল... আমি মাঝে মধ্যে একটু অসংযম করি, ভারভারা আলেক্সেয়েভনা, মানে, আপনাকে বলে রাখি যে প্রায় সবসময়েই করি... যা ভালো নয় সেইটার দিকে ঝুঁকি—মানে কী

জানেন, বাইরে মাঝে মাঝে এমন ঠাণ্ডা পড়ে কি মুশকিলে পড়া গেল কত রকম, কিংবা এই ধরুন, মেজাজ ভালো লাগছে না কিংবা কিছু একটা খারাপ ব্যাপার ঘটল... মানে তখন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না, অসংযম করি, মাঝে মাঝে মদ টানি একটু বেশি রকমই। পেতেঙ্কার সেটা ভারি অপছন্দ। জানেন ভারভারা আলেক্সেয়েভনা, রেগে যায় ও, বকাঝকা শুরু করে, নীতি উপদেশ দেয় আমায়—তাই আমারও ইচ্ছে হচ্ছে, আমার উপহারটি দিয়ে ওকে বুঝিয়ে দেব যে আমি নিজেকে শুধরে নিচ্ছি, ভালোভাবে চলতে শুরু করেছি, টাকা জমিয়েছি আমি, বই কেনার জন্যে। অনেক দিন ধরে টাকাটা আমাকে জমাতে হয়েছে, কেননা টাকা তো প্রায় কখনোই থাকে না, নেহাৎ পেতেঙ্কা কখনো কখনো দেয়। ও জানে তা। তাই ও দেখবে যে টাকাটা এইভাবে খরচ করেছি, আর সবই শুধু ওরই জন্যে।'

ভারি কষ্ট হল বুড়োর জন্যে। খানিকখন ভাবলাম। বুড়ো মানুষটা আমার দিকে তাকাচ্ছিল উদ্বেগ নিয়ে। বললাম, 'শুনুন জাখার পেত্রভিচ, সবকটিই আপনি দিয়ে দিন না কেন!' 'সবকটি মানে? অর্থাৎ, সব বইগুলো?' 'হ্যাঁ, সব বই!' 'আমার নিজের উপহার হিশেবে?' 'হ্যাঁ, আপনার পক্ষ থেকে।' 'কেবল আমার পক্ষ থেকে। মানে আমার নামে?' 'হ্যাঁ, নিজের নামে!' আমি বেশ পরিষ্কার বলেছিলাম, কিন্তু বহুক্ষণ ধরে ব্যাপারটা যেন তার মাথায় ঢুকছিল না।

চিন্তামগ্নের মতো সে বলল, 'তা হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা বেশ হয়—খুবই ভালো হয়। কিন্তু আপনার কী হবে, ভারভারা আলেক্সেয়েভনা?' বললাম, 'আমি কোনো উপহার দেব না,' প্রায় ভয় পেয়েই ও চেঁচিয়ে উঠল, 'সেকি! পেতেঙ্কাকে একেবারে কিছুই দেবেন না? উপহার দিতে চান না?' ভয় পেয়ে গেল বৃদ্ধ, তার ছেলেকে আমি যেন কিছু উপহার দিতে পারি তার জন্যে নিজের প্রস্তাবটাই ও যেন নাকচ করতে তখন প্রস্তুত। লোকটার মন ভালো। বুঝিয়ে বললাম, কিছু দিতে পারলে আমি খুশিই হতাম, কিন্তু ওর সাধ আমি নষ্ট করতে চাই না। বললাম, 'আপনার ছেলে আর আপনি যদি খুশি হন, তাইলে আমিও খুশি হব, কেননা, গোপনে মনে মনে ভাবব যেন আসলে আমি নিজেই উপহার দিয়েছি।' এতে একেবারে আশ্বস্ত হয়ে গেল সে। আরো ঘণ্টা দুই রইল আমাদের সঙ্গে, কিন্তু মুহূর্তের

জন্যেও স্থির হয়ে থাকতে পারল না। কেবলি উঠে দাঁড়ায়, ছটফট করে, চেঁচামেচি লাগায়, ইয়ার্কি করে সাশার সঙ্গে, অলক্ষ্যে আমায় চুমু খেয়ে, হাতে চিমটি কেটে, চুপি চুপি ভেঙচি কাটল আন্না ফিওদরভনার উদ্দেশে। আন্না ফিওদরভনা অবশেষে বার করে দিলে ওকে। মোট কথা আনন্দে বৃদ্ধ এমন উদ্দাম হয়ে উঠেছিল যা আগে কখনো হয় নি।

তারপর সেই শুভদিনটায় ঠিক এগারোটার সময় বুড়োর উদয় হল, এসেছে সোজা উপাসনা সভা থেকে, সযত্নে রিপুকরা টেল কোট গায়ে এবং সত্যি সত্যিই পরনে নতুন ওয়েস্ট কোট আর নতুন বুট। দুই হাতে তার বইয়ের দুটি মোড়ক। আন্না ফিওদরভনার হল ঘরে তখন আমরা সবে কফি খেতে বসেছি (সেদিনটা ছিল রবিবার)। পুশকিন দিব্যি চমৎকার এক পদ্য-লিখিয়ে, এই বলে মনে হয় বৃদ্ধ শুরু করেছিল, কিন্তু বলেই কেমন ওর গুলিয়ে গেল, থতমতো খেল এবং হঠাৎ এই মতামত ঘোষণা করে বসলে যে লোকের ভালোভাবে চলা উচিত, ভালোভাবে না চলার অর্থ সে অসংযম করছে; এবং কু-প্রবণতাই মানুষের সর্বনাশের কারণ; কয়েকটি মারাত্মক দৃষ্টান্ত দিয়ে এই সিদ্ধান্ত টানল যে কিছুকাল থেকে সে নিজেকে একেবারে সংশোধন করে নিয়েছে, এখন সে চলছে রীতিমতো ভালোভাবে। ওর ছেলে যে ন্যায্য উপদেশ দিত, তা সে আগেই বুঝত—সব বুকে জমিয়ে রেখেছিল, এখন সে কার্যক্ষেত্রে সংযত হয়ে চলছে। তার প্রমাণস্বরূপ এতদিন ধরে যে টাকা সে জমিয়েছে তা দিয়ে কেনা এই বইগুলি সে উপহার দিচ্ছে।

বুড়োর কথা শুনতে শুনতে একই সঙ্গে হাসি আর কান্না পেল আমার। দরকার পড়লে বেশ বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারে তো লোকটা। বইগুলো তার ছেলের ঘরে এনে শেলফে তুলে রাখা হল। আসল ব্যাপারটা টের পেতে অবশ্য পক্রোভস্কির দেরি হয় নি। দুপুরের খাওয়া খেয়ে যাবার জন্যে বুড়ো মানুষটাকে নেমন্তন্ন করা হল। কী ফুর্তিতেই না কেটেছিল সেদিন। খাওয়ার পরে আমরা তাস আর ফরফিট্ খেললাম। দুরন্তপনা করছিল সাশা, আমিও কম গেলাম না। আমার দিকে মন পড়ে ছিল পক্রোভস্কির, চেষ্টা করছিল আমার সঙ্গে একলা কথা বলার। আমি ওকে কিছুতেই সে সুযোগ দিচ্ছিলাম না। চার বছরে এই হল আমার সবচেয়ে সুখের দিন।

এরপর থেকে সবই বিষণ্ণ গুরুভার স্মৃতি। বুঝি সেইজন্যেই আমার কলম চলছে ধীরে, যেন আর লিখতে চাইছে না। হয়ত সেইজন্যেই আমি আমার সুখের দিনগুলোতে আমার সামান্য দিনযাত্রার তুচ্ছতম খুঁটিনাটির স্মৃতিতে চলে গেছি এত মেতে উঠে, এত ভালোবাসায়। সেসব দিন আমার ভারি অল্প আর তার জায়গায় এল দুঃখ, ঘোর দুঃখ, ভগবান জানেন কবে তার শেষ হবে।

আমার দুর্ভাগ্য শুরু হল পক্রোভস্কির রোগ আর মৃত্যুর সময় থেকে।

যেসব ঘটনার কথা বললাম, তার দু'মাস পরেই ও শয্যা নিয়েছিল। এই দু'মাস সে রোজগারের জন্যে খেটেছিল খুব। তখন পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত চাকরি কিছু তার ছিল না। সমস্ত ক্ষয়রোগীদের মতোই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওর আশা ছিল অনেক দিন বাঁচবে। কোথায় একটা মাস্টারির চাকরি সে পেয়েছিল কিন্তু এ কাজ তার মোটেই পছন্দ ছিল না। তার স্বাস্থ্যের যা দশা তাতে সরকারী চাকুরি ছিল প্রশ্নের বাইরে। তাছাড়া, প্রথম বেতন পেতে হলেও তাকে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করতে হত। মোটের ওপর, শুধু অসাফল্যের দিকটাই ওর চোখে পড়ছিল, স্বভাব ওর গেল বিগড়ে, স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ছিল, সেটা সে মোটেই নজরে আনে নি। শরৎকাল এসে পড়েছিল। কাজকর্মের ধান্ধায় রোজ সে বেরিয়ে যেত কেবল একটা পাতলা ওভার কোট পরে, কোনো একটা চাকরির জন্যে উমেদারি করতে, ভেতরে ভেতরে সেটা তার কাছে ছিল একটা যন্ত্রণার ব্যাপার। বার বার বৃষ্টিতে নেয়ে এবং ভেজা পায়ে ঘুরে অবশেষে সেই যে ও শয্যা নিল, আর উঠল না... হেমন্তের ঠিক মাঝখানে ও মারা গেল — অক্টোবরের শেষের দিকে।

সারা অসুখটা আমি ওর ঘর ছেড়ে প্রায় যাই নি; ওর শুশ্রূষা করেছি, কাজ করে দিয়েছি এবং প্রায়ই জেগে থেকেছি সারা রাত। সজ্ঞানে সে থাকত কদাচিৎ, প্রায়ই ভুল বকত, ঈশ্বর জানেন কি সে না বলত; বইগুলোর কথা, চাকরি খোঁজার কথা, আমার কথা, ওর বাপের কথা... ওর অবস্থা সম্পর্কে আমি যা জানতাম না, কখনো ভাবিও নি, এমন অনেক কথাই শুনেছি। ওর অসুখের প্রথম দিকটায় বাড়ির সকলে আমাকে চেয়ে দেখত কেমন অদ্ভুতভাবে, আন্না ফিওদরভনা মাথা নাড়তেন। কিন্তু আমি সোজাসুজি চাইতাম ওদের দিকে, ফলে পক্রোভস্কির জন্যে আমায় আর ভর্ৎসনা করত না ওরা, অন্তত মা।

মাঝে মাঝে আমাকে চিনতে পারত পক্রোভস্কি, যদিও তা নেহাৎ কাচিৎ কদাচিৎ। প্রায় সবসময়েই সে থাকত বেঘোরে। মাঝে মাঝে সারা রাত ও কার সঙ্গে যেন কথা কয়েই যেত অনেক, অনেকখন ধরে, অস্পষ্ট দুর্বোধ্য সে ভাষা; ছোট ঘরখানায় ওর ভাঙা ভাঙা গলার আওয়াজ কেমন ফাঁপা ফাঁপা শোনাত, যেন কবরের তলায় কেউ কথা কইছে। ভারি তখন ভয় করত আমার। শেষ রাতটায় ও কেমন যেন খেপে উঠেছিল; ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছিল সে, তার গোঙানিতে বুক ভেঙে যাচ্ছিল আমার। বাড়ির সকলেই ভয় পেয়ে গেল। আন্না ফিওদরভনা কেবলি প্রার্থনা করতে লাগলেন, তাড়াতাড়ি যাতে ভগবান ওকে নেন। ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার বললে, সকাল নাগাদ রোগী নির্ঘাত মারা যাবে।

বুড়ো পক্রোভস্কি সারা রাত কাটালে বারান্দায় ছেলের ঘরের দরজার কাছে, সেখানে কী একটা ছালা পেতে দেওয়া হয়েছিল ওর জন্যে। কেবলি ঘরের মধ্যে এসে ঢুকছিল ও, ভয় হত ওকে দেখে। শোকে এমনি মুহ্যমান যেন জ্ঞান-গম্যি আর নেই। ভয়ে মাথাটা তার নড়বড় করছিল, সারা শরীর কাঁপছিল, সারাক্ষণ ও বিড়বিড় করে নিজের মনেই বকে যাচ্ছিল কী যেন। মনে হচ্ছিল শোকে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

ভোরের আগে মনোযন্ত্রণার ক্লান্তিতে বৃদ্ধ নেতিয়ে পড়ল মড়ার মতো ঘুমে। আটটা নাগাদ ছেলের মরণ কাছিয়ে এল। বাপকে জাগিয়ে দিলাম আমি। পক্রোভস্কি তখন পুরোপুরি সজ্ঞান। আমাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলে ও। আশ্চর্য! আমি কাঁদতে পারলাম না, যদিও বুক আমার ভেঙে যাচ্ছিল।

কিন্তু ওর শেষ মুহূর্তগুলোই আমায় কষ্ট দিয়েছে, দগ্ধ করেছে সবচেয়ে বেশি। জড়িত উচ্চারণে কিসের জন্যে যেন ও মিনতি করেছিল অনেকখন ধরে, কিন্তু কথাগুলো কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না আমি। যন্ত্রণায় বুক আমার ফেটে যাচ্ছিল! পুরো এক ঘণ্টা ধরে ও ছটফট করলে, কী যেন বলতে চাইলে, ঠাণ্ডা হাতে কী একটা ইঙ্গিত করার চেষ্টা করলে আমায়। তারপর আবার অস্পষ্ট ভাঙা ভাঙা করুণ গলায় কী যেন মিনতি করতে শুরু করলে। কিন্তু কথাগুলো তার কেবলি অসংলগ্ন কিছু ধ্বনি, এবারও তার একবর্ণও বুঝে উঠতে পারলাম না আমি। আমাদের সকলকেই ওর শয্যার কাছে নিয়ে এলাম। জল দিলাম খেতে। কিন্তু সখেদে

ও শুধু মাথাটা নাড়াতে লাগল। শেষে বুঝতে পারলাম, কী ও চাইছে। ও চাইছিল পর্দাটা তুলে দিয়ে জানলা খুলে দেওয়া হোক। দিবালোক আর সূর্য আর ঈশ্বরের এই পৃথিবীটাকে ও শেষ বারের মতো একটু দেখবে। পর্দা তুলে দিলাম। কিন্তু ঘরের বাইরের প্রত্যুষটা তখন নির্বাণোন্মুখ জীবনখানার মতোই নিষ্প্রভ আর বিষণ্ণ। রোদ নেই কোথাও। কুয়াশার পর্দায় মেঘে ঢাকা আকাশ। বাদলার সে আকাশ ভ্রূকুটিত, বিষণ্ণ। ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি পড়ছে জানলার শার্সির ওপর, ঠাণ্ডা ময়লা জলের ধারায় তা ভাসিয়ে দিচ্ছে, সবটাই মিটমিটে, অন্ধকার। বিবর্ণ দিনের সামান্য আলো ঢুকছে ঘরে, আইকন-দীপের কম্পিত শিখার সঙ্গে পাল্লা দিছে যেন। আমার দিকে ভারি বিষণ্ণভাবে চেয়ে মাথা নাড়ল মুমূর্ষু। পর মুহূর্তেই সে মারা গেল।

সৎকারের ব্যবস্থা করলেন আন্না ফিওদরভনা নিজে। অত্যন্ত সাদামাটা গোছের একটা কফিন কেনা হল, ভাড়া করা হল মামুলী একটা গাড়ি। এর খরচা তোলার জন্যে আন্না ফিওদরভনা মৃতের বইপত্তর এবং অন্যান্য জিনিসপাতি দখল করে বসল। বুড়ো এই নিয়ে ওর সঙ্গে ভয়ানক ঝগড়া বাধালে, চেঁচামেচি করলে, যত পারল বই উদ্ধার করে পকেট আর টুপি বোঝাই করে ভরলে। তিন দিন ধরে বইগুলো সে বইল, গির্জায় যাবার সময়েও সেগুলো সে হাতছাড়া করলে না। এই কয় দিন বুড়ো কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ আর হতভম্ব হয়ে ছিল। অদ্ভুত ব্যস্ততায় সারাক্ষণ ও ঘুরঘুর করত কফিনের চারপাশে, কখনো মৃতের ভেনচিকটা* ঠিক করে দিত, কখনো মোমবাতি জ্বালাত বা সরিয়ে নিত। বোঝা যেত কোনো একটা কিছুতে ওর চিন্তা স্থির হয়ে থাকতে পারছে না। মা অথবা আন্না ফিওদরভনা, দুজনের কেউই গির্জার উপাসনায় যেতে পারেন নি। মা'র শরীর ভালো ছিল না। আন্না ফিওদরভনা আসার উদ্যোগ করছিলেন, কিন্তু বুড়ো পক্রোভস্কির সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে আর এলেন না। ছিলাম শুধু আমি আর ঐ বৃদ্ধ। অন্তিম কৃত্যের সময় কেমন একটা আতঙ্ক হতে লাগল আমার, যেন ভবিষ্যতের পূর্বানুভূতি। গির্জায় থাকতে আর পারছিলাম না। অবশেষে কফিনের ঢাকনা বন্ধ করে, পেরেক ঠুকে গাড়িতে চাপিয়ে

* ভেনচিক — গ্রীক চার্চের প্রথা অনুসারে মৃতের মাথায় পরানো মুকুট।

যাত্রা শুরু হল। আমি শুধু রাস্তার শেষ পর্যন্ত সঙ্গে ছিলাম। গাড়োয়ান ঘোড়া ছুটাল জোরে। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বুড়ো ছুটল গাড়ির পেছনে পেছনে; দৌড়ানোর ফলে কান্নাটা ওর কেঁপে কেঁপে, থেমে থেমে যাচ্ছিল। টুপি উড়ে গিয়েছিল বেচারির, কিন্তু সেটাকে কুড়িয়ে নেবার জন্যেও সে থামল না। বৃষ্টিতে মাথা ভিজে গিয়েছিল ওর, ঝড় উঠেছিল, ঠাণ্ডার ঝাপটা এসে বিঁধছিল মুখেচোখে। কিন্তু দুর্যোগের কোনো খেয়ালই যেন বুড়োর নেই, কাঁদতে কাঁদতে সে ছোটাছুটি করছিল গাড়িখানার এপাশে ওপাশে। বাতাসে ডানার মতো উড়ছিল ওর জীর্ণ কোটের টেল। আর সবকটি পকেট থেকে মুখ বাড়িয়ে ছিল ওর সেই বইগুলো। হাতে কী একটা প্রকাণ্ড বই, সেটা সে আঁকড়ে ধরে আছে। রাস্তার লোকেরা টুপি খুলে ক্রুশ করে নিচ্ছিল। কেউ কেউ থেমে গিয়ে অবাক হয়ে চাইছিল বেচারা বুড়ো মানুষটার দিকে। ক্ষণে ক্ষণে পকেট থেকে বইগুলো পড়ে পড়ে যাচ্ছিল কাদার মধ্যে। ওকে থামিয়ে তা দেখিয়ে দিলে, ও সেটা তুলে নিয়েই আবার ছুট দিচ্ছিল কফিনের পাল্লা ধরবার জন্যে। রাস্তার মোড়ে কে একটা নিঃস্ব বুড়ি এসে জুটল ওর সঙ্গে। মোড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িখানা। আমি বাড়ি ফিরে ভয়ঙ্কর মানসিক যন্ত্রণায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম মায়ের বুকে। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলাম তাকে, চুমু খেলাম, কাঁদলাম, সভয়ে আঁকড়ে ধরছিলাম, যেন আমার আলিঙ্গনে আমি ধরে রাখতে চাই আমার শেষ আপন জনকে, আসতে দেব না মৃত্যুকে।... কিন্তু মরণ আগেই বেচারি মায়ের শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। . . . .
. . . .

১১ই জুন

গতকাল চরে যে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন তার জন্যে ভারি কৃতজ্ঞ, মাকার আলেক্সেয়েভিচ। সত্যি কী তাজা, সুন্দর জায়গাটা, কী সবুজ গাছপালা! কতদিন এমন গাছপালা দেখি নি। অসুখের সময় মনে হত আমায় মরতে হবে, অবশ্যই মরব। তাই কালকে কী রকম যে আমার লেগেছিল, তা কল্পনা করে নিন! কাল আমার মন ভার ছিল বলে রাগ করবেন না কিন্তু। সত্যিই ভারি আনন্দ পেয়েছিলাম আমি, মন হালকা

হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সবচেয়ে সুখের মুহূর্তেই কেন জানি বিষণ্ণ লাগে আমার। আমি যে কেঁদেছিলাম ওটা কিছু নয়। প্রায়ই কান্না পায় আমার, কেন কে জানে। কেবলি কষ্ট লাগে আমার, উত্যক্ত বোধ করি, অনুভূতিগুলো আমার বড়ো পীড়িত। বিবর্ণ নির্মেঘ আকাশ, পাটে বসা সূর্য, সন্ধ্যার স্তব্ধতা—মানে কী যে বলি জানি না, এই সবকিছুকেই একটা কষ্টের সঙ্গে, যন্ত্রণার সঙ্গে নেবার মনোভাব পেয়ে বসেছিল আমায়, বুক ভরপুর হয়ে কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু কেনই বা লিখছি এসব? নিজের মনের কাছেই জিনিসটা বোঝা কঠিন, আর অন্যকে বলা তো আরো দুষ্কর, কিন্তু আপনি হয়ত বুঝবেন। হাসি আর কান্না! সত্যি, কী ভালো, কী দরদী আপনি, মাকার আলেক্সেয়েভিচ! কাল আপনি আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে দেখছিলেন, যেন আমি কী বোধ করছি তা জানতে চাইছেন, উল্লসিত হয়েছিলেন আমার উচ্ছ্বাসে। একটা ঝোপ, এক সার তরু-বীথি অথবা এক চিলতে জল—যাই দেখি, অমনি আপনিও সেখানে; টানটুন হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছেন আমার সামনে, এমনভাবে আমার চোখে চেয়ে দেখেছেন যেন নিজেরই সম্পত্তি দেখালেন। এ থেকে বোঝা যায় মাকার আলেক্সেয়েভিচ, কত ভালো আপনার মন। সেইজন্যেই তো আপনাকে ভালোবাসি। এবার আসি। আজকে ফের শরীরটা ভালো নেই। কালকে পা ভিজে গিয়ে ছিল, ফলে ঠাণ্ডা লেগেছে। ফেদোরাও ভালো নেই, দুজনেই আমরা অকর্মণ্য। ভুলে যাবেন না আমায়, মানে ঘন ঘন আসবেন।

আপনার

ভ: দ.

১২ই জুন

আমার আদরের ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

আমি কিন্তু ভেবেছিলাম গো, কালকের কথা আপনি লিখবেন সব খাঁটি কবিতায়—তার কমে নয়! কিন্তু বেরুল শুধু ছোট্ট একটিমাত্র পাতা। বলছি এইজন্যে যে যদিও পাতাটায় আপনি লিখেছেন অল্প, তবু লেখাটা ভারি ভালো, ভারি মিষ্টি। প্রকৃতি, গ্রামের নানান দৃশ্যপট, ভাব-অনুভূতি—

মোটের ওপর সবকিছুই খুব সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অমন প্রতিভা তো আমার নেই। দশখানা পাতা লিখলেও কিছু কাজে দেবে না, কিছুই ফুটিয়ে তোলা যাবে না। চেষ্টা করে দেখেছি। আপনি লিখেছেন গো, আমার মনটা নরম, নিরীহ; আপন জনকে দুঃখ দিতে আমি পারি না। প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের যে আশীর্বাদ রয়েছে তা আমি বুঝি ইত্যাদি নানা কথা বলে শেষে আমার প্রশংসা করেছেন। এসবই সত্যি আমার রানী, খাঁটি সত্যি। আপনি যা বলেছেন আমি হুবহু ঠিক তাই। নিজেই আমি তা জানি। তবু আপনি যা লিখেছেন, তা পড়তে পড়তে মন গলে যায়, কিন্তু পরে কষ্টকর নানা ভাবনা এসে জমে। এবার শুনুন গো, কিছু কথা আপনাকে বলব।

এই বলে শুরু করি যে কাজে যখন ঢুকি তখন আমার বয়স সতেরো। আর এখন শিগগিরই তিরিশ বছর হবে আমার চাকরির। মানে, বলে আর কী হবে, আপিসে যাবার অনেক কটি উর্দি আমি এই সময়ের মধ্যে জরাজীর্ণ করেছি। ঝেড়ে-টেড়ে উঠলাম, বুদ্ধিও পাকল, লোকজনকে দেখলাম। জীবন কাটিয়েছি বটে, এমনভাবে কাটিয়েছি যে একসময় ওরা আমাকে ক্রশ পুরস্কার দেবার জন্যে সুপারিশ পর্যন্ত করতে চেয়েছিল। আপনার হয়ত বিশ্বাস হবে না, কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলছি, মিথ্যে নয়। তবে কী আর বলব গো, লোকের হাত থেকে নিস্তার নেই যে! কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, হয়ত আমি একটি মূর্খ, নিতান্ত নির্বোধও হতে পারি, কিন্তু অন্তঃকরণ আমার তো অন্য সবার মতোই। তা সেই মন্দ লোকটা কী করল জানেন ভারেঙ্কা? কী করল বলতেও লজ্জা হয়। বলবেন কেন করল? করল এইজন্যে যে আমি নিরীহ গোছের লোক, চুপচাপ থাকি, মনটা আমার ভালো। ওদের পছন্দ হত না, ব্যস লাগল আমার পেছনে। শুরু হল, 'মাকার আলেক্সেয়েভিচ হল গে অমুক তমুক, সাতসতেরো', তারপর, 'মাকার আলেক্সেয়েভিচের কথা আর বলো না!' এখন সবাই এই ঠিক করেছে, 'এটা নিশ্চয় মাকার আলেক্সেয়েভিচের কাণ্ড!' দেখছেন তো ভারেঙ্কা, কী দাঁড়াল; যত দোষ সব মাকার আলেক্সেয়েভিচের। ওরা পারে শুধু সারা দপ্তরে মাকার আলেক্সেয়েভিচকে নিয়ে কেচ্ছা রটাতে। শুধু কেচ্ছা নয়, আমি যে বুট পরি, আপিসের যে উর্দি গায়ে দিই, আমার চুলের পাট, এমনকি আমার চেহারাটা পর্যন্ত নিয়েও নিন্দে রটতে লাগল। এ সবকিছুই

ওদের মনের মতো নয়, বদলানো দরকার! এমনি চলল যত দূর আমার মনে পড়ে, প্রতিটি দিন। সেটা আমার সয়ে গিয়েছিল কেননা সবেতেই আমি অভ্যস্ত হয়ে যাই, কেননা আমি নিরীহ লোক, সামান্য লোক। কিন্তু এসব কেন? আমি কি কারো অনিষ্ট করেছি? কারো পদ বেদখল করে নিয়েছি? নাকি, ওপরওয়ালার কাছে কারো নামে চুকলি কেটেছি কখনো? না, মাইনের জন্যে ধরাধরি করেছি, নাকি কারো বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা সাজিয়েছি? এসব কথা ভাবাই তো অন্যায়। ওসবের সাধ্যি আমার কোথায়? ভেবে দেখুন-না, ধূর্তামি আর আত্মাভিমানের সামর্থ্য কি আমার আদৌ আছে? ভগবান মাপ করুন, কী করেছি যে আমার পেছনে এমন করে ওরা লাগবে? আপনার চোখে তো আমি ভালো লোক অথচ সবার চেয়ে আপনি তো সেরা, কারো সঙ্গে তুলনা হয় না। কেননা সবচেয়ে বড়ো নাগরিক গুণ কাকে বলবেন? কাল একটা ব্যক্তিগত আলাপের মধ্যে এভস্তাফি ইভানোভিচ বলছিলেন যে সবচেয়ে বড়ো নাগরিক গুণ হল দু'হাতে টাকা করা। উনি আলাপ করছিলেন ঠাট্টা ছলে (আমার দৃঢ় ধারণা ঠাট্টাই)। কিন্তু কথাটার পেছনকার নীতিবাক্য হল এই যে কারো গলগ্রহ হয়ে থাকা উচিত নয়—আমি তো কারো গলগ্রহ নই। আমার তো নিজের খাবার রুটিটুকু আছে, অবিশ্যি সাধারণ রুটি, কখনো তা বাসিও হতে পারে, কিন্তু আছে তো, সেটা আমার সৎভাবেই উপার্জন করা, এবং আইনসঙ্গতভাবেই তা আমি খাই। কিন্তু কী করার আছে? আমি নিজেই তো জানি যে নথিপত্র নকল করে যৎসামান্যই কিছু করছি, তবু এই আমার গর্ব যে আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ তো করছি। সত্যি, নকল করার কাজে কী এসে গেল? সেটা কী এমন অপরাধ? 'ওই দেখো, বসে বসে নকল করছে!' বলে, 'আপিসের ধেড়ে ইঁদুরটা নকল করতে বসেছে!' এর মধ্যে মানহানির কী আছে? ঝরঝরে সুন্দর লেখা, দেখতে ভালো লাগে, হুজুর খুশি হন। সবচেয়ে জরুরি কাগজগুলো ও'র জন্যে নকল করে দিই আমিই। স্টাইলের কথা ধরলে ও আমার নেই। ওই হতভাগা জিনিসটা যে আমার নেই সে আমি ভালো করেই জানি, সেইজন্যেই চাকরিতে উন্নতি করতে পারি নি। এমনকি আপনার কাছেও ভারেঙ্কা, এই যে এখন লিখছি, সেটা লিখছি সোজাসুজি, কোনো রকম পেঁচিয়ে নয়, যা মনে আসে লিখে যাই... সে আমি খুবই জানি, কিন্তু সকলেই যদি রচনা করতে

বসে. তাহলে নকল করার কাজটা কে নেবে তখন? এই হল আমার প্রশ্ন, তার জবাব দিন গো ভারেঙ্কা। মানে এখন আমি বুঝেছি যে আমারও দরকার আছে, আমাকে ছাড়া চলবে না, আজেবাজে ব্যাপারে লোকের মাথা খারাপ করে দেবার কোনো মানে হয় না। মিল পেয়ে থাকলে নয় ধেড়ে ইঁদুরই বলুক! কিন্তু এই ধেড়ে ইঁদুরটারও তো দরকার আছে, ধেড়ে ইঁদুরটাও কাজ দিচ্ছে, ধেড়ে ইঁদুরটাকে রেখেছে, এবং তাকে মাইনে দেওয়া হচ্ছে, এমনি ধারা ধেড়ে ইঁদুর আমি! যাক, ইঁদুরের কথা যথেষ্ট হয়েছে রানী আমার। বলব বলে ভাবি নি, এমনি উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম খানিকটা। তবে মাঝে মাঝে নিজের প্রতি সুবিচার করা তো উচিত। এবার বিদায় ভারেঙ্কা, আমার সান্ত্বনার ধন! যাব, অবশ্য-অবশ্যই আপনাকে দেখতে যাব, ভাববেন না। আপাতত মন খারাপ করে থাকবেন না, বই-ও নিয়ে যাব সঙ্গে করে। বিদায় ভারেঙ্কা।

আপনার অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী
মাকার দেভুশকিন

২০শে জুন

করুণাময় মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

তাড়াতাড়ি করে লিখছি, কেননা হাতের কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে ঠিক সময়ের মধ্যেই। ব্যাপারটা হল কি, ভালো একটা কেনাকাটার সুযোগ আছে। ফেদোরা বলছে ওর পরিচিত কে একজন নতুন একটা ইউনিফর্ম বিক্রি করতে চায় — ট্রাউজার, ভেস্ট, টুপি সমেত পুরো ইউনিফর্ম, বলছে একেবারে নতুন আর খুব সস্তাও। আপনি কিনুন-না কেন! আপনার তো এখন টানাটানি নেই, টাকা আছে, নিজেই বলেছেন, আছে! দোহাই আপনার, কৃপণতা করবেন না, জিনিসটা তো দরকারী। নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখুন, কী পোশাক পরে আপনি ঘোরেন, লজ্জার কথা। সব তালি দেওয়া! নতুন বলতে তো কিছুই নেই আপনার। যতই বলুন আছে, আমি নিশ্চয় জানি নেই। আপনার নতুন ইউনিফর্মটা যে কী করেছেন, ভগবানই

জানেন। তাই, দয়া করে এটা কিনে ফেলুন। আমার জন্যেই না হয় করুন, আমায় তো আপনি ভালোবাসেন তাই কিনুন।

আমার জন্যে আপনি কিছু কাপড়চোপড় উপহার পাঠিয়েছেন, কিন্তু শুনুন মাকার আলেক্সেয়েভিচ, আপনি যে নিজের সর্বনাশ করছেন। আমার জন্যে আপনি যে খরচা করেছেন সে কি তামাশা! কত টাকা, ভয়ই লাগে। কী ভীষণ খরুচে লোক আপনি! ওসবে আমার দরকার নেই। ও জিনিসগুলো একেবারেই বাড়তি। আমি জানি, আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আপনি আমায় ভালোবাসেন। উপহার পাঠিয়ে পাঠিয়ে সেকথা আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া সত্যি অহেতুক, তা গ্রহণ করা আমার পক্ষে অতি কঠিন। আমি যে জানি, তার জন্যে আপনাকে কী মূল্য দিতে হচ্ছে! মিনতি করে বলছি মাকার আলেক্সেয়েভিচ, এই শেষ বার, আর যেন না হয়। ব্যস। আমি আপনাকে যে কড়চা পাঠিয়েছিলাম, সম্পূর্ণ করে তার শেষটুকু পাঠাবার জন্যে লিখেছেন, কিন্তু সত্যি বলতে, কী করে যে অতখানি লিখতে পেরেছিলাম, ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু আমার অতীতের কথা বলার শক্তি এখন আমার নেই এমনকি সে সম্পর্কে ভাবতেও আমি চাই না, সে স্মৃতি আমার কাছে ভয়ঙ্কর। সবচেয়ে কষ্ট লাগে বেচারি মায়ের কথা বলতে, এইসব দানবদের হাতে তিনি মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে গেছেন। ভাবতেও হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। এখনো সবকিছু এত তাজা যে এক বছর পেরিয়ে গেলেও আত্মস্থই হতে পারি নি, মনের শান্তি ফিরে পাওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু আপনি তো সব জানেন!

আপনাকে তো বলেছি আন্না ফিওদরভনা এখন কী ভাবছেন। আমায় তিনি অকৃতজ্ঞ বলে গাল দিচ্ছেন, বিকভ মশায়ের সঙ্গে তাঁর যেকোনো সংস্রব ছিল সেকথা তিনি বেমালুম অস্বীকার করছেন! তিনি চান, আমি ফিরে যাই। বলছেন, ভিক্ষার অন্নে আমি দিন কাটাচ্ছি, বিপথে চলেছি। বলছেন, তাঁর কাছে ফিরে গেলে বিকভ মশায়ের সঙ্গে সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে নেবেন, আমার কাছে দোষ স্খালনে তাঁকে বাধ্য করবেন। বলছেন, শ্রীযুক্ত বিকভ আমায় ভালো যৌতুক দিতে চান। ঈশ্বর ওঁদের ক্ষমা করুন! আপনি আর আমার দরদী ফেদোরার সঙ্গে এখানে আমি ভালোই আছি। ফেদোরার অনুরাগ দেখে আমার মনে পড়ে যায় আমার বিগত ধাই-মার কথা। আত্মীয় হিশেবে আপনি অনেক দূরের, তবু আপনার নামটা আমাকে

বাঁচাচ্ছে। ওঁদের আমি জানি না, পারলে ওঁদের আমি ভুলে যেতে চাই। আমার কাছ থেকে আর কী চাই ওঁদের? ফেদোরা বলে, সবটাই নাকি গুজব, আমাকে ওঁরা আর ঘাঁটাবেন না। ঈশ্বর করুন যেন তাই হয়!

ভ. দ.

২১শে জুন

আদরের ছোট্ট রানী আমার!

লিখতে চাইছি কিন্তু কী করে শুরু করব জানি না। আমরা এই যে এইরকমভাবে আছি ভাবতে কী অদ্ভুতই না লাগে। মানে বলতে চাইছি যে এমন সুখের দিন আমার জীবনে কখনো আসে নি। মনে হচ্ছে, ভগবান যেন আমায় ঘর-সংসার জুটিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। সত্যি, আমার আদরের মেয়েটি, ভারি ভালো আপনি! চারটে জামা পাঠিয়েছি তা নিয়ে ওসব কী বকেছেন? ও যে আপনার দরকার, ফেদোরা আমায় বলেছিল। আপনার সন্তোষ বিধান করতে পারা যে আমার এক বিশেষ সুখ, সে যে আমারই তুষ্টি। সে সুখে বাধ সাধবেন না, ভারেংকা। আমাকে ঘাঁটাবেন না, বিরুদ্ধতা করবেন না আমার। এমনটা আমার কখনো হয় নি ভারেংকা, এখন আমি সংসারে ঢুকেছি। প্রথমত, আমি এখন বেঁচে রয়েছি দুজনে মিলে, কেননা আপনিও তো রয়েছেন আমায় আনন্দ দিয়ে আমার খুব কাছেই। দ্বিতীয়ত, একজন বাসিন্দা, আমার প্রতিবেশী রাতাজিয়ায়েভ — সেই যে অফিস-কর্মচারীটি সাহিত্য-বাসরের আয়োজন করেন, তিনি আমাকে আজ সন্ধ্যায় চায়ে নেমন্তন্ন করেছেন। আজ সভা আছে, সাহিত্য পাঠ করা হবে। এইরকমই এখন চলছে আমাদের ভারেংকা। এখন আসি, এসব এমনি লিখলাম, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই — শুধু আপনাকে আমার সুদিনের কথা জানাবার জন্যে। তেরেসার মারফত বলে পাঠিয়েছেন যে এম্ব্রয়ডারির জন্যে আপনার কিছু রঙীন সিল্কের সুতো দরকার। কিনে দেব গো, কিনব, রেশমী সুতো কিনব। কালই আপনার ইচ্ছে পূরণ করার আনন্দ লাভ করা যাবে। কোথায় কিনতে পাওয়া যায়, তাও আমার জানা আছে।

আপনার অকপট সুহৃদ
মাকার দেভুশকিন

২২শে জুন

করুণাময়ী ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

আমাদের বাড়িতে একটা ভারি করুণ, অতি অতি করুণ একটা দুর্ঘটনার কথা আপনাকে জানাই! আজ ভোর চারটের পরে গর্শ্‌কভদের ছোটো ছেলেটা মারা গেছে। শুধু কিসে মারা গেল, স্কার্লেট জ্বরে, নাকি অন্য কিছুতে, বলতে পারি না, ভগবানই জানেন। গর্শকভের ওখানে গিয়েছিলাম। সত্যিই কী দারিদ্র্য ওদের, ঘরখানাও কী অগোছালো! তাতে অবাক হবার কিছু নেই: গোটা পরিবার তো বাস করে একই ঘরে, শালীনতা বজায় রাখবার জন্যে শুধু কয়েকটা পর্দা টাঙিয়ে ভাগ ভাগ করা। ওর মধ্যেই কফিন এসে গিয়েছিল — সাদামাটা একটা কফিন, কিন্তু বেশ পরিপাটী। তৈরি অবস্থাতেই ওটাকে কেনে। ছেলেটার নয় বছর বয়েস, লোকে বলে বেশ প্রতিশ্রুতি ছিল ছেলেটার। ওদের দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছিল ভারেঙ্কা। মা কাঁদছিল না বটে, কিন্তু ভারি মনমরা, বেচারা। খাওয়াবার মতো একটা পেট কমল দেখে হয়ত ওরা স্বস্তি পাচ্ছিল। তবে আরো দুটি রয়ে গেছে: একটা কোলের আর একটা বছর ছয়েকের ছোটো মেয়ে। সত্যি বাচ্চাদের কষ্ট চেয়ে দেখায় কী আর আনন্দ — বিশেষ করে আবার সে যদি হয় নিজেরই বাচ্চা, অথচ সাহায্য করার কোনো উপায় নেই। পুরনো তেলচিটে ফ্রক কোট পরে বাপটা বসেছিল একটা ভাঙা চেয়ারে। গাল বেয়ে ঝরে পড়ছিল চোখের জল। হয়ত শোকের জন্যে ঠিক নয়, অভ্যেসবশে। চোখে ওর পচ ধরেছে। লোকটা অদ্ভুত গোছের! ওর সঙ্গে কথা কইলে লাল হয়ে ওঠে। থতমতো খায়, কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। ওর সেই ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল কফিনে ঠেস দিয়ে। কী ব্যাজার মুখ, বেচারা, কী যেন ভাবছিল। বাচ্চা ভাবনা করছে, এ আমার ভালো লাগে না ভারেঙ্কা। কেমন বিছছিরি লাগে দেখতে! ন্যাকড়ার কী একটা পুতুল পড়ে ছিল মেঝের ওপর, খেলছে না। ঠোঁটের ওপর আঙুল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েই আছে, নড়াচড়া নেই। আমাদের বাড়িউলী ওকে একটা মিষ্টি দিলে। মেয়েটা নিলে, কিন্তু খেলে না। কী যে খারাপ লাগে ভারেঙ্কা, তাই না?

মাকার দেভুশকিন

২৫শে জুন

অমায়িক মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

আপনার বইটা ফেরত দিলাম, বিশ্রী বই, একেবারে অখাদ্য! এমন রত্ন কোথা থেকে খুঁজে পেলেন? হাসির কথা নয়, সত্যিই এইরকম বই আপনি পছন্দ করেন নাকি মাকার আলেক্সেয়েভিচ? সেদিন বলেছিলেন, পড়বার মতো কিছু পাঠাবেন। যদি চান দুজনে মিলে পড়ব। এবার আসি। বেশি লেখার সময় নেই।

ভ. দ.

২৬শে জুন

প্রিয় ভারেঙ্কা! ব্যাপার হল, ও বইখানা আমি সত্যিই পড়ি নি। কয়েক পাতা পড়ে দেখলাম যে বাজে, সবই নিতান্ত লোক হাসাবার জন্যে লেখা। তাই মনে হল সত্যিই বুঝি মজাদার কিছু হবে। ভাবলাম, হয়ত বা ভারেঙ্কার ভালো লাগবে। তাই পাঠিয়েছিলাম।

যাই হোক, রাতাজিয়ায়েভ বলেছেন সত্যিকারের সাহিত্য কিছু আমাকে পড়তে দেবেন। পড়বার মতো ঢের বই পাবেন ভারেঙ্কা। রাতাজিয়ায়েভ লোকটা বোঝে-সোজেন — পণ্ডিত ব্যক্তি। নিজেও উনি লেখেন। আর কী যে সেসব লেখা! লোকটার কলম চলে বটে, কী স্টাইল লাগান; মানে প্রতিটি কথায় তাঁর স্টাইল — এমনকি ফালদোনি কি তেরেসার সঙ্গে কথা বলার সময় আমি মাঝে মাঝে যেসব অতি সাধারণ মামুলী কথা বলে থাকি, উনি তার মধ্যেও স্টাইল ভরে দেবেন। তাঁর সান্ধ্য আড্ডায় আমি যাই। বসে বসে আমরা ধূমপান করি, আর উনি তাঁর লেখা পড়ে শোনান — ভোর পাঁচটা পর্যন্ত পড়ে যান আর আমরা হাঁ করে শুনি। নিতান্ত সাহিত্য তো নয়, কী উপাদেয়! কী অপূর্ব! ঠিক যেন ফুল! প্রতিটি পৃষ্ঠা যেন তোড়া বাঁধা! লোকটা ভারি অমায়িক, মনটাও খুব ভালো, মায়া মমতা আছে! তাঁর কাছে আমি আর কে? কিছুই না! তাঁর নাম-ডাক আছে। আর আমি? ধর্তব্যের মধ্যেই আমি নই! তবু আমাকে বেশ প্রশ্রয় দেন উনি। মাঝে মাঝে তাঁর জন্যে কিছু কিছু নকল

করে দিই। ভাববেন না কিন্তু, এটা মাত্র একটা মতলব। আমাকে তিনি প্রশ্রয় দেন শুধু তাঁর কিছু নকল করার কাজ করিয়ে নেবার জন্যে তা ভাববেন না। ওই সব বাজে রটনায় বিশ্বাস করবেন না ভারেঙ্কা, একেবারে বিশ্বাস করবেন না! কাজটা আমি নিজেই করে দিই, আপন ইচ্ছায়, ওঁর আনন্দের জন্যে। আর উনিও যে আমায় প্রশ্রয় দেন সেটা আমিও যাতে একটু আনন্দ পাই সেইজন্যে। আচার-আচরণের সূক্ষ্মতা আমি তো বুঝি ভারেঙ্কা। উনি সজ্জন, অতি সজ্জন লোক, আর চমৎকার লেখক!

সাহিত্য জিনিসটা অপূর্ব ভারেঙ্কা, সত্যি অপূর্ব! গত পরশু এইটেই আমি টের পেলাম ওঁদের কাছ থেকে। ভারি গভীর একখান জিনিস! ওঁদের সব বইয়ের মধ্যে মনকে দৃঢ় করা, উপদেশ দেওয়া, এবং এইরকম আরো কত কী না পাওয়া যায়। আর কী চমৎকার করেই না লেখা! সাহিত্য হল একটা ছবি, মানে কতকগুলো দিক থেকে ছবি আর দর্পণের মতো। এতে প্রকাশ পায় ভাবাবেগ, সূক্ষ্ম সমালোচনা আর উপদেশও তাতে থাকে, জীবনের তা দলিল। এসব আমি ওঁদের কাছ থেকে পেলাম। খোলাখুলি বললে, ওখানে বসে বসে আমি তো কেবল শুনেই যাই, টানি (তা অন্য সকলের মতো আমিও পাইপ টানি) কিন্তু যেই ওঁরা হরেক রকম জিনিস নিয়ে তর্ক বিতর্ক শুরু করেন, অমনি আমি আর থেই পাই না ভারেঙ্কা। আপনার আমার মতো লোককে স্রেফ হাল ছেড়ে দিতে হয়। আমি তখন হয়ে পড়ি একেবারে বুদ্ধু, নিজেরই ভারি লজ্জা করে। সারা সন্ধ্যে বসে বসে সাধারণ প্রসঙ্গ নিয়ে যুৎসই আধখানা কথা মনে করার চেষ্টায় মাথা খুঁড়ে মরি। কিন্তু যেন চক্রান্ত করেই সেই আধখানা কথাটাও কিছুতেই মনে আসবে না আমার! এত দুঃখ হয় ভারেঙ্কা, কিছুতেই ঠিক ওদের যোগ্য হতে পারছি না। সেই যে কথায় বলে: বয়স হল, বুদ্ধি হল না। অবসর সময়ে আমি কীই বা করি। হাঁদার মতো পড়ে পড়ে ঘুমোই। কিন্তু অনাবশ্যক ঘুম দেওয়ার বদলে প্রীতিকর কিছু একটা তো করা যায়। বসে কিছু লিখলেও তো পারি। তাতে নিজেরও উপকার, অন্যেরও মঙ্গল। কী আর বলব গো, কত ওঁরা নেন, ভগবান ওঁদের মার্জনা করুন! রাতাজিয়ায়েভের কথাই ধরুন-না কেন, এক পাতা লেখা ওঁর পক্ষে কিছুই নয়। মাঝে মাঝে দিনে তিনি পাঁচ পাতা পর্যন্ত লিখে ফেলতে পারেন।

আর এক পাতার জন্যে তিনি নেন তিনশ' রুবল! তিনি নিজেই বলেছেন। আর গল্পটা যদি হয় চুটকির মতো, মজাদার, তাহলে দেব-না দেব-না করেও পাঁচশ'য়ের মতো। না বললে পরের বার হাজার করে ভরবে পকেটে! কেমন লাগছে, ভারভারা আলেক্সেয়েভনা? কী আর বলব! ওঁর একটা কবিতার খাতা আছে, এমনি ছোটো ছোটো কবিতা, তার জন্যে হাঁকিছেন সাত হাজার রুবল গো, ভাবুন একবার, সাত হাজার! এ যে এক স্থাবর সম্পত্তি, জমকালো একখান দালান-কোঠা! তিনি বলছেন, ওরা পাঁচ হাজার দিতে চেয়েছে, কিন্তু তিনি ডেঁটে আছেন। কত না মিনতি করে বুঝিয়ে বলেছি ওঁকে, ভগবানের দোহাই, চুলোয় যাকগে পাঁচ হাজারই নিয়ে নিন। নগদ একেবারে পাঁচ হাজার! কিন্তু উনি বলছেন, — না, সাত হাজারই ব্যাটাদের দিতে হবে! সত্যি, সেয়ানা লোক বটে।

তা ওই কথাই যখন উঠল গো, তখন আমি বরং 'ইতালীয় আবেগ' থেকে একটা জায়গা লিখে পাঠাই। এটা ওঁর রচনার নাম। পড়ে দেখুন ভারেঙ্কা, নিজেই বিচার করুন।

''...ভ্লাদিমির চমকে উঠল, ওর ভেতর উন্মাদ কামাবেগে রক্ত টগবগ করছে...

'চিৎকার করে ও বললে, 'কাউন্টেস, ও কাউন্টেস, জানেন কী সাঙ্ঘাতিক এই আবেগ, কী অসীম এই উন্মত্ততা? না, স্বপ্ন আমার মিথ্যা হয় নি! আমি ভালোবেসেছি সোল্লাসে, ক্ষিপ্তের মতো, পাগলের মতো! তোমার স্বামীর দেহের সমস্ত রক্ত ঢেলেও আমার প্রাণের এই উন্মাদ উদ্বেল উল্লাসকে প্রশমিত করা যাবে না! আমার ক্লান্ত, ক্লিষ্ট বক্ষের মাঝে যে সর্বগ্রাসী নারকীয় আগুন জ্বলে উঠেছে, কোনো তুচ্ছ বাধায় তা নিবৃত্ত হবার নয়। ও জিনাইদা! জিনাইদা আমার!..'

'ভ্লাদিমিরের বুকে এলিয়ে পড়ে প্রায় আত্মহারার মতো কাউন্টেস অস্ফুট স্বরে বললে, 'ভ্লাদিমির!'

'উল্লসিত স্মেলস্কি পুনরায় চিৎকার করে বললে, 'ও জিনাইদা!'

'ওর নিঃশ্বাস পড়ছিল তীক্ষ্ম ভাঙা ভাঙা। হতভাগ্য দুটি দুঃখীর হৃদয় বিদীর্ণ করে প্রেমের বেদীতে উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে উঠল দাবদাহ।

''ভ্লাদিমির!..' উন্মাদনায় ফিসফিস করে বললে কাউন্টেস, বুক তার

ফুলে ফুলে উঠছিল, রাঙা হয়ে উঠেছে গাল, আর আগুন ছুটছিল চোখ থেকে...

'সম্পূর্ণ হল নতুন আর ভয়ঙ্কর একটি মিলন!' . . . . . .

. . . .

'আধ-ঘণ্টা পরে বৃদ্ধ কাউন্ট এসে ঢুকলেন তাঁর স্ত্রীর প্রকোষ্ঠে।

'স্ত্রীর গালে হাত বুলিয়ে বললেন, 'প্রিয়তমে, আমাদের সম্মানিত অতিথির জন্যে চায়ের সামোভার আনতে বললে হয়?''

এরপর জিগ্যেস করছি গো, কীরকম লাগল, ভারেংকা? একটু বোধ হয় অসংযত, তা সত্যি। তবু ভালো। খুবই ভালো! আচ্ছা, এইবার 'এর্মাক ও জ্যুলেইকা' নামে ওঁর একটা গল্প থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি।

কল্পনা করে নিন, সাইবেরিয়ার জার কুচুমের মেয়ে জ্যুলেইকার প্রেমে পড়েছে সেই ভীম ভয়ংকর সাইবেরিয়া-বিজয়ী কসাক এর্মাক। জ্যুলেইকা তার হাতে বন্দী। দেখতেই পাচ্ছেন, একেবারে সেই ভয়ংকর ইভানের যুগের একটা ঘটনা। এইবার এর্মাক ও জ্যুলেইকার মধ্যে কথোপকথন।

''তুমি আমায় ভালোবাস জ্যুলেইকা? আবার বলো, বলো, বলো!..'

''ভালোবাসি, ভালোবাসি এর্মাক!' ফিসফিস করে বললে জ্যুলেইকা।

''তাহলে স্বর্গমর্ত্য তোমাদের ধন্যবাদ! আমি সুখী!.. শৈশব থেকে আমার উদ্বেল প্রাণ যাকিছু কামনা করেছে, তার সব, সব দিলে তোমরা! এইখানেই তাহলে তুমি আমায় নিয়ে এলে আমার ধ্রুব তারা — এইজন্যেই তুমি আমাকে অতিক্রম করিয়ে এনেছ উরালের প্রস্তর বেষ্টনী! সারা বিশ্বের কাছে আমি এবার আমার জ্যুলেইকাকে তুলে ধরব, মানব, দানব কারো সাধ্য নেই আমায় নিন্দিত করে! হায়, লোকে যদি ওর কোমল প্রাণের গোপন যন্ত্রণার মর্ম বুঝতে পারত, যদি দেখত ওর এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দুর মধ্যে রয়েছে কী কাব্য! অনুমতি দাও, ঐ চোখের জল আমি চুম্বনে মুছে নিই... হে অপার্থিব দেবী, তোমার ঐ স্বর্গীয় অশ্রুবিন্দু আমি পান করি!'

'জ্যুলেইকা বললে, 'এর্মাক, পৃথিবী যে বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ বড়ো কুটিল। তারা যে আমাদের তাড়না করবে, নিন্দিত করবে, হে আমার প্রিয়তম এর্মাক! সাইবেরিয়ার আপন তুষারের মধ্যে পিতার শিবিরের তলে যে ললনা বেড়ে উঠেছে সে কী করবে তোমাদের শীতল, তুহিন, নিষ্প্রাণ

আর কেতাদুরস্ত সমাজে! অন্তরের ধন আমার, দয়িত আমার, ওরা যে আমাকে বুঝে উঠতে পারবে না।'

''তাহলে তাদের মাথার ওপরে শনশনিয়ে উঠবে কসাকের তরবারি!' দু'চোখে অগ্নি বর্ষণ করে চিৎকার করে উঠল এর্মাক।''

ভেবে দেখুন ভারেঙ্কা, এর্মাক যখন জানল যে তার জ্যুলেইকা খুন হয়েছে, তখন কী তার অবস্থা। রাত্রির অন্ধকারে অন্ধবৃদ্ধ কুচুম এর্মাকের অনুপস্থিতিতে তার শিবিরে চুপি চুপি ঢুকে নিজের কন্যাকে খুন করলে। যে লোকটা তার সিংহাসন আর রাজদন্ড কেড়ে নিয়েছে, ভেবেছিল, এইভাবেই তার মারাত্মক শোধ নেওয়া যাবে।

''পাথরে লোহা ঘষতে চাই আমি!' ওঝাদের পাথরে তরোয়াল শান দিতে দিতে ক্রোধাবেগে চিৎকার করে উঠল এর্মাক, 'ওদের রক্ত, রক্ত আমার দরকার! কেটে কুচি কুচি করতে হবে ওদের!!!''

তারপর জ্যুলেইকার বিয়োগ ব্যথা সইতে না পেরে এর্মাক ইর্তিশ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এখানেই গল্পের শেষ।

এবার একটু রস করে লেখা ছোটো একটা উদ্ধৃতি, একটু লোক হাসাবার মতো:

''ইভান প্রকোফিয়েভিচ জেলতোপুজকে জানেন তো? মানে সেই যে লোকটা প্রকোফি ইভানোভিচের পা কামড়ে দিয়েছিল। ইভান প্রকোফিয়েভিচের চরিত্রটা একটু দড়কচা রকমের, কিন্তু নানা গুণ আছে ওর। প্রকোফি ইভানোভিচ আবার মধু দিয়ে মুলো খেতে ভালোবাসে। পেলাগেয়া আন্তোনভনার সঙ্গে যখন ওর বন্ধুত্ব ছিল... পেলাগেয়া আন্তোনভনাকে জানেন না? ওই যে-মেয়েটা সবসময়েই তার স্কার্টটা উল্টো করে পরে।''

কীরকম হাস্যরস ভারেঙ্কা? খাঁটি হাস্যরস! তিনি যখন এটা পড়ে আমাদের শোনাচ্ছিলেন তখন হাসিতে আমাদের পেট একেবারে ফাটে ফাটে। এইরকমই লোক বটেন তিনি, ভগবান ওঁকে ক্ষমা করুন! হয়ত জিনিসটা একটু বেশি চটুল এবং নিতান্ত বানানো, তবু ভারি নির্দোষ, স্বাধীন চিন্তা এবং উদারনীতি-টিতি এর মধ্যে কিছু নেই। একথা বলতেই হবে ভারেঙ্কা, রাতাজিয়ায়েভ খুবই সচ্চরিত্র লোক — সেই কারণেই চমৎকার লেখক — অন্য লেখকদের মতো নন।

কিন্তু সত্যি, মাঝে মাঝে খেয়াল তো জাগে ভারেঙ্কা, কিন্তু কেমন হয়... যদি আমিও কিছু লিখতে শুরু করি। যেমন, কেমন হয় যদি হঠাৎ বেরোয় একটা বই 'মাকার দেভুশকিনের কবিতাবলি'! কী বলবেন তখন, আমার রানী? কীরকম লাগবে, কী ভাববেন? আমার কথা যদি বলেন, বই বেরুলে আমি কিন্তু নেভস্কি সড়ক দিয়ে হাঁটার একেবারেই সাহস পাব না। কী হবে, যদি লোকে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, ঐ যে যাচ্ছে দেভুশকিন, কবিওয়ালা সাহিত্যিক! হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ যে দেভুশকিন স্বয়ং! তখন, ধরুন, বুটগুলো নিয়েই বা কী করব আমি? কথায়, কথায়, বলে রাখি গো, বুট জোড়া আমার প্রায় সবসময়েই তাপ্পি দেওয়া, আর সত্যি বলতে তলাকার সোলটাও একেবারেই অশোভন। কী কাণ্ডই হবে যদি সবাই দেখে ফেলে সাহিত্যিক দেভুশকিনের কিনা তাপ্পি মারা জুতো! কোনো একজন কাউন্টেস কি ডাচেস যদি দেখে ফেলেন, বলবেন কী? অবিশ্যি মনে হয় না আদৌ তিনি তা লক্ষ্য করবেন, কেননা কাউন্টেসরা কখনো লোকের বুট নিয়ে, বিশেষ করে কেরানির বুট নিয়ে মাথা ঘামান না (বুটের মতো বুটও আছে বৈকি)। কিন্তু আমার আপন বন্ধুরাই আমার সবকথা ওঁকে বলে দেবে, রাতাজিয়ায়েভ তো সবার আগে। তিনি বলেন, তিনি নাকি রোজই কাউন্টেস ব.-এর কাছে যান। বলেন প্রত্যেক বার যান সেখানে, সেটা এমনি এমনি, কোনো ভদ্রতার প্রয়োজন হয় না। বলেন, কাউন্টেস ভারি অমায়িক, ভারি সাহিত্য-রসিক মহিলা। ঐ রাতাজিয়ায়েভ লোকটা তোফা লোক বটে!

কিন্তু এ নিয়ে অনেক বকছিলাম; লিখেছি শুধু ফুর্তির ঝোঁকে গো, আপনাকে খুশি করার জন্যে। বিদায় ভারেঙ্কা, অনেক আজেবাজে কথা লিখেছি, কিন্তু সে শুধু এইজন্যে যে আমার মেজাজটা আজ খুব ভালো। রাতাজিয়ায়েভের ঘরে আজ আমরা সকলেই নেমন্তন্ন খেয়েছি, ওরা (ঐ দুষ্টুগুলো) এমন সব কেচ্ছা শুরু করেছিল... কিন্তু সেকথা আপনাকে না লিখলেই হত। কিন্তু দেখবেন, আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাববেন না। এসব লিখলাম এমনি। বইগুলো পাঠাব, নিশ্চয় পাঠাব... পল্ দ্য কক্-এর একটা বই এখন হাতে হাতে ঘুরছে। কিন্তু পল্ দ্য কক্ আপনার জন্যে নয় ভারেঙ্কা, না, না, কিছুতেই দেওয়া চলে না। শুনেছি, পিটারবুর্গের সমস্ত সমালোচকই বইটি পড়ে মহনীয় ক্রোধে ক্ষেপে গেছেন।

এক পাউন্ড মিষ্টি পাঠালাম — বিশেষ করে আপনার জন্যেই কেনা। খেয়ে দেখুন ভারেঙ্কা, আর প্রতিটি মিষ্টি মুখে তোলার সময় আমার কথা মনে করবেন। শুধু লজেন্সগুলো কামড়ে খাবেন না, চুষে খেতে হবে, কামড়ালে দাঁতের ব্যথা হতে পারে। ফলের শুকনো মোরব্বা পছন্দ হয় কি আপনার? তাহলে লিখবেন। এবার আসি ভারেঙ্কা, বিদায়! আমার ছোট্টো আদরিণী, খ্রীষ্ট আপনার সঙ্গে থাকুন!

চিরকাল আপনার বিশ্বস্ত সুহৃদ
মাকার দেভুশকিন

২৭শে জুন

করুণাময় মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

ফেদোরা বলছে, আমি রাজি হয়ে গেলে এমন কিছু লোক আছে যারা আমাকে সানন্দে সাহায্য করে কোনো একটা বাড়িতে গভর্নেস-এর ভালো একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারে। কী মনে হয় আপনার, রাজি হব কি হব না। রাজি হয়ে গেলে আপনার ওপর আর বোঝা হয়ে আমায় থাকতে হবে না। কাজটাতেও মনে হয় পয়সা আছে। অন্য দিকে অপরিচিত একটা সংসারে গিয়ে ঢুকতে হবে ভাবলেও আমার কেমন ভয়-ভয় করে। ওরা একরকমের জমিদার, আমার সম্পর্কে জেনে যাবে, জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবে, কৌতূহলী হয়ে উঠবে। কী বলব তখন? তাছাড়া, আমি কেমন একটু বুনো-বুনো, লোক দেখলে অস্বস্তি লাগে। ভালোবাসি অভ্যস্ত কোণটিতে অনেক দিন থাকতে, অভ্যস্ত জায়গায় জীবনটা কষ্টের হলেও স্বস্তিতে থাকি। তার ওপর জায়গাটাও অনেক দূরে। কে জানে কী কাজ সেখানে করতে হবে, হয়ত স্রেফ শিশুর আয়া হতে হবে। লোকও তেমনি। দু'বছরের মধ্যেই তৃতীয় গভর্নেসকে বদলাচ্ছে। আপনি একটু পরামর্শ দিন মাকার আলেক্সেয়েভিচ, দোহাই আপনার, যাব কি যাব না? সত্যি, আপনি নিজে থেকে আমার সঙ্গে মোটেই দেখা করতে আসেন না কেন? ইদানীং আপনার দেখাই প্রায় নেই। যা দেখা হয় সে শুধু রবিবারে, তাও আবার গির্জায় উপাসনার সময়। কী কুনো লোক আপনি! ঠিক আমার মতোই!

অথচ আমি তো আপনার প্রায় আত্মীয় বললেই হয়। আপনি আমায় মোটেই ভালোবাসেন না মাকার আলেক্সেয়েভিচ, এদিকে একা একা মাঝে মাঝে ভারি মন খারাপ লাগে আমার। কখনো কখনো, বিশেষ করে সন্ধ্যের দিকে আমি একেবারে একা বসে থাকি, একেবারে একা। ফেদোরা কোথাও যেন চলে যায়, আর আমি বসে ভাবি আর ভাবি — যত পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে, দুঃখের কথা, আনন্দের কথা — চোখের সামনে সব ভেসে যায়, যেন কুয়াশার মধ্যে ঝলক দেয় আবছা-আবছা। চেনা চেনা মুখগুলো ভেসে ওঠে (দেখি একেবারে যেন সব জীবন্তের মতো), মাকে দেখি অন্য সবার চেয়ে বেশি করে... আর কী যে সব স্বপ্ন আসে ঘুমের মধ্যে! টের পাচ্ছি, আমার স্বাস্থ্যটা গেছে, ভারি দুর্বল লাগে আমার। যেমন আজও, সকাল বেলা উঠতে গিয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। তার ওপর আবার কিছু দিন যাবৎ খারাপ একটা কাশি ধরেছে! টের পাচ্ছি, জানি যে শিগগিরই মরে যাব। কেই বা আমায় কবর দেবে, কেই বা যাবে কফিনের পেছনে পেছনে, কার কষ্ট হবে আমার জন্যে?.. হয়ত মরতে হবে অজানা-অচেনা এক সংসারে, অজানা-অচেনা এক জায়গায়। ওহ্ ভগবান, বড়ো দুঃখের এই জীবন মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

আচ্ছা কী আপনি, কেবলি আমায় মিষ্টি খাওয়াতে চান কেন? সত্যিই, ভেবে পাই না অত টাকা আসে কোথা থেকে? আহ্ বন্ধু আমার, টাকা একটু জমিয়ে রাখুন। ভগবানের দোহাই, খরচ করে ফেলবেন না। আমার এম্ব্রয়ডারি করা একখান গালিচা ফেদোরা বিক্রি করছে। দাম দিতে চাইছে ব্যাংক নোটে পঞ্চাশ রুবল। বেশ ভালো দাম, অতটা পাব আশাই করি নি। তিন রুবল দেব ফেদোরাকে, আর নিজের জন্যে একখানা পোশাক সেলাই করে নেব, সাদামাটা, কিন্তু গরম গোছের একটা ফ্রক। আর আপনার জন্যেও বানাব একটা ওয়েস্ট কোট — নিজেই বানাব, ভালো জাতের একটা কাপড় দিয়ে।

ফেদোরা একটা বই এনেছে 'বেলকিনের গল্প'। পড়তে ইচ্ছে হলে আপনার কাছে পাঠাব। শুধু নোংরা করবেন না কিন্তু, কিংবা বেশি দিন ফেলে রাখবেন না। অন্যের বই; পুশকিনের রচনা। দু'বছর আগে আমি আর মা গল্পগুলো একসঙ্গে বসে পড়েছিলাম। এখন ফের পড়তে গিয়ে ভারি মন খারাপ লাগল। কোনো বই থাকলে পাঠাবেন, কিন্তু রাতাজিয়ায়েভের

কাছ থেকে পাওয়া বই নয়। ওঁর নিজের বই যদি আদৌ কিছু ছাপা হয়ে থাকে, তাহলে উনি হয়ত তাই দিতে চাইবেন। ওঁর লেখাগুলো কী করে আপনার ভালো লাগল মাকার আলেক্সেয়েভিচ? একেবারে বাজে... এখন আসি! অনেক বকেছি! মন খারাপ থাকলে যাকিছু একটা নিয়ে মাঝে মাঝে আমায় বকুনিতে পায়। তাতে ওষুধের কাজ করে! অমনি হালকা লাগে, বিশেষ করে যদি উজাড় করে দিই মনের বোঝা। বিদায় বন্ধু আমার, আসি।

আপনার

ভ. দ.

২৮শে জুন

আমার আদরের ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

ছি, ঢের হয়েছে মন খারাপ করা, লজ্জা করে না, ঢের হয়েছে রানী আমার! কোথা থেকে ওসব ভাবনা ঢুকিয়েছেন মাথায়? মোটেই আপনি অসুস্থ নন, মোটেই নন! আপনি তো এখন ফুটে উঠছেন, ফুলের মতো ফুটে উঠছেন! একটু ফ্যাকাশে হয়ত সত্যি, তবু ফুটে উঠছেন সন্দেহ নেই। কেন ওইসব দিবাস্বপ্ন? ছি, আমার ছোট্ট আদরিণী, ঝাঁটা মারুন ওসব স্বপ্নে। কেমন করে আমার এত ভালো ঘুম হয় দেখুন দেখি, কিছুতেই আমার অসুবিধা হয় না কেন? আমার দিকে চেয়ে দেখুন দিকি! বেশ থাকি, শান্তিতে ঘুমোই আমি, দিব্যি স্বাস্থ্য, জোয়ানের মতো তাজা, দেখেও আনন্দ! ছি, ছি, ভারেঙ্কা, লজ্জার কথা! ওসব কাটিয়ে উঠুন। আমি তো জানি গো আপনার ছোট্টো মাথাখানায় কী ঘুরছে। কিছু একটা হলেই হল, অমনি শুরু হবে আপনার দিবাস্বপ্ন, মন খারাপ করতে থাকবেন। দোহাই আপনার, এসব থামান। আর পরের ঘরে কাজ? সে কখনো হতে পারে না। না, না, না! কী এসব মাথায় আসছে আপনার, কী করে ভাবতে পারলেন! তার ওপর জায়গাটাও অত দূরে! না ভারেঙ্কা, আমার মত নেই। যথাসাধ্য আমি এর বিরুদ্ধতা করব। আমি বরং আমার পুরনো ফ্রক কোটটাও বিক্রি করে শার্ট পরে ঘুরব, তবু এখানে অভাবের কষ্ট আপনার হবে না। না ভারেঙ্কা, ওকাজ আপনার জন্যে নয়। নেহাৎ

বোকামি, একেবারে পাগলামি হবে তাহলে। নিশ্চয় জানি, এ নির্ঘাৎ ফেদোরার কীর্তি। বোঝা যাচ্ছে ওই নির্বোধ মেয়েটাই আপনার মনে এসব ঢুকিয়েছে। ওর কথা বিশ্বাস করবেন না লক্ষ্মীটি, ওর অনেক কথাই আপনি জানেন না নিশ্চয়... মেয়েটা একটা নির্বোধ, কুঁদুলে, বাজে। ওর জ্বালাতেই ওর স্বামী বেচারা ইহলোক ত্যাগ করেছে। নাকি ও আপনাকে কোনো ব্যাপারে চটিয়ে দিয়েছিল বোধ হয়? না, না ভারেঙ্কা, কিছুতেই না? তাহলে আমার হবে কী, কী করার থাকবে আমার? না ভারেঙ্কা, না গো, না! ওসব চিন্তা মন থেকে ধুয়ে ফেলুন। এখানে আপনার কিসের অভাব? আপনাকে পেয়ে আমাদের কত আনন্দ! আপনি আমাদের ভালোবাসেন। তাহলে, যেমন আছেন, তেমনি গুটিসুটি হয়ে থেকে যান না কেন! বই পড়তে পারেন, সেলাই করতে পারেন — কিংবা সেলাই করারও দরকার নেই, শুধুই থাকুন আমাদের এখানে। নিজেই ভেবে দেখুন, কী দাঁড়াবে তখন? আপনাকে বই এনে দেব, ফের কখনো একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া যাবে। শুধু আপনি আপনার মাথাটি ঠিক করুন গো, এসব আজেবাজে কথা আর কখনো ভাববেন না। আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, খুব শিগগিরই যাচ্ছি, শুধু আমার এই সরাসরি, খোলাখুলি কবুলতিটা খেয়াল করবেন: লজ্জার কথা ভারেঙ্কা, ভারি লজ্জার কথা! বিদ্বান লোক অবিশ্যি আমি নই, সে আমি নিজেই জানি। ইস্কুলে যেটুকু পড়াশুনা করেছি, তা হল গে ওই যে কথায় যাকে বলে, ধান চাল দিয়ে লেখাপড়া শেখা। কিন্তু বলছি আমার জন্যে নয়, বলতে চাই রাতাজিয়ায়েভের জন্যে, সে আপনি যাই ভাবুন। উনি আমার বন্ধু, তাই ওঁর পক্ষ হয়ে আমাকে বলতেই হবে। উনি ভালোই লেখেন, সত্যি অতি, অতি, অতিশয় ভালো লেখেন, এ ব্যাপারে আমি আপনার কথা মানতে পারছি না, কিছুতেই পারছি না। কিরকম ফলাওভাবে উনি লেখেন, কী আবেগ দিয়ে, কত রকম তার শব্দালঙ্কার, কত রকমের ভাব। ভারি সুন্দর! হয়ত আপনি ঠিক অনুভূতি নিয়ে পড়েন নি ভারেঙ্কা? হয়ত পড়ার সময় মনটা বিগড়ে ছিল, কিছু একটা নিয়ে রাগারাগি হয়েছিল ফেদোরার সঙ্গে, নাকি অপ্রীতিকর অন্যকিছু একটা ঘটেছিল? না, ফের পড়ে দেখুন ভারেঙ্কা, ঠিক মেজাজ নিয়ে, আর একটু মন দিয়ে, মনটা যখন বেশ হাসিখুশি তৃপ্তিতে ভরা — যেমন ধরুন যখন লজেন্স মুখে নিয়েছেন, তখন পড়বেন। একথা অবশ্যই মানি যে

রাতাজিয়ায়েভের চেয়ে ভালো লেখক আছেন, অনেক ভালো, (কে তাতে আপত্তি করবে)। তাঁরাও ভালো লেখক, রাতাজিয়ায়েভও ভালো। তাঁরা ভালো লেখেন, রাতাজিয়ায়েভও ভালো লেখেন। সবকিছু তিনি নিজের মন থেকে লেখেন, নিজেই লেখেন — সেটা ভালো কথা বই কি! বিদায় ভারেঙ্কা, বেশি আর লিখতে পারছি না। খুব ব্যস্ত আজকে। কাজ আছে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার ছোট্টো পাখি, দুর্ভাবনা ভেবে আর মন খারাপ করবেন না, ঈশ্বর আপনার সহায় থাকুন এবং আমি রইলাম

চিরকাল আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু
মাকার দেভুশকিন

পুঃ, বইখানির জন্যে অনেক ধন্যবাদ গো, পুশকিনও আমি পড়ব। আজকে সন্ধ্যের দিকে আপনাদের ওখানে নিশ্চয় যাব।

১লা জুলাই

প্রিয়বর মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

না, না, বন্ধু আমার, আপনাদের এখানে আমার জীবনযাত্রার কোনো মানে নেই, ভেবে-চিন্তে দেখেছি এমন একটা সুবিধাজনক প্রস্তাব ছেড়ে দেওয়া অন্যায় হবে। সেখানে অন্তত নিজের পাকাপোক্ত রুটি তো থাকবে। তাছাড়া অজানা একটা পরিবারের কাছ থেকে সহৃদয়তা পাবার জন্যে যথাসাধ্য করব আমি। দরকার হলে নিজের স্বভাবও বদলে নেবার চেষ্টা করব। অজানা-অচেনা লোকের মাঝে বাস করা, তাদের মনোরঞ্জন করে চলা, মনের কথা মনে চেপে থাকা — এসব অবশ্যি কঠিন হবে। কিন্তু ভগবান হয়ত সহায় থাকবেন। সারা জীবন ধরে লোকজন এড়িয়ে কুনো হয়ে কাটিয়ে দেওয়া তো চলে না! এরকম ব্যাপার তো আমার জীবনে আগেও ঘটেছে। বোর্ডিং ইস্কুলের দিনগুলো মনে পড়ে। তখন আমি ছোটো, রবিবারে হুটোপুটি করতাম বাড়িতে, লাফালাফি করতাম, মা বকলেও আমার বুকের ভেতরটা ভারি হালকা আর স্বচ্ছন্দ লাগত। আর যেই সন্ধ্যে হয়ে আসত, অমনি ভয়ানক মন খারাপ হয়ে যেত: ন'টার মধ্যেই ইস্কুলে পৌঁছতে হবে — সেখানে সবকিছুই কেমন পরপর আর নিষ্প্রাণ আর কড়া, আর সোমবারে সেখানে শিক্ষিকাদের মেজাজ থাকত

সবসময়েই রগচটা। বুক ভেঙে কাঁদতে ইচ্ছে করত। কোনো একটা কোণ বেছে নিয়ে কাঁদতাম একা একা, চোখের জল লুকিয়ে রাখতাম — নইলে ওরা বলবে, আমি আলসে। অথচ পড়তে হচ্ছে বলে আমি কাঁদতাম না। কিন্তু কী হল তাতে? সময়ে ইস্কুলটাও সয়ে গেল। সেখান থেকে বন্ধুদের ছেড়ে চলে আসার সময়েও আবার কাঁদলাম। তাছাড়া আপনার আর ফেদোরার ওপর বোঝা হয়ে থাকছি এ ঠিক নয়। এই চিন্তা আমাকে বড়ো কষ্ট দিচ্ছে। খোলাখুলি সব বলছি, কেননা আপনার সঙ্গে তো কিছু রাখা ঢাকার ব্যাপার নেই। এ তো আমার না-দেখা নয়। সেই সাতসকালে উঠে ফেদোরা তার ধোয়া কাচার কাজে নামে, বেশ রাত অবধি খেটে যায়? অথচ, বুড়ো হাড়গুলোর তো একটু বিশ্রাম দরকার। আমি কি আর দেখতে পাচ্ছি না যে আমার জন্যে আপনি নিজের সর্বনাশ করছেন, শেষ কোপেকটি পর্যন্ত ঢালছেন আমার পেছনে? এসবই যে বন্ধু, আপনার সঙ্গতির বাইরে। লিখেছেন যে, অভাবের তাড়না থেকে আমায় বাঁচাবার জন্যে গায়ের শেষ কোটখানাও বিক্রি করতে রাজি। বিশ্বাস করি বন্ধু, আপনার সহৃদয় অন্তঃকরণের ওপর আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু একথা আপনি বলছেন এখন। এখন হঠাৎ আপনার একটা প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে, বোনাসটা পেয়েছেন; কিন্তু পরে? পরে কী হবে? জানেনই তো, অসুখ আমার লেগেই আছে। আপনার মতো করে তো কাজ আমি করতে পারি না, পারলে খুশিই হতাম। তাছাড়া, কাজও জোটে না সবসময়। তাহলে করার আর কী থাকবে আমার? আপনাদের মতো দুটি ভালোমানুষের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনঃকষ্টে টেঁসে যাওয়া তো। আপনাদের দুজনের কাছে কতটুকু কী কাজে লাগব আমি? আমায় আপনার কী দরকার? আপনার কোন উপকারটা আমি করেছি? আমি শুধু মনে প্রাণে আপনার অনুরাগী, সর্বান্তঃকরণে আমি আপনাকে ভালোবাসি — ভয়ানক ভালোবাসি, কিন্তু পোড়া কপাল আমার! ভালোবাসি, ভালোবাসতে পারি, কিন্তু শুধু ওইটুকুনই, কোনো ভালো কাজ তো করতে পারি না। দিতে পারি না আপনার দয়ার প্রতিদান। আর আমাকে আটকে রাখবেন না। ভালো করে ভেবে আপনার চূড়ান্ত মত জানাবেন। উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম

আপনার স্নেহের

ভ. দ.

কীসব আজেবাজে খামখেয়ালি, কী পাগলামি শুরু করেছেন ভারেঙ্কা! আপনাকে অমনি রেখে গেলেই হল, অমনি যত রাজ্যের পাগলামি এসে জুটবে ছোট্ট মাথাটায়। এটা তেমন নয়, সেটা তেমন নয়! বেশ দেখতে পাচ্ছি ওসবই হল আপনার বাই আর পাগলামি! বলুন তো শুনি, আমাদের এখানে কিসের আপনার অভাব? লোকে আপনাকে ভালোবাসছে, আপনি ভালোবাসেন, সবাই আমরা সুখী, আর কী চাই? অজানা-অচেনা লোকের মধ্যে গিয়ে কী করবেন আপনি? তারা যে কীরকম মানুষ তা তো আপনার জানা নেই... আমাকে তো জিগ্যেস করতে পারতেন, কীরকম লোক তারা। আমি চিনি গো, খুব ভালো করেই আমি চিনি ওদের। নুন আমি খেয়ে দেখেছি ওদের। খারাপ লোক ওরা, খুব খারাপ ভারেঙ্কা, বুকে আর সইবে না। কড়া কড়া বকুনি আর বাঁকা বাঁকা চাউনি দিয়ে ওরা একেবারে শেষ করে ফেলবে। আর এখানে আপনি ভালো আছেন, দিব্যি আছেন, ঠিক যেন পাখির বাসার মতো আরামে। আমাদের যে আপনি অসহায় করে যাবেন। আপনাকে ছাড়া কী করব আমরা? এই বুড়ো মানুষটাই বা কী করবে তখন? আপনাকে আমাদের প্রয়োজন নেই? কোনো কাজে লাগছেন না? কাজে লাগছেন না মানে? মোটেই নয় ভারেঙ্কা, নিজেই ভেবে দেখুন কাজে লাগছেন কিনা। খুবই কাজে লাগছেন। ভারি হিতকর আপনার প্রভাব। এই যেমন আমি আপনার কথা ভেবে আনন্দ পাচ্ছি... মাঝে মাঝে আমি আমার সমস্ত ভাবাবেগ পত্রাকারে লিখে পাঠাই এবং আপনার কাছ থেকে বিশদ উত্তর পাই... পোশাক-টোশাক কিনে দিয়েছি আপনাকে, টুপিরও বায়না দিয়েছি, মাঝে মাঝে আপনার কোনো একটা বরাত পড়ে... আমি সেটা করে দিই। না, না, কাজে লাগছেন না মানে? তাছাড়া একেবারে একা একা আমার মতো এই বুড়ো মানুষটা করবেটা কী? সে কথাটা নিশ্চয় আপনি ভেবে দেখেন নি ভারেঙ্কা; না, না, ঠিক এই কথাটাই ভেবে দেখুন দেখি: আমি না থাকলে মানুষটা কোন কাজে লাগবে? আপনার সঙ্গে যে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। নইলে ফল কী দাঁড়াবে? নেভা নদীতে গিয়ে সবকিছু চুকিয়ে দেব। সত্যিই তাই হবে ভারেঙ্কা। তাছাড়া আর কী করার

থাকবে? আহ্‌ ভারেংকা, আদরের ভারেংকা আমার! মনে হচ্ছে আপনি চান যে একা একা একটা মালঠেলা গাড়িতে চাপিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হোক ভোল্কভো কবরখানায়, শবদেহকে এগিয়ে দেবে এক বুড়ি ভিখারিনী, সেখানে যে বালি দিয়ে ওরা আমার কবর ভরাট করে সবাই চলে যাবে, আমাকে ফেলে রেখে যাবে একলা। সেটা যে অপরাধ হবে ভারেংকা, মহা অপরাধ। হায় ভগবান, সত্যিই সে যে অপরাধ। আপনার বইখানা ফেরত দিচ্ছি, আর আমার মত যদি চান তো বলি, সারা জীবনে এমন চমৎকার বই পড়া আমার ঘটে ওঠে নি। নিজের মনে মনে এখন ভাবছি গো, ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করুন, এমন গেঁয়ো ভূত হয়ে আমি এত দিন ছিলাম কী করে? করলামটা কী? কোন জঙ্গলে দিন কাটালাম? সত্যি বলছি, একটা কিছুও যে আমার জানা নেই গো, কিছুই না! একেবারে কিছুই না, খোলাখুলি বলছি ভারেংকা, আমি একেবারে অশিক্ষিত, খুব কমই আমার পড়াশুনা, ভীষণ কম, প্রায় কিছুই না। 'মানুষের চিত্র' — বইটা পড়েছি, ভারি জ্ঞানগর্ভ; তাছাড়া 'যে বালকটি ছোট্ট ঘণ্টায় সুন্দর সুন্দর সুর তুলিত' আর 'ইভিক-এর সারস' — এই আমার বিদ্যা। এইটুকুই ছাড়া কখনো কিছু পড়ি নি। আর এখন আপনার ঐ বইটাতে পড়লাম 'ডাকবাবু'। কীরকম দেখুন ভারেংকা, দিনের পর দিন কেটে গেলেও অনেক সময় মানুষ জানতেই পারে না যে হাতের কাছেই এমন একটা বই আছে, যাতে সারা জীবনটাই রয়েছে যেন নখদর্পণে। আগে যা বোঝা যায় নি, পড়তে পড়তে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর একটু একটু করে কত কথা মনে পড়ে যায়, কত কী কল্পনা জেগে ওঠে, কত কী বোঝা যায়। এছাড়া আপনার বইটা আরো ভালো লেগেছে এইজন্যে: অন্য অনেক বই মাঝে মাঝে এতই উঁচু দরের যে পড়ে পড়ে মাথা খুঁড়লেও তার কোনো মানে খুঁজে পাই না। যেমন আমি, আমি ভোঁতা লোক, জন্ম থেকেই মাথাটা আমার একটু মোটা রকমের, তাই উঁচু কেতার বুদ্ধিমান ওসব বই আমার পোষায় না, কিন্তু এই বইখানা পড়ে মনে হল যেন আমিই লিখেছি, যেন বলা যেতে পারে, ভালো হোক মন্দ হোক আমার বুকখানাই বুঝি ওখানে উলটিয়ে মেলে ধরা হয়েছে, মেলে ধরা হয়েছে তার সমস্ত খুঁটিনাটি। এমনি বই-ই ওটা বটে। সত্যি, ভারি সহজ; আমিও যেন লিখতে পারতাম। কেনই বা পারতাম না? বইতে যা লেখা আছে, আমারও যে ঠিক তেমনি অনুভূতি হয়।

যেমন এই বেচারা সামসন ভিরিনের* মতো আমিও তো একই দলে পড়েছি। ভিরিনের মতো কত বেচারাই না আমাদের মধ্যে আছে! আর কী সুন্দর করে লেখা! যখন পড়ছিলাম যে বেচারি মদ খেতে ধরল, মদ খেয়ে অচৈতন্য হয়ে সারা দিন সেই ভেড়ার ছালের ওপর পড়ে পড়ে ঘুমুল, কিংবা পলাতকা হতভাগিনী কন্যার কথা ভেবে ও যখন তার কোটের নোংরা আস্তিন দিয়ে চোখের জল মুছছিল, তখন আমার প্রায় কান্না পেয়ে গিয়েছিল। এ যে একেবারে সত্যিকারের ব্যাপার! পড়ে দেখুন আবার, সত্যিকারের ব্যাপার, একেবারে জীবন্ত! এ তো আমার নিজেরই দেখা। আমার চারপাশেই তো এই। আমাদের তেরেসার কথাই ধরা যাক, বেশি দূরে গিয়ে কী লাভ! কিংবা ঐ বেচারা কেরানিটার কথা। নাম ওর 'গর্শকভ' হলেও আসলে ও তো দ্বিতীয় এক সামসন ভিরিন। আমাদের সকলের অবস্থাই তো ওই, যে কারো ভাগ্যেই তো ঘটনাটা ঘটতে পারত। এমনকি নেভস্কি সড়ক অথবা বাঁধের এলাকায় থাকে এমন একজন কাউন্টের বেলাতেও হতে পারত, যদিও ওদের উঁচু চালচলনের ফলে জিনিসটা দেখাত অন্যরকম। তবু ব্যাপার তো সেই একই। আমার বেলাতেও তা ঘটতে পারে। এই হল গে ব্যাপার, আর আপনি কিনা চলে যেতে চাইছেন আমাদের ছেড়ে? আমারও তো বিপদ হতে পারে ভারেঙ্কা, দুজনেরই সর্বনাশ ঘটাবে গো। ঈশ্বরের দোহাই, লক্ষ্মীটি, ওইসব বেয়াড়া চিন্তা মন থেকে দূর করে দিন, আমায় আর মিছে যন্ত্রণা দেবেন না। ছোট্ট পাখির কচি ছানা আমার, কে আপনাকে খাওয়াবে, একা একা কুলোকের হাত থেকে, সর্বনাশের হাত থেকে কী করে নিজেকে বাঁচাবেন? খুব হয়েছে ভারেঙ্কা, নিজেকে সামলে নিন! কুপরামর্শে কান দেবেন না। আপনার বইখানা আর একবার পড়ুন, মন দিয়ে পড়ুন। তাতে আপনার উপকার হবে।

'ডাকবাবু' গল্পটার কথা রাতাজিয়ায়েভকে বলেছিলাম। উনি বলছেন জিনিসটা সেকেলে, ভালো ভালো বইতে আজকাল নানা রকম রঙচঙ আর বর্ণনা থাকে। ও'র কথা অবিশ্যি খুব ভালো বুঝলাম না। তবে বললেন যে পুশকিন একজন ভালো লেখক, পুণ্যময়ী রাশিয়ার মুখ উজ্জ্বল করেছেন

---

* 'ডাকবাবু' গল্পের একটি চরিত্র।

ইত্যাদি অনেক কথা। সত্যি ভারেঙকা, অনেক ভালো কথা বলেছেন উনি, ভালো ভালো কথা। ফের মন দিয়ে বইটা পড়ুন। আমার পরামর্শ শুনুন, বুড়ো মানুষের কথার বাধ্য হয়ে আমায় সুখী করে দিন। তাহলে ঈশ্বর আপনাকে বর দেবেন। নিশ্চয় দেবেন।

আপনার বিশ্বস্ত সুহৃদ
মাকার দেভুশকিন

৬ই জুলাই

করুণাময় মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

আজ পনেরোটা চাঁদি রুবল নিয়ে এসেছিল ফেদোরা। তা থেকে তিন রুবল ওকে দেওয়াতে কী খুশিই না হয়ে গেছে বেচারি! চিঠিটা লিখছি কিন্তু খুব তাড়াহুড়ো করে। আপনার জন্যে এখন ওয়েস্ট কোটের ছাঁদ কাটছি। কাপড়টা চমৎকার। হলদে রঙের ফুল ফুল দেওয়া। একটা বই পাঠাচ্ছি—গল্প-সংগ্রহ একটা। কয়েকটা পড়েছি। 'গ্রেট কোট' নামে গল্পটা পড়বেন। আপনার সঙ্গে থিয়েটারে যাবার জন্যে জিদ করছেন। সে তো ভারি খরচ, তাই না? যদি আদৌ যাই, তাহলে গ্যালারির টিকিট কিনবেন কিন্তু। অনেক দিন থিয়েটারে যাই নি, মনেই পড়ে না কবে গেছি। কিন্তু ফের ভয় হয়, এসব হাঙ্গামায় অনেক খরচ হবে না? ফেদোরা কেবল মাথা নাড়ছে, বলছে, আপনি সাধ্যের বাইরে চলেছেন। আমি নিজেই তা টের পাচ্ছি—শুধু আমার জন্যেই কী ভীষণ আপনি খরচ করছেন! দেখবেন শেষ পর্যন্ত একটা সর্বনাশ না করে বসেন। ফেদোরা বলছিল, ভাড়া বাকি নিয়ে বাড়িউলীর সঙ্গে আপনার কথা কাটাকাটি সম্পর্কে কী গুজব যেন শুনেছে। আপনার জন্যে বড় ভয় হয় মাকার আলেক্সেয়েভিচ, বিদায়, বড়ো তাড়া। ছোটোখাটো কয়েকটা জিনিস সেরে ফেলতে হবে। টুপির ফিতেটা বদলাব।

ভ. দ.

পুঃ, থিয়েটারে যদি যাই, তাহলে কালো হালকা শাল আর নতুন টুপিটা পরব। ভালো হবে কি?

৭ই জুলাই

আদরের ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

...গত কালকার কথাই বলছি। হ্যাঁ গো, একসময় আমাদের মাথাতেও খামখেয়াল চেপেছিল, এক অভিনেত্রীকে দেখে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। তবে সেটা কিছু নয়, সবচেয়ে মজার কথা হল, ওকে আমি প্রায় দেখিই নি, থিয়েটারে গিয়েছিলাম একবার মাত্র। তবু একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম প্রেমে। আমার ঘরের লাগোয়া তখন ছিল জন পাঁচেক হুল্লোড়ে কিছু ছোকরা। এদের সঙ্গে জুটলাম প্রায় না চাইলেও, যদিও সর্বদাই ওদের কাছ থেকে আমি ভদ্রতার দূরত্ব রেখে চলতাম। অবিশ্যি ওদের তুলনায় পেছিয়ে না থাকার জন্যে হ্যাঁ-হ্যাঁ করে যেতাম সাধারণত। ওই অভিনেত্রীটি সম্পর্কে ওরা কত কথাই না আমায় বলেছে! অভিনয় থাকলেই গোটা দলটা গিয়ে বসত গ্যালারিতে — পকেট ওদিকে ঢুঢু। কেবলি হাততালি দিয়ে দিয়ে ওকে বারবার ফিরিয়ে আনত যবনিকার সামনে, স্রেফ পাগলা হয়ে উঠত। তারপর ঘুমতে দিত না — সারা রাত ধরে চলত শুধু ওর কথা। ওকে ওরা বলত গ্লাশা। সকলেই ওরা গ্লাশার প্রেমে পড়েছিল, প্রতিটি লোক। সবার বুকেই ছিল সেই কোকিল-কণ্ঠীর গান। শেষ পর্যন্ত ওরা আমাকে পর্যন্ত জপালে, অসহায় আমি, বয়স তখন খুব অল্প আমার, কী হচ্ছে বুঝতে না বুঝতে দেখলাম একদিন আমিও গিয়ে ওদের সঙ্গে বসেছি থিয়েটারের চার নম্বর সার্কেলে গ্যালারিতে। দেখতে তো পাওয়া যাচ্ছিল শুধু মঞ্চের কিনারাটুকুন। তবে শুনেছিলাম সবই। সত্যিই, অভিনেত্রীর গলাখানা ছিল ভারি মিষ্টি — মধুমাখা ঝঙ্কার তোলা নাইটিঙ্গেলের ডাকের মতো! চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেললাম আমরা, তালি দিয়ে দিয়ে হাতের ছাল উঠে গেল, লোকে প্রায় তেড়ে আসে আমাদের দিকে, আমাদের একজনকে তে শেষে বারই করে দেওয়া হল। বাড়ি ফিরলাম যেন ঘোরের মধ্যে — পকেটে শুধু একটি রুবল, মাইনে পেতে তখনো পুরো দশ দিন বাকি। কী করলাম বলে মনে হয় আপনার? পরদিনই আপিসে যাবার আগে ফরাসী সেন্টের দোকানে পুরো টাকাটি খরচ করে কিনলাম কিছু আতর আর সুগন্ধি সাবান। কেন যে ওসব কিনলাম কে জানে। সেদিন অভুক্তই গেল — সারা সময়টা কাটালাম তার

জানলার কাছে ঘুরঘুর করে। নেভস্কি সড়কের এক বাড়িতে চার তলায় ও থাকত। বাড়ি ফিরবার পর ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম নিয়েই রোজ চলে আসতাম ওর জানলার নিচে পায়চারি করার জন্যে। এমনি চলল দেড় মাস ধরে। পেছু ছাড়তাম না ওর। মাঝে মাঝে টগবগে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে ছুটাতাম তার জানলার পাশ দিয়ে। জেরবার হয়ে পড়লাম একেবারে, দেনা করতে হয়েছিল, কিন্তু অবশেষে আমার প্রেম উবে গেল। আর ভালো লাগল না। অভিনেত্রীরা ভালো মানুষদের এমনি দশা করে ছাড়ে গো! কিন্তু তখন অবিশ্যি আমি ছোকরা, বয়স ছিল অল্প!..

ম. দ.

৮ই জুলাই

ভারভারা আলেক্সেয়েভনা সুচরিতাসু!

বর্তমান মাসের ছয় তারিখে যে বইটি পেয়েছিলাম, তা ফেরত দিচ্ছি এবং সেইসঙ্গে অত্রপত্রে আপনার সঙ্গে একটু বোঝাবুঝিও করে নিতে চাই। এ কিন্তু অন্যায় ভারেঙ্কা, আমায় এমন গুরুতর অবস্থায় ফেলেছেন, এটা অন্যায়। কার কী যথাযোগ্য স্থান সে তো বিধাতার নির্বন্ধ। কারো ভাগ্যে আছে জেনারেলের ইপলেট্, কারো কপালে প্রিভি কাউন্সিলরের পদ, কেউ বা হুকুম দেবে, এবং অন্যেরা বিনা বাক্যে সভয়ে তা মান্য করবে। যার যা ক্ষমতা সেই অনুসারেই তো ব্যবস্থা। কারু একরকমের যোগ্যতা, কারু অন্যরকমের — এ তো স্বয়ং ঈশ্বরেরই বিধান। আজ তিরিশ বছর হল আমি আপিসে কাজ করে আসছি। সে কাজে আমার ত্রুটি নেই, আচরণ বিনীত, বিশৃংখলতার কোনো ঘটনা কখনো ঘটে নি। নাগরিক হিশেবে, নিজের বিবেক মেনে একথা বলব যে আমার দোষ-ত্রুটি কিছু আছে, কিন্তু গুণও আছে। উপরিওয়ালাদের শ্রদ্ধা করি, হুজুর নিজেও আমার ওপর সন্তুষ্ট। আমার প্রতি এযাবৎ আনুকূল্যের বিশেষ কোনো লক্ষণ না দেখালেও আমি জানি তিনি সন্তুষ্ট। বয়স হল, চুল পাকিয়ে ফেললাম, জ্ঞানত কোনো গুরুতর পাপ করি নি আমি। তবে ছোটোখাটো পাপ কি আর হয় নি? সে কেই বা না করেছে? সবাই পাপী ভারেঙ্কা, আপনিও পাপী। কিন্তু বড়োসড়ো কোনো ব্যাপারে দোষী হই নি, কোনো একটা নিয়ম না মানা,

কি সামাজিক শান্তিভঙ্গ করা—এসব দোষ করি নি কখনো, এসব ঘটে নি। একসময় ক্রুশ পুরস্কারও আমায় দিয়েছে। কিন্তু কী হবে বলে! এসব কথা তো আপনার অন্তরে অন্তরে জানা থাকা উচিত ছিল ভারেঙ্কা, এবং ও'রও জানা থাকা উচিত ছিল। লিখতে যখন বসেছেন তখন জানা থাকা উচিত। আপনার কাছ থেকে আমি এটা আশা করি নি গো, না ভারেঙ্কা! ঠিক আপনার কাছ থেকে এমন কান্ড আশা করি নি।

তার মানে কী! এরপর, কেউ তার ছোট্ট কোণটিতে সে যেমনই হোক, সেখানে নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করতে পাবে না? থাকতে পাবে না, যাকে বলে জল না ঘুলিয়ে, কাউকে না ঘাঁটিয়ে, ঈশ্বরে মতি রেখে, নিজেকেও ভয় করে, যাতে অন্যেরাও তাকে না ঘাঁটায়, তার খুপরিতে নাক না গলায়? উঁকি দিয়ে না দেখে কেমন চলছে ওর সংসার, আমার ভালো মতো ভেস্ট্‌টা আছে কিনা, উচিত মতো অন্তর্বাস আমার আছে কি, বুট এক জোড়া আমার আছে কি, থাকলে তার সোলটা কেমন—কী খাই, কী পান করি অথবা নকল করি কোন জিনিস?.. পেভমেন্টটা খারাপ থাকলে আমি যদি কখনো বুট জোড়া বাঁচাবার জন্যে পা টিপে টিপেই হাঁটি তাতে এমন কী হল ভারেঙ্কা? অন্যের সম্পর্কে কেন একথা লিখতে যাওয়া যে লোকটার টানাটানি চলছে, চাও খাচ্ছে না। যেন সকলকে চা খেতেই হবে! আমি কি প্রত্যেকের মুখের দিকে নজর করে দেখি কী চিবুচ্ছে সে? ওভাবে আমি অপমান করেছি কাউকে? না গো, আমাকে না ঘাঁটালে কেন অন্যকে অপমান করতে যাব? যেমন এই একটা দৃষ্টান্ত ভারভারা আলেক্সেয়েভনা, কী মানে হয় এর: লোকটা তার কাজ করে চলেছে মন দিয়ে, উৎসাহ নিয়ে—কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত তাকে শ্রদ্ধা করে (যাই হোক না কেন, শ্রদ্ধা সত্যিই করে)—অথচ হঠাৎ কোথা থেকে কে এসে কথা নেই বার্তা নেই, তোমার নাকের ডগায় বিনা কারণে তোমার মানহানি করে ছাড়লে! অবিশ্যি এটা ঠিক যে মাঝে মাঝে নতুন একটা পোশাক বানালে আনন্দ হয়, আনন্দে ঘুম আসে না সারা রাত, জেগেও সে কাটাতে পারে, সত্যিই তো। যেমন নতুন এক জোড়া বুট, কী তৃপ্তির সঙ্গেই না পরি, সেটা আমি জানি, কেননা নিজের পা দুখানা অমন চিকন, বাবু-মার্কা বুটের মধ্যে রয়েছে দেখলে আনন্দ হবে বৈকি। এসব জিনিস সঠিকভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। তবুও, এমন একখানা বই যে ফিওদর ফিওদরভিচ নির্বিবাদে ছেড়ে দিলেন, আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন

না দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেছি আমি। অবশ্য একথা সত্যি যে উনি এখনো একজন তরুণ বড়ো সায়েব, উনিও মাঝে মাঝে আমাদের ওপর তম্বি করতে ভালোবাসেন। কিন্তু করবেন নাই বা কেন? দরকার পড়লে কেনই বা আমাদের ভায়াটিকে এক চোট ধোলাই দেবেন না? মানে ধরা যাক, ধোলাই তিনি দিচ্ছেন অবিশ্যি সত্যি, এটা তিনি মাঝে মাঝে করেন নেহাৎ কর্তাত্বি ফলাবার জন্যে। তা কর্তৃত্ব ফলাবার জন্যেও ধোলাই দেওয়া চলে, শিক্ষা দেওয়া দরকার, ধমকে সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন, কেন না ভারেঙ্কা, নিজেদের মধ্যে বলে বলছি, ধমকে সাবধান করে না দিলে আমাদের ভায়াটি কিছুই করে না, কেবলি চেষ্টা করে কায়দা-টায়দা করে কোথাও টিকে থাকা, বলে, আমি হেন চাকরিতে আছি, তেন চাকরিতে আছি, কিন্তু কাজের বেলায় সাত হাত দূরে। তাছাড়া, আমাদের মধ্যে তো নানা কিসিমের পদ, এক এক রকম পদের জন্যে এক এক রকম ধোলাই দেবার ব্যবস্থা থাকা তো চাই, সেই অনুসারে তম্বির সুরও পাল্টাবে। এটাই যে রীতি, আমাদের মধ্যে একজন আর একজনের ওপরে তম্বি করবে, কারো কারো কাজ অন্যদের ধোলাই দেওয়া, দুনিয়াটা তো এই নিয়েই ভারেঙ্কা। তা না হলে দুনিয়াটাই তো লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, চুলোয় যাবে শৃঙ্খলা। ফিওদর ফিওদরভিচ যে এমন অপমানে গা করলেন না, তা ভেবে সত্যিই তাজ্জব বনে গেছি!

ওরকম জিনিস লিখে লাভ কী? কী ফল দেবে তাতে? পাঠকদের কেউ কি এসে আমায় একখান নতুন কোট দিয়ে যাবে? নাকি কিনে দেবে নতুন এক জোড়া বুট? কিছুটি দেবে না ভারেঙ্কা। স্রেফ পড়বে আর একবার পড়লে কেবল আরো এই ধরনের বই-ই পড়তে চাইবে। নিজের যেটা নেই লোকে তা মাঝে মাঝে ঢেকে রাখতে চায়, যেখানে হোক লুকিয়ে থাকতে চায়, কারণ লোক-নিন্দার ভয় তো আছে, কেননা দুনিয়ায় কিছু একটা পেলেই হল অমনি তোমার হেনস্থা করে ছাড়বে, দেখতে না দেখতে তোমার নাগরিক জীবন, পারিবারিক জীবন সবখানি একেবারে সাহিত্য হয়ে যাবে, ছাপা হবে, লোকে পড়ে হাসবে, সাতসতেরো কথা তুলবে! তারপর রাস্তায় মুখ দেখানোই হবে মুশকিল, কেননা সবকিছুর এমন হুবহু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে হাঁটার ধরন দেখেই লোকে আমাদের ভায়াটিকে তখন চিনে ফেলবে। তাও না হয় চলত, যদি বইয়ের শেষের দিকে লেখক একটু

শ্বধরে নিতেন, একটু নরম হতেন, ওর মাথার ওপর কাগজের টুকরো ছড়িয়ে দেবার পর যদি ধরা যাক এইরকম একটা কথা থাকত যে যাই হোক না কেন লোকটা সজ্জন, ভালোমান্বষ, তার ওপর সহকর্মীদের অমন আচরণ করা উচিত নয়, লোকটা তার উপরওয়ালাদের কথা মেনে চলেছে (এক্ষেত্রে কিছ্ব দৃষ্টান্ত তুলে ধরা ভালো), কারো ওপর কোনো আক্রোশ ছিল না, ঈশ্বরে ভক্তি রেখেছে, এবং মারা গেছে (লেখক যদি একান্তই তাকে মেরে ফেলতে চান) — বন্ধ্ব-বান্ধব পরিবার-পরিজন তার শোকে কাঁদছে। বেচারি মারা না গেলেই অবশ্য ভালো হয়। তার আপিসের কোটটা না হয় খ্বঁজে পাওয়া গেল, হ্বজ্বর তাকে কাছারিতে ডেকে পাঠাক, এবং তার গ্বণাবলি সম্পর্কে খ্বঁটিনাটি জেনে তার পদোন্নতি করে বেতন বাড়িয়ে দিক, তাতে কী হত জানেন, ধর্মের জয় হত, অধর্মের শাস্তি হত, আপিসের সহকর্মীদেরও কোনো লাভ হত না। আমি হলে অন্তত তাই করতাম। তাছাড়া, ও'র মধ্যে বিশেষত্ব বা প্রশংসার কী আছে? আমাদের বিচ্ছিরি জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক একটা বাজে ঘটনা। এমন একখানা বই কী করে পাঠাতে পারলেন আপনি? এ যে একটা দ্বরভিসন্ধিপ্রস্ত বই ভারেংকা। এটা একেবারে মিথ্যে, কেননা ওরকম কেরানি হতেই পারে না। এরকম বইয়ের বির্বদ্ধে আমার নালিশ র্বজ্ব করা উচিত ভারেংকা, আইনসঙ্গত নালিশ।

আপনার বিনীত সেবক
মাকার দেভুশকিন

২৭শে জ্বলাই

করুণাময় মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

সম্প্রতি যেসব কান্ড হয়েছে এবং আপনার যে চিঠিগ্বলি পেয়েছি, তাতে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছি, কিছ্ব ভেবেই পাচ্ছিলাম না। ফেদোরার কাছ থেকে সবটা শ্বনলাম। এমন হতাশ হয়ে অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে চাইছেন কেন, মাকার আলেক্সেয়েভিচ? আপনি যে কৈফিয়ত দিয়েছেন তাতে আমার মন ওঠে নি। এখন ব্বঝতে পারছেন তো, পয়সাওয়ালা সেই চাকরিটা নেওয়া আমার উচিত ছিল কিনা। সম্প্রতি যা যা হয়েছে তাতে

সত্যিই ভয় পেয়ে গেছি। বলছেন, এসব আপনি চেপে রেখেছিলেন শুধু আমায় ভালোবাসার জন্যে। আপনার কাছে আমি তো নিজেকে চিরকালই ঋণী জ্ঞান করে এসেছি, যখন বোঝাতেন যে আমার পেছনে আপনার যা খরচ, সেটা আপনার সঞ্চয় থেকে, ব্যাঙ্কে কোথাও জমানো আছে। এখন যখন টের পেলাম যে আপনার কোনো টাকাই ছিল না, হঠাৎ আমার দুরবস্থার কথা জেনে ব্যথিত হয়ে আপনি আগাম আগাম বেতন নিয়ে খরচ করেছেন, আমার অসুখের সময় পোশাকটা পর্যন্ত বেচতে হয়েছে, তখন এমন একটা কষ্টের মধ্যে পড়েছি যে এখনো পর্যন্ত ভাবনার কূল-কিনারা পাচ্ছি না। আহ্‌ মাকার আলেক্সেয়েভিচ, সহানুভূতি এবং আত্মীয়তার খাতিরে প্রথম দিকে আমায় যা সাহায্য করেছিলেন, তারপরই আপনার ক্ষান্ত দেওয়া উচিত ছিল, অপ্রয়োজনে টাকা খরচ করার দরকার ছিল না। আপনি আমাদের বন্ধুত্বের অবমাননা করেছেন মাকার আলেক্সেয়েভিচ, কেননা আমাকে কিছুই খুলে জানান নি। তারপর এখন যখন দেখছি যে আপনার শেষ কোপেকটিও আপনি খরচ করেছেন আমার পোশাক-আশাক, সন্দেশ-মিষ্টি, থিয়েটারের টিকিট, বইপত্তরের জন্যে, তখন আমার অমার্জনীয় লঘুচিত্ততার জন্যে অনুশোচনায় দগ্ধে মরছি এখন (কেননা আপনার দিকটা না ভেবেই তো এসব আমি গ্রহণ করেছিলাম)। যেসব জিনিস দিয়ে আপনি আমায় আনন্দ দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন, তা শুধু এখন কষ্ট আর নিষ্ফল অনুশোচনারই সৃষ্টি করেছে। ইদানীং আপনার বিমর্ষ ভাব আমার নজরে পড়ছিল, আর নিজেও আমি অস্বস্তিভরে কিছু একটার প্রতীক্ষা করলেও এখন যা ঘটল তা যে আমি ভাবতেও পারি নি। হায় ভগবান! এতই হতাশ হয়ে পড়েছেন আপনি, মাকার আলেক্সেয়েভিচ! আপনাকে যারা চেনে তারা ভাববে কী, বলবে কী? সহৃদয়তা, বিনয়, বিচক্ষণতার জন্যে আমি এবং সবাই যাকে শ্রদ্ধা করে এসেছি, সেই আপনি কিনা অমন জঘন্যতম একটা দুষ্কর্মের মধ্যে গিয়ে পড়লেন — এদিকে তো আপনার কখনো কোনো ঝোঁক ছিল না। ফেদোরার কাছ থেকে যখন শুনলাম, মাতাল অবস্থায় রাস্তা থেকে ধরে পুলিশ আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে, তখন কিরকম যে লেগেছিল কী বলব! বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম যদিও সন্দেহ হচ্ছিল কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটেছে, কেননা চার দিন ধরে আপনার পাত্তা নেই। আপিসের কর্তারা যখন আপনার

অনুপস্থিতির আসল কারণটা জানবে তখন তারা কী বলবে সেকথা ভেবে দেখেছেন মাকার আলেক্সেয়েভিচ? আপনি বলছেন, সবাই আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, আমাদের ঘনিষ্ঠতার কথা তারা জেনে ফেলেছে, আমাকে নিয়েও ঠাট্টা করে প্রতিবেশীরা। ভগবানের দোহাই মাকার আলেক্সেয়েভিচ, ওদিকে মোটেই কান দেবেন না, নিজে একটু সুস্থির হন। অফিসারদের সঙ্গে আপনার যে কাণ্ডটা ঘটেছে তা নিয়েও শঙ্কিত হয়ে আছি। এ নিয়ে ঝাপসা কিছু কথা আমার কানে এসেছে ইতিমধ্যেই। বলুন তো, এসবের মানে কী? লিখেছেন, সত্যি কথা সবখানি বলতে আপনার সাহস হয় নি, ভয় পেয়েছিলেন আমার বন্ধুত্ব বুঝি হারাবেন। লিখেছেন, আপনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, কী করে আমার অসুখে সাহায্য করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না, হাসপাতালে না পাঠিয়ে আমাকে বাড়িতেই রাখার জন্যে সবকিছু বেচেছেন, যত পেরেছেন টাকা ধার করেছেন আপনি, বাড়িউলীর সঙ্গে বিচ্ছিরি ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে রোজ। কিন্তু এসব কথা আমার কাছ থেকে গোপন করে খারাপটাই ঘটিয়েছেন। এখন তো জানতেই পারলাম সব। আপনার দুঃখ-কষ্টের কারণ যে আমি, সে বিষয়ে আমাকে সচেতন করে তুলতে আপনার বিবেকে বেধেছিল। কিন্তু এখন আপনার এ আচরণে যে আমার দুঃখই দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। এসব আমায় বিমূঢ় করে দিয়েছে মাকার আলেক্সেয়েভিচ! বন্ধু আমার, দুর্ভাগ্য বড়ো ছোঁয়াচে রোগ! যারা গরিব, দুঃখী, তাদের উচিত পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে থাকা, নইলে দুর্ভাগ্যের ছোঁয়া লাগে। আপনার মিতাচারী নির্জন জীবনের মধ্যে কখনো যা ঘটে নি সে বিপদ টেনে এনেছি আমিই। এতে আমি কষ্টে মরে যাচ্ছি।

খোলাখুলি লিখে জানান, ঠিক কী হয়েছিল আপনার, অমন কাণ্ড করতে গেলেন কেমন করে। সম্ভব হলে আমায় কিছু সান্ত্বনা দিন। স্বার্থপরের মতো কথাটা বলছি তা নয়, বলছি আমার বন্ধুত্বের আর ভালোবাসার জন্যে—আমার হৃদয় থেকে সে বন্ধুত্ব কিছুতেই মুছে যাবার নয়। বিদায়! জবাবের জন্যে অধীর হয়ে রইলাম। আমাকে যা ভেবেছেন, তা ভাবা আপনার উচিত হয় নি মাকার আলেক্সেয়েভিচ।

আপনার আন্তরিক অনুরক্ত
ভারভারা দব্রসিওলভা

২৮শে জুলাই

আমার আদরের ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

যেহেতু যা হবার তা চুকে গেছে এবং একটু একটু করে সবই ফিরে আসছে আগের অবস্থায়, সেইহেতু আপনাকে এই কথাটা বলি: লোকে কী ভাববে এই জন্যে আপনি যে উদ্বিগ্ন হয়েছেন, তাই ভারভারা আলেক্সেয়েভনা, আপনাকে জানিয়ে রাখছি, দুনিয়ায় আমার সব থেকে বেশি প্রিয় হল আমার আত্মাভিমান। সে কারণে অত্রপত্রে আমার দুরবস্থা এবং বিশৃঙ্খলতার বিষয় জ্ঞাপন করে আমি আপনাকে অবগত করে রাখছি যে আমার উপরিওয়ালারা এ সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না এবং জানতেও পারবে না। সুতরাং আগের মতোই তারা আমাকে শ্রদ্ধা সহকারে দেখবে। শুধু একটা জিনিসে ভয় পাই: লোকনিন্দা। বাড়িউলী চেঁচামেচি করে, আপনার দশ রুবলে আমার বকেয়া ভাড়ার একটা অংশ শোধ করে দেবার পরে এখন গাঁইগুঁই করে মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। আর অন্যদের কথা যদি ধরেন, তারা কোনো গন্ডগোল করবে না, শুধু তাদের কাছ থেকে টাকা ধার না চাইলেই হল, নইলে ওরাও কিছু না। আর আমার ব্যাখ্যার সমাপ্তিতে আপনাকে ভারেঙ্কা বলব যে, আমার কাছে আপনার সম্মানের মূল্য দুনিয়ায় সব থেকে বেশি, আমার সাময়িক বেচাল অবস্থাটায় এটা আমার এক সান্ত্বনা। যাক ভগবান, ঝড়ের প্রথম ঝাপটাটা, প্রথম ধকলটা কেটে গেছে, এবং আপনার বিচ্ছেদ আমার অসহ্য বলে, দেবী জ্ঞানে আপনাকে ভালোবাসি বলে আমি আপনাকে চলে যেতে দিই নি, ফাঁকি দিয়ে এইসব কান্ড করেছি, সেজন্যে আমাকে কপট বন্ধু আর স্বার্থপর লোক বলে ভাবছেন না এইজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে আমি কাজে লেগেছি, সুন্দরভাবে আমার কর্তব্য-কর্ম পালন করছি। গতকাল এভস্তাফি ইভানোভিচের কাছ দিয়ে যাবার সময় একটি কথাও তিনি বলেন নি আমায়। একথা অবিশ্যি আপনার কাছ থেকে লুকোব না গো, দেনার দায়ে এবং পোশাক-আশাকের দিক থেকে আমার দশা সঙ্গীন। কিন্তু সেটা সত্যিই বিশেষ কিছু নয় — ফের মিনতি করছি, ও নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। আরো পঞ্চাশ কোপেকী যে আধুলিটা আপনি পাঠিয়েছেন ভারেঙ্কা, সেটা মর্মান্তিক বিঁধেছে। এই অবস্থায়

তাহলে এসে ঠেকেছি, এই অবস্থা! এমন বুড়ো বোকা আমি, কোথায় আমি আপনাকে সাহায্য করব, না, আপনি আমার অসহায় অনাথিনী — আপনি সাহায্য করতে শুরু করেছেন আমাকে। টাকা জোগাড় করে ফেদোরা ভালোই করেছে। আপাতত কিছুকাল টাকা পাবার কোন সম্ভাবনা দেখছি না গো। কোনো রকম আশা দেখলে তৎক্ষণাৎ আপনাকে জানাব। কিন্তু ঐ লোকনিন্দা — ওইটাই আমায় সবচেয়ে পীড়া দিচ্ছে। বিদায় আমার রানী, আপনার ছোট্টো হাতখানিতে চুমু দিয়ে প্রার্থনা করি, শিগগির ভালো হয়ে উঠুন। সবিস্তারে সবকিছু লিখতে পারলাম না, কেননা আপিসে যাবার তাড়া আছে। অবহেলাজনিত যে ত্রুটি ঘটেছে তা পুষিয়ে দিতে হবে কাজের চাড় আর উৎসাহ দিয়ে। অন্যান্য আর সব ঘটনা এবং অফিসারদের সঙ্গে আমার ঝামেলার ব্যাপারটা মুলতবি রইল সন্ধ্যে পর্যন্ত।

আপনার সশ্রদ্ধ ও আন্তরিক অনুরক্ত
মাকার দেভুশকিন

২৮শে জুলাই

আঃ ভারেঙ্কা, ভারেঙ্কা আমার! এবার পাপ আপনারই। চিরকাল এটা আপনার বিবেকে বিঁধে থাকবে। আপনার শেষ চিঠিটা পড়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু মনের ভেতরটা তন্নতন্ন করে দেখে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে আমি ঠিকই করেছিলাম, একদম ঠিক। ওই সেই মাতলামির কথাটা অবিশ্যি বলছি না (ওটা যাক গে ভারেঙ্কা, যাক গে!), বলছি আমি যে আপনার প্রতি অনুরক্ত সেটা মোটেই আমার পক্ষে অবিমৃষ্যকারিতা নয়, মোটেই নয়। আপনি ভারেঙ্কা, কিছুই যে জানেন না গো। আর যদি জানতেন কেন এসব, কী কারণে আপনার অনুরক্ত না হয়ে পারি না, তাহলে যেসব কথা আপনি বলেছেন তা বলতেন না। ওসব কথা আপনি বলছেন শুধু যুক্তি মেনে, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, হৃদয়টা তা বলছে না।

সত্যি বলতে গো, ঐ অফিসারগুলোর সঙ্গে আমার ঠিক কী হয়েছিল তা জানি না, একদম মনে নেই আমার। আপনাকে বলা দরকার রানী আমার, সেসময় আমি ছিলাম ভারি একটা গোলমালের মধ্যে। ভেবে

দেখুন, গোটা মাসটা ধরে আমি বলা যেতে পারে যেন শুধু একটি সুতোয় ঝুলে থেকেছি। ভারি বিছছিরি অবস্থা। আপনার কাছ থেকে এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকেও ব্যাপারটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার বাড়িউলী ভয়ানক সোরগোল তুলে বসল। তাতে পরোয়া করি নি বৈকি। চ্যাঁচাক না বুড়ি ডাইনী কত চ্যাঁচাবে। কিন্তু প্রথমত, ওটা হল গে লজ্জার কথা, তাছাড়া ভগবান জানেন, বুড়ি কী করে যেন আমাদের যোগাযোগের ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিল এবং এমন ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ল যে আমি কানে আঙুল দিয়ে রইলাম। তবে, অন্যেরা তো আর কানে আঙুল দিয়ে রইল না বরং কান আরো খাড়া করে শুনতে লাগল। এখনো পর্যন্ত ভাবলে এত লজ্জা করে...

এইসবে ভারেঙ্কা, দুর্ভাগ্যের এই সবখানি চাপে আমি প্রায় শেষ হবার জোগাড়। হঠাৎ ফেদোরার কাছে শুনলাম এক বিচিত্র ব্যাপার, কোন এক হতভাগা আপনাদের বাসায় গিয়ে জঘন্য সব প্রস্তাব করে আপনাকে অপমান করে গেছে। এতে আপনার যে খুবই লেগেছিল, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি, কেননা আমার নিজেরই অপমানিত বোধ হয়েছিল। এই শুনেই ভারেঙ্কা, মাথাটা আমার বিগড়ে গেল, আত্মহারা হয়ে গেলাম, খেপে উঠলাম একেবারে। অস্বাভাবিক ক্রোধে ছুটে বেরিয়ে গেলাম, ইচ্ছে হচ্ছিল সোজা একেবারে সেই পাজী হতভাগাটার বাসায় যাই। আমি যে কী করতে চলেছি খেয়াল ছিল না, কেননা আপনাকে কেউ অপমান করবে, সে আমি সইতে পারছিলাম না। মানে, খুব মন খারাপ লাগছিল আর-কি! তখন আবার বৃষ্টি পড়ছিল, রাস্তায় কাদা — মন খারাপ লাগছিল ভয়ানক! নিরুৎসাহ!.. ভাবলাম ফিরে যাই... আর তখনই আমার কাল হল গো ভারেঙ্কা। দেখা হয়ে গেল এমেল্যা, মানে এমেলিয়ান ইলিচের সঙ্গে। লোকটা কেরানি, তবে এখন আর কেরানি নয়। বরখাস্ত হয়েছে — এখন কী করে, কেমনভাবে সংসার চালায় তা আমি বলতে পারি না। যাই হোক, একই পথ ধরলাম আমরা দুটিতে। তারপর — কিন্তু ভারেঙ্কা, বন্ধুর দুর্ভাগ্য আর প্রলোভনের কাহিনী শুনে কী আর আনন্দ হবে আপনার? তৃতীয় দিনের সন্ধ্যেয় এমেল্যার পাল্লায় পড়ে গিয়ে দেখা করলাম সেই অফিসারের সঙ্গে। ঠিকানাটা জেনে নিয়েছিলাম দরোয়ানের কাছ থেকে। কথাটা যখন উঠল তখন বলি, অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম ছোকরার

মধ্যে কিছু গণ্ডগোল আছে। ও যখন আমাদের বাড়িতে থাকত তখনই নজরে পড়েছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে অবিবেচনার কাজ করেছিলাম, কেননা যখন ওকে জানানো হল আমি এসেছি, তখন আমি ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিলাম না। সত্যি বলতে, কিছুই মনে পড়ছে না ভারেঙ্কা, শুধু এইটুকু মনে পড়ছে যে ঘরখানা অফিসারে ভর্তি — কিংবা ভগবান জানেন, হয়ত আমি এক একজনের জায়গায় দু'দুজন করে দেখছিলাম। ঠিক কী বলেছিলাম মনে নেই, তবে পবিত্র উষ্মা যে অনেক প্রকাশ করেছিলাম তা ঠিক। মানে, তখন ওরা আমায় ঘর থেকে বার করে দিলে, ছুঁড়ে ফেলে দিলে সিঁড়ি থেকে। ঠিক ছুঁড়ে ফেলেছিল বলা যায় না, ধাক্কা দিয়েছিল। কী করে বাড়ি ফিরেছিলাম সে তো আপনি আগেই জেনেছেন ভারেঙ্কা। এই হল গে বৃত্তান্ত! অবিশ্যি নিজের ক্ষতি আমি করেছি ঠিকই, আমার আত্মাভিমানে ঘা লেগেছে, কিন্তু ব্যাপারটা তো আর জানাজানি হয় নি — মানে আপনি ছাড়া বাইরের লোক কেউ জানে না। সেক্ষেত্রে ঘটনাটা যেন প্রায় ঘটেই নি বলে ধরা যায়। হয়ত তাই-ই, ভারেঙ্কা, আপনার কী মনে হয়? এটা সেইরকম, গত বছর আক্সেন্তি ওসিপভিচ পিওতর পেত্রভিচের যেমন অপমান করেছিল অ্যাপিসে — এ আমি নিঃসন্দেহে জানি। কিন্তু করেছিল গোপনে, একান্ত গোপনে। প্রথমে ওকে ডেকে নিয়ে গেল দরোয়ানের ঘরে — দরজার ফাঁক দিয়ে আমি সবই দেখেছি — তারপর সেখানে এক চোট নিলে, কিন্তু ভদ্রভাবে, কেননা আমি ছাড়া আর কেউ তা দেখে নি; কিন্তু আমি আর কী; মানে বলতে চাইছি যে আমি কারো কাছে ফাঁস করি নি। পিওতর পেত্রভিচ আর আক্সেন্তি ওসিপভিচের তারপর কোনো ভাবান্তরই নেই। জানেন, পিওতর পেত্রভিচ ভারি আত্মাভিমানী লোক — ব্যাপারটা সম্পর্কে সেও মুখ বুজে রইল। ফলে এখন ওরা পরস্পরকে অভিবাদন করে মাথা নুইয়ে, হ্যান্ড-শেক করে। আপনার কথার প্রতিবাদ করব না ভারেঙ্কা, করার সাহস নেই। পতন হয়েছে আমার, আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথা, নিজের কাছেই হেঁট হয়ে গেছি। এ নিশ্চয় আমার ললাট-লিখন, নিশ্চয় আমার নির্বন্ধ। আর জানেনই তো, ভাগ্যের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। যাক, আমার বিপদ-আপদের পুরো কাহিনীটা আপনি সবিস্তারে শুনলেন ভারেঙ্কা। শোনার মতো কিছুই নয়। শরীরটা বিশেষ ভালো নেই গো, আমার আমুদে মেজাজ সব গেছে। সবকিছু দিয়ে আমার

শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও স্নেহের প্রমাণ দাখিলার পর কর্ণাময়ী আমার ভারভারা আলেক্সেয়েভনা,

আপনার বশীভূত সেবক
মাকার দেভুশকিন

২৯শে জ্লাই

করুণাময় মান্যবর মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

আপনার দুটি চিঠিই পড়েছি, এবং পড়ে একেবারে হায়-হায় করে উঠেছি। সত্যি বন্ধু আমার, হয় আপনি কিছু একটা আমার কাছ থেকে চেপে যাচ্ছেন, নয় তো... সত্যি মাকার আলেক্সেয়েভিচ, আপনার চিঠিগুলো থেকে বেশ বোঝা যায়, কোনো একটা মুশকিলে পড়েছেন... দোহাই ভগবান, আসুন আমাদের কাছে, আজই আসুন। হ্যাঁ, শুনুন বলি, সোজা চলে এসে আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাবেন। কী করে প্রতিদিন চলেছে, কী করে আপনার ওই বাড়িউলীর সঙ্গে মিটমাট হল তাও আমি জানি না। এসব কথা কিছুই লিখছেন না, মনে হয়, এ সম্বন্ধে চুপ করে আছেন যেন ইচ্ছে করেই। এবার বিদায় বন্ধু, কিন্তু আজ অবশ্য-অবশ্য আসবেন। বরং এরপর থেকে আমাদের এখানেই প্রতিদিন খেয়ে গেলেই ভালো হয়। ফেদোরা রাঁধে ভালো। বিদায়।

আপনার
ভারভারা দব্রসিওলভা

১লা আগস্ট

ওগো আমার ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

ভগবানের কৃপায় উপকার দিয়ে উপকারের ঋণ শোধ করে আমায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন বলে আপনি সুখী হয়েছেন, ভারেঙ্কা। তাতে আমার কোনোই সন্দেহ নেই, আপনার দেবীতুল্য হৃদয়

যে কত ভালো তা আমি নিশ্চয় করে জানি। শুধু সেবারকার মতো আমায় এই নিয়ে বকবেন না যে আমার বুড়ো বয়সে কেলেঙ্কারি করে বসেছি আমি। আপনি যদি একান্তই বলেন আমার অপরাধ, তাহলে হ্যাঁ, হয়েছিল, কী আর করা যাবে। শুধু আপনার মুখ থেকে একথা শুনলে ভারি কষ্ট হয় মনে। এসব কথা বলছি বলে রাগ করবেন না যেন। বুকটা আমার ভারি ক্ষতবিক্ষত ভারেঙ্কা। গরিব হলেই লোকে খানিকটা খামখেয়ালী গোছের হয়। ওটা প্রকৃতিরই ব্যবস্থা। আগেও একথাটা আমার মনে হয়েছে, এখন আরো বেশি করে তা অনুভব করছি। গরিব লোক মাত্রেই খুঁতখুঁতে। দুনিয়াকে সে দেখে অন্যরকম করে। প্রতিটি লোককে সে নজর করে চোখের কোণ দিয়ে, নিজের চারপাশে বিব্রত দৃষ্টি বুলায়, প্রতিটি কথা কান পেতে শোনে, তার সম্পর্কে কিছু বলাবলি করছে না তো? বলবে, লোকটা অমন অসুন্দর কেন? ঠিক কী ভাবছে লোকটা? যেমন, এপাশ থেকে দেখলে লোকটাকে কেমন দেখাবে, ওপাশ থেকেই বা কেমন। তাছাড়া ভারেঙ্কা, সবাই জানে, গরিব লোকেরা ছেঁড়া ন্যাতাকানির চেয়েও হীন, সকলের কাছে অশ্রদ্ধেয় — তা নিয়ে যতই লেখালেখি করুক না কেন, কলম-পিষিয়েরা যতই লিখুক, গরিব লোকের যে দশা আগে ছিল তাই থাকবে। কিন্তু কেন থাকবে আগের মতোই? কারণ ওনাদের মতে, গরিব লোকটার সবখানি উলটিয়ে খুলে মেলে ধরা চাই, যাতে সবাই সবখানি দেখতে পায়, তার গোপন, পবিত্র কিছু থাকা চলে না, আর আত্মাভিমানী — সে তো একেবারে নয়। এই তো সেদিন এমেল্যা বললে, কোথায় যেন ওর জন্যে চাঁদা তোলা হচ্ছিল, কিন্তু প্রতিটি দশ কোপেক বাবত একধরনের সরকারি তদারকির ব্যবস্থা ছিল। ওরা ভাবছিল পয়সাটা বুঝি দান করা হচ্ছে, কিন্তু দিচ্ছে তো একটি গরিব লোককে দেখতে পাওয়ার দাম হিশেবে। পরোপকার আজকাল করা হয় ভারি অদ্ভুত ঢঙে। নাকি, চিরকালই এমনি হয়ে এসেছে, কে জানে? হয় ওরা জানে না কী করে পরোপকার করতে হয়, নয় ওরা মহা ওস্তাদ, দুয়ের একটা। আপনি হয়ত এটা জানতেন না ভারেঙ্কা, তাই বললাম। অন্য অনেক বিষয়ে আমরা হেরে আছি, কিন্তু এই ব্যাপারটা আমরা জানি বেশ ভালোই। কিন্তু গরিব লোকে কেন এসব জানে, এমনিধারা ভাবে? কেন? কারণ অভিজ্ঞতা, যেমন এই থেকে জানে যে পাশেই অমুক একজন বাবু কোনো একটা রেস্তোরাঁয়

যাচ্ছেন, মনে মনে ভাবছেন: 'তাই তো, ভিখারি কেরানিটি আজ কী খাবে কে জানে? আমি তো সতি-পাপিলিয়ত্ খাব, আর নিশ্চয় বিনা মাখনে জাউ খাবে ও।' আমি বিনা মাখনে জাউ খাই না খাই তাতে ওঁর কী? এইরকম লোক সব সত্যিই আছে ভারেঙ্কা, আর এরকমের কথাই সব ভাবে। মানহানিকারী অভদ্র এইসব লোকে ঘুরে বেড়ায়, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, পাথরের ওপর পুরোপুরি পা ফেলছ, নাকি হাঁটছ আঙুলে ভর দিয়ে, অথবা অমুক ডিপার্টমেন্টের অমুক এক কেরানির জুতোর ভেতর থেকে আঢাকা আঙুল বেরিয়ে পড়েছে, কনুইয়ের কাছটা ওর ফেঁসে যাওয়া, এইসব কথা লিখতে বসে যাবে এবং সে ভূষিমাল ছাপিয়েও ফেলবে! কিন্তু মশাই, আমার জামার কনুইয়ের কাছটা ছেঁড়া কিনা তা নিয়ে আপনার মাথা ব্যথা কেন? অভদ্র কথা হলে যদি মাপ করেন ভারেঙ্কা, তাহলে বলব কিন্তু গরিব লোকেরাও এ ব্যাপারে আপনার মতো ধরা যাক, কুমারী মেয়ের মতোই লজ্জা পায়। আপনি তো আর সবার সামনে, অভদ্র ভাষা মাপ করবেন, সবার সামনে আপনার পোশাক খুলতে তো আর যাবেন না ভারেঙ্কা, ঠিক তেমনি গরিব লোকটাও চায় না যে কেউ গিয়ে উঁকি দিক তার কোটরে, দেখুক তার পারিবারিক সম্পর্কাদি কেমন। আর সেই হল গে কথা! সেইজন্যেই যখন আমার শত্রুরা একজন সজ্জন লোকের সুনাম আর আত্মাভিমানে কালি দিল, তখন অত লেগেছিল আমার!

আর আজ বেশ খানিকটা ভালুক ছানার মতো, ঠোকর খাওয়া চড়ুইয়ের মতো ব্যবহার করেছি আপিসেও। ভাবতেও লজ্জায় মরে যাচ্ছি! লজ্জা লাগছিল ভারেঙ্কা! জামার পোশাকের তল থেকে আঢাকা হাত ঝলক দেয় কিংবা সুতোর ডগায় বোতাম ঝোলে লটপট করে, তাতে তো দমে যাওয়া স্বাভাবিক। চক্রান্ত করেই যেন এসবই আমার ছিল ভারি বিছছিরি! না চাইলেও মুষড়ে পড়তে হয়। ওহ্, কী আর বলব! খোদ স্তেপান কার্লভিচ পর্যন্ত আমার কী একটা কাজের কথা বলতে বলতে হঠাৎ শুরু করে দিলেন, 'এহ্, বাপুহে মাকার আলেক্সেয়েভিচ,' ব্যস আর কিছু না বলেই চুপ করে গেলেন। কী যেন ভাবলেন, কিন্তু আমি নিজেই তো টের পেলাম সব—এমন রাঙা হয়ে উঠলাম যে আমার টাক মাথাটা পর্যন্ত লাল মেরে গেল। ব্যাপারটা আসলে অবশ্য কিছুই নয়। তাহলেও ভারি অস্বস্তিকর, দুশ্চিন্তা ঘটায়। কিছু কি টের পেয়ে গেছে ওরা?

ভগবান করুন, কিছু যেন টের না পায়! সত্যি বলতে কি, একটা লোককে আমার খুবই সন্দেহ হচ্ছে, খুবই। এইসব অনিষ্টকারীদের তো কিছুতেই আটকায় না। ফাঁস করে দেবে, দু'একটা পয়সা পেলেই লোকের ব্যক্তিগত জীবনের কথা ফাঁস করে দেবে সব। ওদের কাছে তো পবিত্র বলে কিছু নেই।

এটি কার কীর্তি তা আমি এখন জানি। এটি রাতাজিয়ায়েভের কাজ। আমাদের দপ্তরের কার সঙ্গে যেন তাঁর আলাপ আছে। নিশ্চয় কথায় কথায় বলে বসেছেন, নানা রকম রঙও চড়িয়ে দিয়েছেন হয়ত। নয় তো উনি তাঁর নিজের দপ্তরেই গল্প করে শুনিয়েছেন, সেখান থেকে সেটা ছড়িয়েছে আমাদের দপ্তর পর্যন্ত। আমার প্রতিবেশীরা প্রত্যেকেই তো ব্যাপারটা সবই জানে। আপনার জানলার দিকেও আঙুল দিয়ে দেখায়; দেখায় যে তা আমি জানি। আমি যখন কালকে আপনাদের ওখানে দুপুরের খাবার খেতে যাই, তখন ওরা সকলেই মুখ বাড়িয়ে ছিল জানলা দিয়ে। বাড়িউলী বলছিল, এই দ্যাখো, ধেড়ে শয়তানটা এখন একটা কচি মেয়েকে নিয়ে পড়েছে, আর পরে অভব্য কথাবার্তা করেছে আপনার নামেও। কিন্তু আমাদের নিয়ে বই লেখা এবং সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বর্ণনা করা — রাতাজিয়ায়েভের এ দুরভিসন্ধির তুলনায় ওসব তো কিছুই নয়। উনি নিজেই এইসব কথা বলেছেন, ভালোমানুষেরা তা জানিয়েও গেছেন। আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছি গো, কী স্থির করব ভেবে পাচ্ছি না। পাপ ঢেকে আর কী হবে, রানী আমার, ঈশ্বরকে চটিয়ে দিয়েছি আমরা! সময় কাটাবার জন্যে কী একটা বই পাঠাবেন বলেছিলেন। দূর হোক গে ছাই বই। যাই বলুন, শেষ পর্যন্ত বই আর-কি? নেহাৎ গাঁজাখুরি। নভেল ছাইপাঁশ, নিষ্কর্মা লোকেরা পড়বে বলে যত ছাইপাঁশ লেখা! আমার কথাটা বিশ্বাস করুন গো, বহু দিনের অভিজ্ঞতা থেকে এ আমার বেশ জানা। আর কোনো এক শেকসপীয়রের কথা তুলে ওরা যদি বলে, 'জানো তো, সাহিত্যে শেকসপীয়র আছেন,' তাতে কী হল, তাহলে শেকসপীয়রও নেহাৎ ছাইপাঁশ। এসবেরই উদ্দেশ্য কেবল লোককে ল্যাঙ মারা।

আপনার
মাকার দেভুশকিন

২রা আগস্ট

করুণাময় মান্যবর মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

কিছু চিন্তা করবেন না, ঈশ্বরের কৃপায় সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। ফেদোরা আমাদের দুজনের জন্যে গাদাখানেক কাজ নিয়ে এসেছে, সোৎসাহে কাজ শুরু করে দিয়েছি আমরা। হয়ত আমরা সব ঠিক করে ফেলতে পারব। ফেদোরার সন্দেহ, আমার এই সাম্প্রতিক দুর্ভোগের মূলে আন্না ফিওদরভনার হাত নেই তা নয়। কিন্তু এখন তাতে আমার এসে যায় না কিছু। আজ আমার অসাধারণ খুশি লাগছে। আপনি টাকা ধার করার কথা ভাবছেন। দোহাই, ঈশ্বর ওটা থেকে আপনাকে বাঁচান! পরে শোধ দেবার সময় অশেষ কষ্টে পড়তে যাবেন না। বরং আমাদের এখানে কিছুটা থাকুন, ঘন ঘন আসুন, কান দেবেন না বাড়িউলীর কথায়। তাছাড়া বাকি যত শত্রু আর অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর কথা যদি ধরি, তাহলে আমার নিশ্চিত ধারণা যে আপনি অমূলক সন্দেহে কষ্ট পাচ্ছেন মাকার আলেক্সেয়েভিচ! খেয়াল রাখবেন কিন্তু, গতবার আপনাকে বলেছিলাম, আপনার লেখার ধরনটা বড়ো এলোমেলো। তাহলে ফের দেখা হবে, আসি। অবশ্য-অবশ্যই আমাদের এখানে আসবেন বলে আশা করে রইলাম।

আপনার

ভ. দ.

৩রা আগস্ট

ছোট্ট রানী আমার ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

সাগ্রহে আপনাকে জানাই যে ফের কিছু একটা আশার সঞ্চার হচ্ছে, জীবনাধিকা আমার। তবে বলতে দিন গো, লিখেছেন টাকা ধার করব না? সে একেবারে অসম্ভব, রানী আমার। আমার তো এমনিতেই হাতে কিছুই নেই, আর ওদিকে আপনার, ভগবান না করুন, হঠাৎ যদি কিছু একটা হয়ে বসে? শরীর তো আপনার বড়ো পলকা। সেইজন্যেই আমি একথা লিখছি যে টাকা ধার করা একান্ত জরুরি। মানে তাই চালিয়ে যাব।

আপনাকে বলে নিই ভারভারা আলেক্সেয়েভনা, আপিসে আমি বসি এমেলিয়ান ইভানোভিচের পাশে। যে এমেলিয়ানের কথা বলেছিলাম, এ সে নয়। আমার মতো এও একজন টিটুলার কাউন্সিলর*, ও আর আমিই সম্ভবত এখানকার গোটা দপ্তরে সবচেয়ে পুরনো, আদি কর্মচারী। লোকটা ভালোমানুষ, স্বার্থপর নয়, কিন্তু কথাবার্তা বলে কম, নিতান্ত একটি ভালুকের মতো চেয়ে থাকে। তা হোক বেশ কাজের লোক, হাতের লেখা ওর একেবারে ইংরেজদের মতো নিখুঁত ঝরঝরে! সত্যি বলতে কি, আমার চেয়ে মোটেই খারাপ নয়। মোটের ওপর, লোকটা গুণী! আমাদের মধ্যে অবশ্য তেমন কোনো অন্তরঙ্গতা নেই, শুধু ভদ্রতাসূচক যেটুকু না বললে নয়, যেমন: 'আচ্ছা চলি' বা 'শুভদিন', আর কখনো কখনো পেন্সিল কাটা ছুরির দরকার হলে বলি: 'ছুরিটা একটু দিন-না এমেলিয়ান ইভানোভিচ?' সমাজে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু আর-কি। কিন্তু আজ ও হঠাৎ আমায় বললে, 'কী অত ভাবছেন মাকার আলেক্সেয়েভিচ?' মনে হল, লোকটা আমার মঙ্গলই কামনা করছে, সবকিছু ওকে খুলে বললাম, এই এই ব্যাপার এমেলিয়ান ইভানোভিচ। মানে একেবারে সব অবশ্য নয়, ভগবান করুন, কখনোই তা বলব না, কেননা বলবার মতো সাহস হয় নি। শুধু কিছু কিছু ফাঁস করলাম, বললাম যে বড়ো টানাটানি চলছে, ইত্যাদি। এমেলিয়ান ইভানোভিচ বললে, 'তাহলে টাকা ধার করুন-না বাপু, ওই পিওতর পেত্রভিচের কাছ থেকেই কিছু ধার করুন-না কেন? লোকটা সুদে টাকা দেয়। আমি নিজেও ওর কাছ থেকে ধার নিতাম। সুদের হারও চলনসই, খুব চড়া নয়।' একথা শুনে ভারেঙ্কা, বুক আমার একেবারে লাফিয়ে উঠল। হয়ত পরোপকারী পিওতর পেত্রভিচের কানে ঈশ্বর সুবুদ্ধি দেবেন, টাকাটা ও ধার দিয়েও দেবে হয়ত আমাকে। কতটা বাড়িউলীকে দেব, কতটা দিয়ে আপনাকে সাহায্য করব, নিজের জন্যেই বা কী কী জিনিস মেরামত করব তার হিসেব পর্যন্ত শুরু করে দিয়েছিলাম, নইলে একেবারে মরমে মরে যাচ্ছি: এই চেহারায় এখানে বসে থাকতে ভয় করে, তাছাড়া ভগবান ওদের ক্ষমা করুন, আমাদের দাঁত-কেলিয়ারা আবার আমায় নিয়ে রঙ্গতামাসা করে। হুজুরও আমাদের টেবিলের সামনে দিয়ে হেঁটে যান

* আমলাতন্ত্রের চোদ্দ থাক ব্যবস্থার নিম্নতম একটি পদ।

মাঝে মাঝে। ভগবান না করুন, কিন্তু যদি হঠাৎ তাঁর নজর পড়ে আমার ওপর; যদি দেখেন যে আমার বেশভূষা ভদ্রগোছের নয়, তাহলে? পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পরিপাটীত্ব সম্পর্কে উনি ভারি কড়া। উনি হয়ত মুখে কিছুই বলবেন না বটে, কিন্তু আমি একেবারে লজ্জায় মারা যাব। এই সমুদয় কারণে একটু শক্ত হয়ে ছেঁড়া পকেটে লজ্জা লুকিয়ে পিওতর পেত্রভিচের কাছে গিয়ে হাজির হলাম—মনে মনে অনেক আশা, প্রতীক্ষায় দুরু দুরু বুক, সব একাকার। অথচ শেষ কালে কিনা কিছুই হল না ভারেঙ্কা, একেবারে কিছু না। পিওতর পেত্রভিচ কী নিয়ে যেন ব্যস্ত, কথা কইছিল ফেদসেই ইভানোভিচের সঙ্গে। আমি চুপিসাড়ে এগিয়ে ওর আস্তিনটা ধরে একটু টানলাম, মানে তাতে করে ওকে যেন ডাকাই হল, 'পিওতর পেত্রভিচ, ও পিওতর পেত্রভিচ, শুনুন।' ও চেয়ে দেখলে, আমি বলেই চললাম, এই এই হয়েছে, তিরিশ রুবল আমার দরকার ইত্যাদি। প্রথমটা মনে হল যেন আমার কথা ওর মাথায় ঢোকে নি, ফের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার পর ও হেসে উঠল, তারপর ব্যস, চুপ করে রইল। ফের আগাগোড়া সব বুঝিয়ে বললাম। ও জিগ্যেস করলে, 'জামীন বা বন্ধক রাখার মতো আপনার আছে কিছু?' তারপর কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে গিয়ে কেবলি লিখে চলল, আমার দিকে চেয়েই দেখল না। আমার খানিকটা হতভম্ব লাগল। বললাম, 'না, পিওতর পেত্রভিচ, জামীন আমার কিছু নেই, কিন্তু মাইনে পেলেই আমি টাকাটা ফেরত দিয়ে দেব। ফেরত দেব নিশ্চয়ই, ওটা আমার প্রথম কর্তব্য।' এই সময় কে একজন ওকে ডাকলে, আমি ওর জন্যে দাঁড়িয়েই রইলাম। ফিরে এসে ও কলম বাড়তে লাগল, আমায় যেন নজরই করছে না। তাই ফের শুরু করলাম, বললাম, কোনো রকম করেই কি হয় না পিওতর পেত্রভিচ? ও চুপ করে রইল, আমার কথা যেন ওর কানেই ঢুকল না। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অবশেষে ঠিক করলাম, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। আস্তিন ধরে আবার টানলাম। একটা কথাও যদি বলে? একটি কথাও বললে না। কলমটা বেড়ে নিয়ে লিখতে শুরু করে দিলে। ফলে চলে এলাম। হয়ত ওঁরা সবাই খুব গুণী লোক ভারেঙ্কা, কিন্তু কী অহঙ্কারী, ভীষণ অহঙ্কারী সবাই, আমাকে কি আর পাত্তা দেয়! ওঁদের কাছে আমরা কোথায় লাগি ভারেঙ্কা! সেই জন্যেই এসব কথা আপনাকে লিখছি। শুনে এমেলিয়ান ইভানভিচও হেসে উঠল এবং মাথা দোলাল। কিন্তু লোকটা

ভালো, উৎসাহ দিলে আমায়। গুণী লোক ও, কথা দিয়েছে তার পরিচিত চতুর্দশ শ্রেণীর একজন কেরানির কাছে আমায় সুপারিশ করে পাঠাবে, লোকটা থাকে ভিবর্গস্কায়া পাড়ায়, সেও সুদে টাকা ধার দেয়। এমেলিয়ান ইভানভিচ বলছে, লোকটা নিশ্চয় ধার দেবে। কালই ওর কাছে যাব গো। যাব কি—এ্যাঁ? আপনি কী বলেন, ধার না নিলে যে সর্বনাশ! বাড়িউলী আমায় প্রায় তাড়িয়ে দিতে চাইছে, খাবার বন্ধ করে দিয়েছে। বুট জোড়াও একেবারে গেছে ভারেঙ্কা, বোতামও কতকগুলো ছেঁড়া... কিই বা ছেঁড়া নয়! কর্তাদের কেউ যদি আমার এই হাল একবার দেখে? বিপদ ভারেঙ্কা, বিপদ, সমূহ বিপদ!

মাকার দেভুশকিন

৪ঠা আগস্ট

অমায়িক বন্ধু মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

দোহাই ভগবান, যথাসত্বর সম্ভব কিছু টাকা ধার করুন। এ অবস্থায় আপনার সাহায্য আমি চাইতাম না, কিন্তু কিসের মধ্যে যে আছি যদি জানতেন! এ বাসায় আর আমাদের থাকা চলে না। ভয়ানক একটা বিছছিরি ব্যাপার আমার ঘটেছে, যদি জানতেন কিরকম এখন বিচলিত হয়ে আছি, কিরকম ভেঙে পড়েছি! কী কান্ড দেখুন, আজ সকালে এক অচেনা ভদ্রলোক এসেছিলেন আমাদের কাছে, বয়স্ক লোক—প্রায় বুড়ো, পদক আঁটা পোশাক। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, ভেবে পাচ্ছিলাম না কী ওঁর দরকার আমাদের কাছে? ফেদোরা গিয়েছিল দোকানে। উনি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন, কেমন আছি, কী করছি এবং উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই ঘোষণা করলেন যে উনি সেই অফিসারটির খুড়ো। ভাইপো যে অন্যায় আচরণ করেছে, যার ফলে সারা বাড়ি আমাদের নিয়ে কথা রটছে, তাতে তিনি ভাইপোর ওপর ভারি রেগে গেছেন। বললেন, ভাইপোটি একটি অপদার্থ ছোঁড়া, আমায় তিনি নিজের রক্ষণাবেক্ষণে রাখতে রাজি। পরামর্শ দিলেন, ছেলে ছোকরাদের যেন আমি পাত্তা না দিই, পিতার মতো তিনি আমার প্রতি সহানুভূতিশীল, আমার প্রতি তিনি পিতৃসুলভ স্নেহ

পোষণ করেন এবং আমায় তিনি সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমি একেবারে লাল হয়ে উঠলাম, জানি না কী বলব, তবে তাড়াহুড়ো করে ওঁকে ধন্যবাদ দেবারও ইচ্ছে ছিল না। জোর করে উনি আমার হাতখানা নিয়ে গালে মৃদু চাপড় দিতে লাগলেন। বললেন, আমি নাকি দেখতে ভারি সুন্দর, আমার গালের টোল দেখে উনি ভারি খুশি হয়েছেন (কী না বললেন ভগবানই জানেন!)। তারপর পরিশেষে আমায় চুমু খাবার চেষ্টা করতে গেলেন, বললেন, উনি নিতান্তই বুড়ো (নচ্ছার কোথাকার!)। ঠিক এই সময় ফেদোরা আসে। একটু অপ্রস্তুত হয়ে ভদ্রলোক ফের বলতে লাগলেন, উনি আমার বিনয় আর সুমতি দেখে শ্রদ্ধা করেন আমায়, চান ওঁকে যেন বাইরের লোক বলে আমি গণ্য না করি। তারপর ফেদোরাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে অদ্ভুত কী একটা ছুতো করে কিছু টাকাও দিতে যান। ফেদোরা অবিশ্যি নেয় নি। অবশেষে যাবার জন্যে উঠে ফের খুব আশ্বাস দিলেন এবং বললেন আবার আমায় দেখতে আসবেন এবং এক জোড়া মাকড়িও আনবেন (লোকটা নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল মনে হয়); বাসা বদল করতে বললেন আমায়, ভালো একটা বাসার খোঁজও দিলেন, সে বাসাটা তাঁর জানা, এবং তাতে আমার এক পয়সাও লাগবে না। ফের তিনি ঘোষণা করলেন যে আমায় তিনি অতিশয় পছন্দ করেছেন কেননা আমি ভারি লক্ষ্মী মেয়ে এবং বুদ্ধিমতী, দুশ্চরিত্র যুবকদের কাছ থেকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দিলেন এবং পরিশেষে ঘোষণা করলেন যে তিনি আন্না ফিওদরভনাকে জানেন, আন্না ফিওদরভনা ওঁকে জানাতে বলেছেন যে তিনি স্বয়ং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন। এতক্ষণে আমার মাথায় ঢুকল ব্যাপারটা, কিরকম যে লেগেছিল বোঝাতে পারব না। ওরকম অবস্থায় পড়লাম জীবনে এই প্রথম। ক্ষেপে উঠে আমি ওঁকে একেবারে ধিক্কার দিয়ে ছাড়লাম। ফেদোরা আমার পক্ষ নিলে, এবং প্রায় জোর করেই ওঁকে বার করে দিলে ঘর থেকে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এটি আন্না ফিওদরভনার কীর্তি। নইলে ভদ্রলোক আমাদের সম্পর্কে জানবেন কোথা থেকে?

এবার আপনাকে বলছি মাকার আলেক্সেয়েভিচ, মিনতি করছি সাহায্য করুন, ভগবানের দোহাই, এ অবস্থায় আমায় ফেলে যাবেন না! কিছু না কিছু টাকা ধার করুন লক্ষ্মীটি, এখান থেকে উঠে যেতেই হবে। কিছুতেই এখানে থাকা চলে না, ফেদোরারও তাই মত। অন্তত পঁচিশ

রুবল দরকার। টাকাটা আপনাকে ফেরত দেব, রোজগার করে বাঁচাব, দিন কয়েকের মধ্যেই আমার জন্যে আরো কাজ নিয়ে আসবে ফেদোরা। তাই, যদি বেশি সুদ চায়, সে দিকে না চেয়ে রাজি হয়ে যান। সব ফেরত দেব, শুধু ভগবানের দোহাই এখন একটু সাহায্য করুন। এখন যখন আপনার নিজের অবস্থাই ওইরকম, তখন আপনাকে বিব্রত করছি, ভারি কষ্ট লাগছে, কিন্তু আপনি যে আমার একমাত্র ভরসা! বিদায় মাকার আলেক্সেয়েভিচ, আমার কথা মনে রাখবেন, ভগবান যেন আপনাকে সাফল্য দেন!

ভ. দ.

৪ঠা আগস্ট

আমার আদরের ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

অপ্রত্যাশিত এইসব আঘাত আমায় কাঁপিয়ে দিচ্ছে! ভয়ংকর এইসব বিপদ দমিয়ে দিচ্ছে আমায়! তাছাড়া, হরেক রকমের এইসব তোষামুদে বুড়ো হাবড়া বদমাইসদের দঙ্গলটা আপনাকে যে রোগশয্যায় পাঠাতে চাইছে রানী আমার। এসব ছাড়াও এই তোষামুদেরা যে আমাকেও খতম করে দিতে চায়। ভগবানের দিব্যি, খতমই করে দেবে! আপনাকে সাহায্য না করার চেয়ে বরং মরাই আমার ভালো! আপনাকে সাহায্য করব না, সে তো আমার মরণ ভারেংকা, একেবারে খাঁটি, সত্যিকারের মরণ। আর যদি সাহায্য করি, তাহলেও তো আপনি পাখির মতো উড়ে পালিয়ে যাবেন বাসাটি ছেড়ে, সে বাসায় হিংস্র প্যাঁচার হানা হয়েছে বলে। এইটেই আমায় দগ্ধে মারছে গো! কিন্তু আপনি ভারেংকা, আপনি এমন নিষ্ঠুর হলেন কী করে, আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করলেন? লোকে আপনাকে যন্ত্রণা কষ্ট দিচ্ছে, অপমান করছে, কষ্ট হচ্ছে আপনার, ছোট্ট পাখিটি আমার, তার ওপর আবার এই বলে দুঃখু করেছেন যে আমায় বিব্রত করতে হচ্ছে আপনাকে, তার ওপর আবার আশ্বাস দিতে গেছেন যে ঋণের টাকাটা রোজগার করবেন। তার মানে, সত্যি বলতে কি, সময়মতো আমায় উদ্ধার করার জন্যে আপনার পলকা স্বাস্থ্যটি আপনি খোয়াবেন। কী সব কথা বলছেন একবার ভেবে দেখুন ভারেংকা! কেন আপনাকে সেলাই করতে

হবে, কেন খেটে খেটে আপনার ছোটো মাথাটিকে দুশ্চিন্তায় কষ্ট দিয়ে মিষ্টি চোখদুটিকে নষ্ট করে স্বাস্থ্যটি খোয়াবেন? আহ্, ভারেঙ্কা, ভারেঙ্কা আমার! আমি কোনো কর্মের নই, আমি নিজেই জানি যে আমি কোনো কর্মের নই, তবু এমন কিছু করব যাতে কাজে লাগি! সবকিছু কাটিয়ে উঠব আমি। না, বাড়তি কাজ নিজেই আমি জোগাড় করব। নকল করে দেব নানান লেখকদের যত লেখা, নিজেই আমি ওঁদের কাছে গিয়ে মিনতি করে বলব, কিছু কাজ দিন। কেননা ভালো যার হাতের লেখা এমন লোক ওঁদের দরকার, আমি জানি, দরকার। খেটে খেটে জেরবার হয়ে যেতে আপনাকে দেব না। ঐ সর্বনাশা সংকল্পটি আপনাকে পালন করতে দেব না আমি। টাকাটা আমি ধার করব রানী আমার। বরং মরব, তবু ধার করব! লিখেছেন, চড়া সুদ দেখে যেন পেছিয়ে না যাই। পেছব না গো, পেছব না, কিছুতেই আমি এখন পেছব না। ব্যাঙ্ক নোটের চল্লিশ রুবল আমি চাইব। টাকাটা তো খুব বেশি নয় ভারেঙ্কা, আপনি কী মনে করেন? আমার কথা শুনেই কি ওরা আমায় বিশ্বাস করে চল্লিশ রুবল দেবে না? মানে বলতে চাইছি কি, প্রথম দৃষ্টিতেই লোকের মনে বিশ্বাস আস্থা জন্মাতে আমি কি পারি বলে আপনি মনে করেন? আমার চেহারা দেখে, প্রথম দৃষ্টিতে একটা অনুকূল মনোভাব ওদের হতে পারে কি? আমার চেহারাটা একবার মনে মনে ভেবে নিন, রানী আমার, লোককে প্রভাবিত করা আমার দ্বারা সম্ভব তো? আপনার কী মনে হয়? এমন ভয় করছে, মনমরা লাগছে — সত্যিই বলছি মনমরা! ঐ চল্লিশ রুবল থেকে পঁচিশ রুবল আমি রেখে দেব আপনার জন্যে ভারেঙ্কা, দু'রুবল দেব বাড়িউলীকে, বাকিটা থাকবে আমার নিজের খরচার বাবত। কী জানেন, বাড়িউলীকে অবশ্য আরো বেশি দেওয়া উচিত, সত্যি বলতে কি, সেটা দরকারই। কিন্তু ব্যাপারটা ভেবে দেখুন ভারেঙ্কা, আমার প্রয়োজনগুলোর ফর্দটা দেখুন, তাহলে বুঝবেন, কিছুতেই আর বেশি দেওয়া যায় না। তাই সেকথা বলে আর লাভ কী, ওকথা তোলারই দরকার নেই। চাঁদির এক রুবলে কিনব নতুন এক জোড়া বুট। পুরনো বুট জোড়ায় কাল আপিস পর্যন্ত পেঁছনো যাবে কিনা জানি না। গলাবন্ধ রুমাল একটা হলেও ভালো হয়, কেননা পুরনোটার শিগগিরই এক বছর পুরবে। কিন্তু আপনি যখন বলেছেন যে আপনার পুরনো এপ্রন থেকে গলাবন্ধ রুমাল শুধু নয়, একটা

ডিকিও করে দেবেন, তখন গলাবন্ধটার জন্যে আর ভাবছি না। তাহলে জুতো আর রুমালের ব্যবস্থা হল। এবার বোতামগুলো গো, ভারেঙ্কা? আপনি নিশ্চয় মানবেন যে বোতাম ছাড়া চলে না। আমার জ্যাকেটের এক পাশের প্রায় অর্ধেক বোতাম গেছে! বুক দুরদুর করে যখন ভাবি, হুজুর এরকম অপরিচ্ছন্নতা দেখে বলবেন — যাক গে কী আর বলবেন! কী বলবেন তা অবশ্য শোনা হবে না গো, কেননা মারা যাব, ওইখানেই আমার মৃত্যু হবে, সত্যিই লজ্জা ভাবনায় আমি মরে যাব ঝট করে! ওহ্ ভারেঙ্কা! হ্যাঁ তাহলে আমার সমস্ত দরকার-পাতির জন্যে রইল তিন রুবল, সেটা সংসার-খরচা আর আধ-পাউন্ড তামাকের জন্যে। কেননা তামাক ছাড়া আমি পারি না ভারেঙ্কা, অথচ আজ ন'দিন পাইপ মুখে তুলি নি। সত্যি বললে, তামাকটা অবশ্য আপনাকে কিছু না জানিয়ে কিনে নিতে পারতাম, কিন্তু সে কাজ বড়ো লজ্জার। অমন একটা বিপদে পড়েছেন, আপনার শেষ কড়িটিও যেতে বসেছে, আর আমি কিনা মেতে আছি বিলাস ব্যসনে। এসব কথা আপনাকে লিখছি যাতে বিবেকের দংশন সইতে না হয়, ভারেঙ্কা। অকপটে আপনার কাছে স্বীকার করছি ভারেঙ্কা, আমি চরম দুরবস্থায় পড়েছি। মানে, এরকম হাল আমার আগে আর কখনো হয় নি। বাড়িউলী আমাকে ঘেন্না করছে, এতটুকু সম্মান কেউ দেখায় না আমাকে। ভয়ানক রকম অভাব, দেনাতেও জড়িয়েছি। আপিসে সহকর্মীদের কাছ থেকে আগেও ভালো কিছু জোটে নি, এখন সেখানকার অবস্থার কথা আর কী বলব। লুকিয়ে রাখি, সকলের কাছ থেকে অবস্থাটা লুকিয়ে রাখি প্রাণপণে; নিজেকেই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করি। আপিসে ঢুকি পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে, সকলের কাছ থেকে দূরে। খুলে বলার মতো মনোবল পাই শুধু আপনার কাছে... কিন্তু যদি টাকাটা না দেন! না, না, ভারেঙ্কা, ওকথা বরং না ভাবাই ভালো। আগে থেকে এসব চিন্তায় মনকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? একথা বলছি আপনাকে সাবধান করার জন্যে, ও নিয়ে আপনি যেন না ভাবেন, দুশ্চিন্তায় কষ্ট পাবেন না। হা ভগবান, তাহলে কী আপনার হবে তখন? বাসা বদল করা আপনার হবে না, এবং আপনার কাছাকাছিই আমি থাকব তা সত্যি — কিন্তু না, ওখানে আমি আর ফিরব না তখন, স্রেফ গলে-পচে মরে যাব কোথাও। এই দেখুন, আপনাকে এসব লিখলাম অথচ দাড়িটা কামিয়ে নেওয়া উচিত। তাতে আমাকে আর একটু

ভদ্রগোছের দেখাবে, আর জানেনই তো, ভদ্রগোছের চেহারা হলে সর্বদাই কাজ হয়। যাক, ভগবান আশীর্বাদ করুন! ঈশ্বরের নাম নিয়ে বেরুতে হবে এবার!

ম. দেভুশকিন

৫ই আগস্ট

পরম অমায়িক মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

সত্যি, আপনি অন্তত হতাশ হবেন না! এমনিতেই যথেষ্ট মুশকিলে পড়েছি আমরা! রুপোর সিক্কায় তিরিশ কোপেক পাঠালাম। বেশি পারলাম না। অন্তত কালকের দিনটা চালাবার জন্যে যা নিতান্ত না হলে নয়, তাই কিছু কিনে নেবেন। আমাদের হাতে প্রায় কিছুই নেই। কাল কী হবে জানি না। খুবই খারাপ মাকার আলেক্সেয়েভিচ; তাই বলে নিজে মন খারাপ করবেন না! হল না, তা কী আর করা যাবে! ফেদোরার ধারণা, আমরা এখানেই থেকে গেলে সর্বনাশ কিছু হবে না। অন্য জায়গায় চলে গেলেও ইচ্ছে করলেই তো ওরা আমাদের খুঁজে বার করতে পারবে। শুধু এখানে থেকে যাওয়াটা কেমন ভালো ঠেকছে না। এত মন খারাপ না লাগলে আরো কিছু লিখতাম আপনাকে।

কী অদ্ভুত চরিত্র আপনার, মাকার আলেক্সেয়েভিচ! একটুকুতেই কাতর হয়ে পড়েন আপনি। এমন করলে তো কখনোই আপনি সুখী হতে পারবেন না। আপনার চিঠিগুলো মন দিয়ে পড়ে দেখছি, প্রতিটি চিঠিতেই নিজের চেয়েও আপনার বেশি দুশ্চিন্তা আমাকে নিয়ে। সবাই অবিশ্যি বলবে যে আপনার মনটা নরম। আমি বলি খুবই নরম। বন্ধুর মতো কিছু সদুপদেশ দিই মাকার আলেক্সেয়েভিচ। আমার জন্যে আপনি যা যা করেছেন তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, সাতিশয় কৃতজ্ঞ। সেটা আমি খুবই অনুভব করি। তাহলে ভেবে দেখুন, আমাদের সবকিছু বিপদ-আপদ যার অনিচ্ছুক হেতু তো আমিই, তার পরেও যখন দেখি যে এখনো আপনি আমার সুখে সুখী, আমার দুঃখে দুঃখী, কেবল আমার প্রীতির জন্যেই বেঁচে থাকতে চান, তখন কীরকম লাগে আমার। অন্যের সবকিছুই যদি

অমন মর্মে বেঁধে — সবকিছুতেই যদি সমবেদনা জাগে, তাহলে তো সত্যি, অসুখী হবার কারণ থাকবে বৈকি। আজ আপিসের কাজের পর যখন আমার কাছে এসেছিলেন তখন আপনার মূর্তি দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভারি ফ্যাকাশে, সন্ত্রস্ত, হতাশ লাগছিল আপনাকে — যেন আপনি নন। আর সবই এইজন্যে যে আপনি পারেন নি তা বলার সাহস হচ্ছিল না আপনার, ভয় পেয়েছিলেন আমি ভেঙে পড়ব। তারপর যখন দেখলেন আমি প্রায় হেসে উঠতে যাচ্ছি, তখন বুকের বোঝা সব নেমে গেল আপনার। সত্যি মাকার আলেক্সেয়েভিচ, দুশ্চিন্তা করবেন না, হতাশ হবেন না। মিনতি করি, অনুরোধ করি মাথা ঠিক রাখুন। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে, ভালোর দিকেই যাবে সবকিছু! নইলে, সর্বদা মন খারাপ করে, অন্যের দুঃখে ব্যথিত হয়ে থাকলে জীবন তো আপনার দুঃসহ হয়ে উঠবে। বিদায় বন্ধু, মিনতি করেই বলছি, বড়ো বেশি অস্থির হবেন না আমার জন্যে।

ভ. দ.

৫ই আগস্ট

আদরের ভারেঙ্কা আমার!

বেশ ভালো কথা তাহলে, ভালো কথা গো! বলছেন, টাকাটা জোগাড় করতে না পারলেও সেটা এমন কিছু ভয়ানক ব্যাপার নয়। তা বেশ, আমি শান্ত হলাম, আপনার ব্যাপারে সুখী হওয়া গেল! আমাকে — এই বুড়ো মানুষটাকে ছেড়ে যাবেন না, ওই বাসাতেই থাকবেন ভেবে আনন্দই হচ্ছে। সত্যি যদি সব বলতেই হয় তো বলব, আপনার চিঠিখানিতে আমার সম্পর্কে যেসব ভালো ভালো কথা লিখেছেন, আমার হৃদয়াবেগের যে উপযুক্ত প্রশংসা করেছেন তাতে আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছে। অহংকার হয়েছে বলে একথা বলছি না, বলছি এই দেখে যে আপনি আমায় কতখানি ভালোবাসেন, আমার হৃদয় নিয়ে অমন দুর্ভাবনা করেন। তা বেশ, কিন্তু আমার হৃদয়ের কথা বলে এখন লাভ কি? হৃদয়টা তো নেহাৎ হৃদয়ই; তবে এই যে আপনি বলছেন গো, আমি যেন দুর্বলচিত্ত না হয়ে পড়ি।

হ্যাঁ, ভারেঙ্কা সত্যি কথা, আমি নিজেই বলব যে ওই দুর্বলচিত্ততার কোনো দরকার নেই। তাহলে, লক্ষ্মী আমার, ভেবে দেখুন কী বুট পরে কাল আপিসে যাব আমি! এই হল গো ব্যাপার। এইরকম চিন্তা-ভাবনা যে মানুষকে শেষ করে দিতে পারে, একেবারে শেষ। কিন্তু বড়ো কথাটা কী জানেন গো, আমার নিজের জন্যে মনঃকষ্টে ভুগছি, নিজের জন্যে দুঃখ হচ্ছে তা নয়। আমার নিজের দিক থেকে কিছুই এসে যায় না: ভয়ঙ্কর শীতের মধ্যেও বিনা ওভার কোটে খালি পায়ে হাঁটতে হলেও আমি মেনে নেব, সব সয়ে যাব। আমার কিছু এসে যায় না। আমি তো একটা নগণ্য মামুলী লোক — কিন্তু লোকে কী বলবে? বিনা ওভার কোটে রাস্তায় হাঁটছি দেখলে কী বলবে আমার শত্রুরা, ওইসব কটুভাষীরা? ওভার কোট পরে বেরই তো লোকেদের জন্যেই, বুটও পরি তাদের জন্যে। এই অবস্থায় বুঝেছেন ভারেঙ্কা, বুট জোড়া দরকার আমার মান-সম্মান, সুনাম রক্ষার জন্যে। ছেঁড়া বুটে ওদুটোই খোয়া যাবে। বিশ্বাস করুন গো, আমার বহু বছরের অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস রাখুন। ঐসব কলমবাজ আর কালি-ছিটিয়েদের কথায় কান না দিয়ে এই বুড়ো মানুষটা, দুনিয়াটা আর দুনিয়ার মানুষগুলোকে যে জানে তার কথা শুনুন।

কিন্তু আজ প্রধানত যা যা হয়েছিল, কী সইতে হয়েছে, আপনাকে তো সব খুঁটিয়ে বলি নি। একটা সকালে আমায় যা সইতে হয়েছে, যতটা মনঃকষ্ট গেছে, তা অন্য লোককে গোটা বছরেও সইতে হয় না। ঘটেছিল এই: সাতসকালে আমি বেরিয়েছিলাম যাতে ওকেও বাড়িতে পাওয়া যায়, আপিসেও দেরি না হয়। কী বৃষ্টি পড়ছিল আজ, চারিপাশ কাদা-কাদা! ওভার কোটের মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে হাঁটছি আর মনে মনে ভাবছি: 'হে ঈশ্বর, আমার পাপ ক্ষমা করে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করো।' পথে যেতে একটা গির্জা পড়ল। ক্রুশ করে আমার সমস্ত পাপের জন্যে অনুতাপ করলাম। কিন্তু মনে হল, পরমেশ্বরের সঙ্গে বোঝাবুঝি করে রাখাটা আমার পক্ষে অনুচিত। চিন্তায় ডুবে গিয়ে হেঁটেই চললাম, কিছুই চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, ঠাহর করলাম না পথঘাট। রাস্তাটা ফাঁকা, যাদের দেখা পাচ্ছিলাম তারাও সবাই ভারি ব্যস্তসমস্ত, রাগী রাগী, চিন্তাগ্রস্ত। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এত ভোরে এইরকম বাদলায় কে আর বেড়াতে বেরুবে! পথে পড়ল একদল তেলকালিমাখা মজুর। পাজিগুলো আমায়

ধাক্কা দিয়ে চলে গেল! ভয়-ভয় করল আমার, আতঙ্ক হল। টাকার কথা আর ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, লেগে যায় তো লেগে যাবে! ঠিক ভসক্রেসেনস্কি ব্রিজের কাছে খুলে এল জুতোর সোলটা, জানি না চলছিলাম কী করে। এমন সময় দেখা হবি তো হ একেবারে মুনাশি এর্মলায়েভের সঙ্গে। আমাকে দেখে ও থমকে দাঁড়াল, খাড়া হয়ে উঠল, দাঁড়িয়ে রইল, চেয়ে চেয়ে আমায় নজর করতে লাগল এমনভাবে যেন ভোদকার জন্যে পয়সা চাইছে। মনে মনে ভাবলাম: 'এহ্ ভায়া, ভোদকার জন্যে, কোথায় এখন ভোদকা!' শরীরটা আর টানতে পারছিলাম না, কিছুক্ষণ থেমে জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম যদি কোনো একটা কিছুতে মন বসানো যায়, একটু ফুর্তি পাওয়া, চাঙ্গা হবার মতো কিছু একটা। কিন্তু না, কোনো একটা কিছুতেও মন বসল না আমার, শুধু কাদায় এমন নোংরা হয়ে গেলাম যে নিজেরই লজ্জা হল। অবশেষে দূর থেকে চোখে পড়ল একটা হলুদ রঙের কাঠের বাড়ি, গম্বুজের মতো চিলেকোঠা একখানা। ভাবলাম: 'তাহলেই এইটেই, এমেলিয়ান ইভানোভিচ যা বলেছিল, এইটেই তাহলে মার্কভের বাড়ি।' (সেই মার্কভ, যে সুদে টাকা ধার দেয় গো।) নিজের কেমন জ্ঞানগম্যি ছিল না, জানতাম যে ওটা মার্কভেরই বাড়ি তবু একটা পাহারাওয়ালাকে জিগ্যেস করলাম, 'এটা কার বাড়ি হে?' ভারি বদমেজাজী পাহারাওয়ালা, জবাব দিলে দাঁত চেপে, অনিচ্ছায়, 'মার্কভের বাড়ি।' এইসব পাহারাওয়ালাদের দরদ বলে কিছু নেই। তবে পাহারাওয়ালা নিয়ে আমার কীই বা হবে? তবু, সবটা কিরকম বিস্বাদ, বিচ্ছিরি হয়ে গেল, মোট কথা, সবই একটার পিঠে আর একটা। সবকিছু থেকেই একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় নিজের অবস্থার সঙ্গে। সর্বদাই তাই হয়। বারবার তিনবার যাতায়াত করলাম বাড়িখানার সামনে দিয়ে, আর যত যাতায়াত করলাম ততই খারাপ লাগল, মনে হল, না, টাকা ও আমায় দেবে না! লোকটার তো আমি অপরিচিত, ব্যাপারটাও খুঁতখুঁতে, আমার মূর্তিখানা দিয়েও কাজ হবে না। ভাবলাম, যাক গে, কপালে যা আছে হোক! পরে যাতে আফশোস করতে না হয়, চেষ্টা করে দেখলে তো আর ফেলবে না! তাই আস্তে করে ফটকটি খুললাম। অমনি আরেক দুর্ভোগ: হতভাগা এক হাঁদা কুকুর আমার পেছনে লাগল, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ঘেউ-ঘেউ করে একশা করে ফেললে! ছোটোখাটো এইসব

বিছছিরি ঘটনাগুলোই একটা মানুষকে বেশ পাগলা করে দেয় গো, ভয় পাইয়ে দেয়, আগে থেকে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করে রেখেছি তা উবে যায়। মড়ার মতো ভয়ে ভয়ে বাড়িখানায় তো ঢুকলাম, আর অমনি কি না গিয়ে পড়লাম আরেক দুর্ভোগে। চৌকাঠ পেরোতেই ধাক্কা খেলাম এক মাগীর সঙ্গে — আবছা আলোয় ওকে দেখতেই পাই নি, মেয়েটা ভাঁড়ে দুধ ঢালছিল। দুধ সব পড়ে গেল, কী তার চিল্লানি আর তরপানি! বলে, 'কোথায় তুমি সেঁধোচ্ছ বাছাধন, কী চাই তোমার এখানে!' খামোকা কাঁদুনি জুড়লে! একথা লিখছি ভারেঙ্কা, কেননা এইরকম অবস্থায় এই ঘটে আমার কপালে চিরকাল। তার মানে এই আমার কপালের লিখন: সর্বদাই কোনো একটা ব্যাপারে আমি জড়িয়ে পড়বই। হৈচৈ-এর ফলে অকুস্থলে বাড়িউলী এসে হাজির, জাতে ও ফিন, দেখতে একেবারে রাক্ষুসী বুড়ি। সরাসরি ওকে জিগ্যেস করলাম, 'মার্কভ ওখানে থাকে কিনা?' বলে দিলে, থাকে না। তবে দাঁড়িয়ে রইল ভালো করে চেয়ে দেখল আমায়। 'ওর কাছে আপনার কী দরকার?' আমি বুঝিয়ে বললাম যে, এই এই ব্যাপার, এমেলিয়ান ইভানোভিচ ইত্যাদির কথা। বললাম কাজ আছে। বুড়ি তখন তার মেয়েকে ডাকলে। মেয়েটা বয়স্কা, ঢ্যাঙা মতো, খালি পা। বললে, 'বাবাকে ডেকে দে, ভাড়াটেদের ওখানে ওপরে আছে।' আর আমাকে বললে, 'ভেতরে আসুন।' ঢুকলাম। ঘরখানা মন্দ নয়। দেয়ালে ছবি টাঙানো — ছবিগুলি সবই কী সব জেনারেলের। সোফা আছে, একটা গোল টেবিল, জানলায় মিগ্‌নিয়োনেত আর বালজাম ফুলের টব। কেবলি ভাবছিলাম, সময় থাকতেই কেটে পড়ব নাকি? সত্যি, সত্যি ভারেঙ্কা, পালাতে চাইছিলাম! ঠিকই করে ফেলেছিলাম বরং পরদিন আসব — আবহাওয়াটা হয়ত তখন ভালো থাকবে, কিছু অপেক্ষা করব, আজ কেটে পড়ি, দুধ উল্টে পড়েছে, দেয়ালে জেনারেলের ছবিগুলোর চেহারা ভারি রাগী রাগী... দরজার দিকে এগিয়েছি ঠিক এমন সময় ও এল। এমনি সাধারণ পাকাচুল একটা বুড়ো, ধূর্ত-ধূর্ত চোখ, গায়ে একটা তেলচিটে ড্রেসিং গাউন, কোমরের কাছে একটা রশি দিয়ে বাঁধা। কী চাই, কেন, এসব জিগ্যেস করায় এমেলিয়ান ইভানোভিচ, চল্লিশ রুবল ইত্যাদি সবকথা বলতে শুরু করেছিলাম, শেষ আর করা হল না। ওর চোখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম, ভেস্তে গেছে। বললে, 'নেই, কাজ তাতে কী হল, টাকা আমার কাছে নেই।

তাছাড়া জামীন বন্ধক কী আছে আপনার?' বুঝিয়ে বললাম যে জামীন বন্ধক দেবার মতো কিছু নেই কিন্তু ফের এমেলিয়ান ইভানোভিচের কথা বললাম এবং ফের বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে টাকাটার খুবই জরুরি দরকার। ও বললে, 'এর সঙ্গে এমেলিয়ান ইভানোভিচের কী সম্পর্ক? টাকা আমার নেই।' তা তো থাকবেই না, আমি ভাবলাম। আগে থেকেই তো তা আমার জানা, টের পেয়েছিলাম। ওহ্‌ ভারেংকা, এর চেয়ে ধরণী দ্বিধা হয়ে আমায় গ্রাস করলেই বরং ভালো হত! পাদুটো আমার এমন ঠান্ডা যেন পাথর, কাঁপুনি নামছে শিরদাঁড়া বেয়ে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে, ও আমার দিকে তাকিয়ে — শুধু মুখ ফুটে যেন বলছে না, 'বাপু হে ভাগো, এখানে তোমার করার কিছু নেই!' অন্য কোনো ক্ষেত্রে এরকম হলে আমি লজ্জায় মরে যেতাম। 'তা টাকাটা আপনার কেন দরকার?' (ও একেবারে এই কথাই জিগ্যেস করে বসল গো!) চুপ করে দাঁড়িয়ে না থেকে মুখ খোলার উপক্রম করলাম। কিন্তু ও শুনতেই চাইল না। বললে, 'না, টাকা নেই, থাকলে সানন্দেই দিতাম।' কিন্তু আমি খুব ধরাধরি করতে লাগলাম, বললাম আমি তো সামান্যই চাইছি, বললাম টাকাটা ঠিক সময়েই শোধ দেব, এমনকি সময় হবার আগেই শোধ দিয়ে দেব, যে সুদ ও চাইবে ভগবানের দিব্যি সেই সুদই দেব। সেসময় আমি শুধু আপনার কথা ভাবছিলাম গো, আপনার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন, আমায় যে আধ-রুবলটা দিয়েছেন, তার কথা। ও বললে, 'না। সুদে কী হবে, জামীন বন্ধক থাকলে নয় হত! টাকা আমার নেই। ভগবানের দিব্যি নেই, থাকলে সানন্দেই দিতাম।' ভগবানের দিব্যি! ডাকাত কোথাকার!

কেমন করে যে বাড়ি থেকে বেরুলাম, ভিবর্গ্স্কায়া পাড়া আর ভসক্রেসেনস্কি ব্রিজ পার হলাম সত্যি মনেই নেই আমার। জেরবার হয়ে পড়েছিলাম ভয়ানক, ঠান্ডায় জমে আপিস পেঁছিতে পারলাম দশটার সময়। পোশাকটার ময়লা-টয়লা, একটু পরিষ্কার করে নেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দারোয়ান স্নেগিরিওভ বললে চলবে না। বুরুশটা আমি নষ্ট করে ফেলব, ওটা আপিসেরই সম্পত্তি কিনা। এখন ভারেংকা, ময়লা সাফ করা ন্যাকড়ার চেয়েও খারাপ ব্যবহার করছে ওরা আমার সঙ্গে। কী আমাকে মারছে জানেন ভারেংকা? টাকা নয়, মারছে এই সাংসারিক উদ্বেগ, এইসব ফিসফাস, হাসি, ঠাট্টা। দৈবাৎ যদি এ সবকিছু হুজুরের কানে যায়, আমার

সম্পর্কে কী ভাববেন তাহলে? ওহ্‌ ভারেঙ্কা, সুদিন সব শেষ হয়ে গেছে আমার! আপনার সমস্ত চিঠিগুলো আজ ফের পড়ে দেখলাম; ভারি মন খারাপ হয়ে যায়। বিদায় ভারেঙ্কা! ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন!

ম. দেভুশকিন

পুঃ, আমার দুর্ভোগের কথা আমি একটু মজা করে বর্ণনা করব বলে স্থির করেছিলাম। কিন্তু কপাল খারাপ, দেখা যাচ্ছে মজা-টজা আমার আসে না। ভেবেছিলাম আপনি একটু আনন্দ পাবেন। আপনার সঙ্গে দেখা করব গো, নিশ্চয় দেখা করতে যাব, কালই যাব।

১১ই আগস্ট

আদরের ভারভারা আলেক্সেয়েভনা, মধুময়ী বন্ধু আমার!

আমার দফা শেষ! আমাদের দুজনেরই দফা একেবারে রফা! সব ধ্বংস হয়েছে আমার — আমার মান, আমার আত্মসম্মান সবেতেই কালি পড়েছে! আমার সর্বনাশ হয়েছে এবং আপনিও মরেছেন গো, আমার সঙ্গে আপনারও সর্বনাশ ঘটেছে। আমিই আপনাকে সর্বনাশে ঠেলে দিয়েছি! ওরা আমায় জ্বালাতন করে মারছে, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে আমায় নিয়ে। আর বাড়িউলী তো স্রেফ গালাগাল দিতে শুরু করেছে। আজ সে চেঁচামেচি করেছে, ধমকে গালাগালি দিয়েছে, জঞ্জালেরও অধম বানিয়ে ছেড়েছে আমায়। আর সন্ধ্যায় রাতাজিয়ায়েভের ওখানে কে একজন আপনাকে লেখা আমার চিঠির একটা খসড়া জোরে জোরে পড়ে শুনিয়েছে — ওটা আমার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল অজান্তে। কী ঠাট্টাই না ওরা করছে, কী না বলছে আমাদের নিয়ে, বেইমানগুলো হেসে আর বাঁচে না। রাতাজিয়ায়েভের কাছে গিয়ে আমি তাঁকে বিশ্বাসঘাতক বলে ধিক্কার দিয়ে এসেছি, বলেছি উনি বেইমান। কিন্তু উনি উল্টে আমাকেই শুনিয়ে দিয়েছেন আমি নিজেই বেইমান, ওদের কাছে আমি চেপে গেছি, যতসব মন জয়ের নাগর আমি। এখন সকলে আমায় 'নাগর' বলে ডাকে, যেন আমার অন্য নাম নেই। শুনছেন গো, শুনছেন, এখন ওরা সব জেনে গেছে, সব ওদের জানা, আপনার সম্পর্কেও,

সব ওরা জেনে ফেলেছে। কী আর বলি, ফালদোনি পর্যন্ত ওদের দলে ভিড়েছে, ওদের সঙ্গে একই রা। সসেজের দোকানে গিয়ে কিছু কিনে আনতে বলায় ও বললে, পারবে না, খুব ব্যস্ত। বললাম, 'এটা তোমার কর্তব্য।' ও বললে, 'না, কর্তব্য নয়, আমার কর্ত্রীকে আপনি ভাড়া দেন না, তাই আপনার ফরমাশ খাটতে আমি বাধ্য নই।' ওর কাছ থেকে, অশিক্ষিত একটা চাষার কাছ থেকে এ অপমান সইতে না পেরে ওকে বলেছিলাম, বুদ্ধু কোথাকার। আর ও কিনা বলে দিলে, যে বলে সেই বুদ্ধু! ভাবলাম ও প্রকৃতিস্থ নয় বলেই অমন রূঢ় কথা বলেছে। বললাম, 'মদ খেয়েছ তুমি, মাতাল, চাষা কোথাকার!' ও জবাব দিলে, 'আপনার পয়সায় তো খাই নি! খোয়ারি ভাঙার মতো এক ঢোক মদের পয়সাও তো আপনার নেই! কোন ভদ্রমহিলার কাছ থেকে দশ দশ কোপেক ভিক্ষে করে থাকেন?' এর ওপরে সে বলে দিলে, 'ভারি আমার ভদ্রলোক!' এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি ভারেঙ্কা! বেঁচে থাকতে লজ্জা করে গো! আমি যেন একটা অচ্ছুৎ; বিনা পাস্‌পোর্টের একটা হাঘরের চেয়েও অধম। কী দুর্ভোগ! দফা আমার শেষ ভারেঙ্কা! দফা শেষ, উদ্ধারের কোনো আশা নেই!

ম. দ.

১৩ই আগস্ট

পরম অমায়িক মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

আমাদের কেবল বিপদের উপর বিপদ, কী করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না! কী এখন হবে আপনার? আমার ওপরেও ভরসা কম। আজ ইস্ত্রিতে আমার বাঁ হাতটা ছ্যাঁকা খেয়েছে। অসাবধানে ফসকে গিয়ে জখম আর ছ্যাঁকা সব একসঙ্গে। কাজ করা এখন অসম্ভব, ফেদোরাও তিন দিন থেকে অসুখে। ভয়ানক দুর্ভাবনায় পড়েছি। চাঁদির খুচরোয় তিরিশ কোপেক পাঠালাম; এই আমাদের প্রায় শেষ সম্বল। ভগবান জানেন আপনার অভাবে সাহায্য করার কী ইচ্ছেই না আমার হয়। এত কষ্ট হচ্ছে যে কান্না পাচ্ছে! বিদায় বন্ধু আমার! আজ যদি আমাদের এখানে আসেন, তাহলে অনেক সান্ত্বনা পাব।

ভ. দ.

মাকার আলেক্সেয়েভিচ! কী হয়েছে আপনার? ধর্মভয় কি সবই হারিয়েছেন? আমায় আপনি স্রেফ পাগল করে দিচ্ছেন। লজ্জা করে না আপনার, নিজেকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলছেন যে! নিজের মান-সম্মানের কথা একবার ভেবে দেখুন! আপনি সততাশীল, উদার, আত্মসম্মানী একজন লোক, কিন্তু আপনার কথা যদি সবার কানে যায় তাহলে? লজ্জায় মরে যেতে হবে আপনাকে! নাকি আপনার পাকা চুলের জন্যে মায়া হচ্ছে আপনার, ধর্মভয় রাখুন! ফেদোরা বলেছে, এখন আর সে আপনাকে সাহায্য করবে না। আমিও টাকা দেব না আপনাকে। আমাকে কোন অবস্থায় এনে ফেলেছেন মাকার আলেক্সেয়েভিচ! আপনি নিশ্চয় ভাবেন যে আপনার কদাচারে আমার কিছু এসে যায় না। জানেন না আপনার জন্যে কী সইতে হয় আমায়! আমাদের সিঁড়িতে পর্যন্ত যেতে পারি না — সবাই চেয়ে থাকে, আঙুল দেখায় আমার দিকে, কত সব ভয়ংকর যে কথা বলে। হ্যাঁ, সোজাসুজি বলে, 'একটা মাতালের সঙ্গে জুটেছ।' কিরকম যে লাগে শুনতে! আপনাকে যখন ওরা ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে আসে, তখন বাসিন্দারা ঘেন্না করে দেখায় আপনার দিকে, বলে, 'ঐ রে, কেরানিটাকে ধরাধরি করে নিয়ে এল আবার!' আপনার জন্যে ভয়ানক লজ্জা হচ্ছে আমার। ভগবানের দিব্যি, এখান থেকে উঠে যাব আমি। বরং কোথাও চাকরানির কাজ নেব, ধোপানির কাজ করব, কিন্তু এখানে আর নয়। লিখেছিলাম এসে দেখা করে যাবেন। কিন্তু এলেন না। তার মানে আমার অনুরোধ-উপরোধ, চোখের জলে কিছুই আপনার যায় আসে না মাকার আলেক্সেয়েভিচ! আর টাকাই বা পেলেন কোথায়? ভগবানের দোহাই, নিজেকে সামলে চলুন। নিজেকে যে ধ্বংস করে ফেলেছেন। খামোকা ধ্বংস করছেন নিজেকে! কী লজ্জার কথা, ঘেন্নার কথা! আপনার বাড়িউলী নাকি আপনাকে ঘরে ঢুকতে দিতেই চায় নি, বারান্দায় রাত কাটাতে হয়েছে। আমি সব জানি। একথা শুনে আমার কী যে কষ্ট হচ্ছিল যদি জানতেন! আমাদের এখানে চলে আসুন! এলে আনন্দ পাবেন। একসঙ্গে বসে বসে পড়ব আমরা, পুরনো দিনের কথা ভাবব। তীর্থযাত্রার গল্প শোনাবে ফেদোরা। ভগবানের দোহাই বন্ধু আমার, নিজেকে আর

আমাকে ধ্বংস করে ফেলবেন না। আমি বেঁচে আছি শুধু আপনার জন্যেই, আপনার জন্যেই এখানে থেকে গেছি। মাথা উঁচু করুন, দুঃখে-কষ্টে থাকুন শক্ত হয়ে, মনে রাখবেন গরিব হওয়া কিছু অপরাধ নয়। অত হতাশ হবার কী আছে? এসবই সাময়িক ব্যাপার! ভগবান করুন, সব কেটে যাবে। আপনাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে এখন। কুড়ি কোপেকি সিক্কা পাঠালাম একটা — তামাক কিংবা আপনার যা ইচ্ছে হয় কিনবেন, শুধু দোহাই, কুকর্মে খরচ করে বসবেন না। আসুন আমাদের কাছে, অবশ্য-অবশ্য আসবেন। আগের মতো হয়ত লজ্জা হবে আপনার, কিন্তু লজ্জা করবেন না, ওটা মিছে লজ্জা। সত্যি করেই অনুতাপ করতে পারলেই হয়। ঈশ্বরে ভরসা রাখুন, তিনি যা করবেন মঙ্গলের জন্যেই করবেন।

ভ. দ.

১৯শে আগস্ট

ভারভারা আলেক্সেয়েভনা, মধুময়ী আমার!

সত্যিই লজ্জিত, ভারেঙ্কা আমার, লজ্জায় মরে আছি। তবে এক্ষেত্রে এমনটা আর কী হল গো? মাঝে মধ্যে মনে একটু ফুর্তি আনব না কেন? তাতে করে আমার জুতোর সোলটার কথা মনেই হবে না, কেননা সোল হল একটা বাজে ব্যাপার, চিরকালই মামুলী, ইতর, নোংরা সোল হয়েই থাকবে। বুটও একটা বাজে ব্যাপার! গ্রীস দেশের জ্ঞানীগুণীরা পর্যন্ত বিনা বুটে চলে ফিরে বেড়াতেন, তাহলে অপদার্থ এইসব জিনিস নিয়ে আমরাই বা ব্যতিব্যস্ত হই কেন? সেক্ষেত্রে আমায় অপমান করার, ঘেন্না করার কী আছে? এহ্, লেখার মতো একটা বিষয় পেয়েছেন বটে! আর ফেদোরাকে বলে দেবেন যে ও হল গে একটি কুঁদুলে, ছটফটে, খাণ্ডারী মাগী — এবং তদুপরি হাঁদা, অকথ্য রকমের হাঁদা! আর আমার পাকা চুলের কথা যদি ধরি, তাহলে ও ব্যাপারে আপনি ভুল করেছেন গো, কেননা যা ভাবছেন মোটেই অত বুড়ো আমি নই। এমেল্যা আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছে। লিখেছেন, আপনি ভেঙে পড়েছেন, কেঁদেছেন। আমিও লিখি যে আমিও ভেঙে পড়েছিলাম, কেঁদেছিলাম। পরিশেষে, আপনার সর্ববিধ

স্বাস্থ্য আর মঙ্গল কামনা করি। আমার কথা যদি ধরি, তাহলে আমি সুস্থই আছি, মঙ্গলের মধ্যেই আছি এবং চিরকাল আপনার বন্ধু

মাকার দেভুশকিন

২১শে আগস্ট

করুণাময় মাননীয়া অমায়িক বন্ধু ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে, টের পাচ্ছি আপনার কাছে অপরাধ হয়েছে আমার, কিন্তু টের যে পাচ্ছি, কী লাভ তাতে, সে আপনি যাই বলুন না কেন। আমার ও কর্মটির আগেও সব টের পাচ্ছিলাম, কিন্তু ওই যে, মন দমে গেল, অপরাধের চেতনা সত্ত্বেও দমে গেল। আমি দুষ্ট লোক নই গো, হৃদয় আমার নির্দয় নয়। আর আপনার মনে ব্যথা দিতে হলে কমসে কম একটি রক্তপিপাসু বাঘ হওয়া দরকার, অথচ আমার হৃদয়টা কিন্তু মেষের মতো। আর আপনি তো জানেন রক্তপিপাসু হয়ে ওঠার দিকে আমার মোটেই ঝোঁক নেই। সুতরাং ভারেঙ্কা, ওরকম আচরণে দোষটা নিতান্ত আমার নয়, আমার হৃদয় বা চিন্তারও দোষ নেই। কার যে দোষ সেটা আমার জানা নেই! ব্যাপারটা ভারি আবছা গো! আমায় রুপোর খুচরোয় তিরিশ কোপেক পাঠিয়েছিলেন, পরে আরো কুড়ি কোপেক। আপনার মতো অনাথিনীর ওই পয়সাগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে মনটা আমার টনটন করে উঠছিল। নিজেরই আপনার হাত পুড়ে গেছে, শিগগিরই উপোস দিতে হবে, অথচ লিখে পাঠিয়েছেন আমি যেন তামাক কিনি। এ অবস্থায় কী করা উচিত হত আমার? নাকি বিবেকের বালাই না রেখে গরিব এক অনাথিনীর টাকা লুটছি ডাকাতের মতো! তখন ভারি মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল গো। মানে, প্রথমে চাই, না চাই মনে হল আমি একটা অপদার্থ, আমার বুটের সোলটার চেয়ে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ভালো। সুতরাং আমিও কিছু একটা কেষ্টবিষ্টু — নিজেকে এরকম গণ্য করা আমার কাছে মনে হল অশোভন। বরং উল্টো, নিজেকেই আমার মনে হল কেমন যেন অশোভন, কয়েকটা দিক দিয়ে এমনকি কদর্যই। নিজের কাছেই নিজের

আত্মসম্মান যেই হারাল, আমার যা কিছু সদ্‌গুণ এবং যোগ্যতা যেই নাকচ করে দিলাম, অমনি সব গেল, অমনি পতন ঘটল আমার, অনিবার্য পতন! এসবই হল ভাগ্যের লিখন, আমার দোষ ছিল না কিছু। প্রথমে আমি নিজেকে একটু তরতাজা করে নেবার জন্যে বাইরে বেরিয়েছিলাম, আর শুরু হল একটার পিঠে আর একটা। প্রকৃতিটা ভারি কাঁদো-কাঁদো, ঠাণ্ডা আবহাওয়া, বৃষ্টি, তার ওপর রাস্তায় দেখা হয়ে গেল এমেল্যার সঙ্গে — হায়, হায়, ভারেঙ্কা, লোকটার যা ছিল সবই বাঁধা দিয়ে বসেছে। সবই গেছে একই গহ্বরে, যখন দেখা হল তার দু'দিন থেকে এক মুঠোও মুখে তোলে নি। এখন সে বাঁধা দিতে চাইছে এমন একটা বস্তু যা বাঁধা দেওয়া যায় না, ওরকম বন্ধক হয় না। তা ভারেঙ্কা, আমার নিজের খাঁই থেকে তত নয়, মানবজাতির প্রতি সহানুভূতির বশেই সায় দিয়ে বসলাম। এই করেই পাপে জাড়ালাম গো। কী কান্নাই না আমরা কেঁদেছি দুজনে! মনে পড়ছিল আপনার কথা। লোকটা অতি ভালো, ভারি ভালো মানুষ সে — খুবই অনুভূতিপ্রবণ লোক। এসব অনুভূতি আমার আছে গো — আমার কপালে এইসব দুর্ঘট ঘটে, কারণ খুবই অনুভব করি এসব। আপনার কাছে আমার কত যে ঋণ তা আমার জানা আছে রানী আমার। আপনাকে জেনে প্রথমত আমি নিজেকেই আরো ভালোভাবে জেনেছি, আপনাকে ভালোবাসতে শুরু করেছি। তার আগে দেবী আমার, দুনিয়ায় আমি ছিলাম নিঃসঙ্গ, দুনিয়ায় যেন বেঁচে নয়, ঘুমিয়ে ছিলাম। সেসময় আমার শত্রুরা বলত, আমার চেহারাটা পর্যন্ত আগাগোড়া বিদঘুটে, আমায় দেখে তাদের ঘেন্না হত। তা আমারও ঘেন্না ধরে গেল নিজের ওপর। ওরা বলত, আমি হাঁদা, আমিও সত্যি সত্যিই নিজেকে ভাবতে লাগলাম হাঁদা। তারপর আপনি যখন দেখা দিলেন আমার সামনে, আমার অন্ধকার জীবন আলো করে তুললেন, আলো নিয়ে এলেন আমার মনে-প্রাণে, হৃদয়ে শান্তি পেলাম আমি, টের পেলাম অন্যের চেয়ে আমি হীন নই। শুধু এই ওপরকার পালিশটা নেই, চাকচিক্য নেই, কিন্তু হৃদয় আর চিন্তার দিক থেকে আমিও মানুষ। কিন্তু সেদিন মনে হচ্ছিল, আমি ভাগ্যতাড়িত, ভাগ্যের কাছে অবজ্ঞাত হয়ে নিজের মর্যাদারই কোনো মূল্য আমার নিজের কাছেই রইল না। দুর্ভাগ্যে হতাশ হয়ে মনোবল আমার গেল। তাই এখন যখন সবই জানলেন, তখন সাশ্রুনয়নে মিনতি করি, এ ঘটনা নিয়ে আর কৌতূহল

প্রকাশ করবেন না; কেননা বুক ভেঙে যাচ্ছে আমার, ভারি তিক্ত আর ভারাক্রান্ত লাগছে।

শ্রদ্ধা রইল ভারেঙ্কা, চিরকাল আপনার

বিশ্বস্ত মাকার দেভুশকিন

৩রা সেপ্টেম্বর

আগের চিঠিটা আমি শেষ করতে পারি নি মাকার আলেক্সেয়েভিচ, কেননা লিখতে ভারি কষ্ট হচ্ছিল। মাঝে মাঝে কেমন নিঃসঙ্গ থাকতে ইচ্ছে করে আমার, একা একা কষ্ট পেতে, খাঁ-খাঁ মন নিয়ে বসে থাকতে পারলে বাঁচি। এইরকম মুহূর্ত আমার ঘন ঘন ফিরে আসছে। আমার স্মৃতির মধ্যে কী যেন একটা আছে যা আমার কাছে দুর্বোধ্য, যা আমাকে এমন দুর্নিবার, এমন প্রবলভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যায় যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চারপাশের কোনো কিছু সম্পর্কে কোনো চেতনা থাকে না, বর্তমান সবকিছু ভুলে যাই। দুঃখেরই হোক, কি সুখেরই হোক ইদানীং এমন একটা অনুভূতি প্রায় হয়ই না যাতে অতীতের এবং সবচেয়ে বেশি করে আমার ছেলেবেলার, আমার সোনার ছেলেবেলার ওইধরনের দিনের কথা মনে না পড়ে। এইরকম মুহূর্তগুলোর পরে কিন্তু সর্বদাই ভারি কষ্ট হয় আমার। কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ি, স্বপ্নপ্রবণতায় আমায় কাহিল করে তোলে, আর স্বাস্থ্য তো এমনিতেই কেবলি খারাপ হয়ে চলছে।

কিন্তু আজকের সকালটা বেশ তাজা ঝকঝকে ঝরঝরে, এখানকার শরতে এমনটা খুব কমই দেখা যায়। এটা আমায় চাঙ্গা করে তুলেছে। মনটা খুশি লাগছে। শরৎ এসেছে তাহলে! গাঁয়ের শরৎকালটাকে কী ভালোই না বাসতাম! তখন আমি বাচ্চা, কিন্তু তখনই অনেক কিছু অনুভব করতে পারতাম আমি। শরতের সকালের চেয়ে সন্ধ্যেগুলোকে আমার ভালো লাগত বেশি। আমাদের বাড়ি থেকে দু'পা দূরে পাহাড়টার কাছে ছিল একটা দীঘি। এখনো যেন দীঘিটা চোখে ভাসছে। খুব চওড়া, ঝকঝকে, স্ফটিকের মতো নির্মল! সন্ধ্যেটা যদি শান্ত হত, তাহলে দীঘিটাও একেবারে চুপচাপ, তীরের গাছগুলো থেকে এতটুকুও মর্মর উঠত না, আয়নার মতো স্তব্ধ জল। কী তাজা! ঠাণ্ডা ঘাসের ডগায় ডগায় জমত শিশির

বিন্দু, পারের কুটিরগুলোয় ফুটে উঠত আলো, গরুর পাল ফিরত ঘরে। সেই সময় চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যেতাম আমার দীঘির কাছে, সবকিছু ভুলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, জলের কাছে জেলেদের ওখানে কী সব কুটোকাটার আঁটি জ্বলছে, আর জলের ওপর তার আলো ছুটে যাচ্ছে কত দূরে। তুহিন, নীল আকাশ, তার কিনারাগুলোয় লাল আগুনের ছোপ। ক্রমেই ফ্যাকাশে হয়ে যেত ছোপগুলো; চাঁদ উঠত। আর ভেজা বাতাস এমন ঝঙ্কৃত যে ত্রস্ত কোনো পাখির পাখার ঝাপট, হালকা হাওয়ায় নলখাগড়ার খসখসানি, জলে মাছের একটুখানি ছলাৎ করে ওঠা—শোনা যেত সবকিছু। তারপর নীল জলের ওপর শাদা ভাপ জেগে উঠত মিহি আর স্বচ্ছ। আঁধার হয়ে আসত দূরের সবকিছু, যেন তলিয়ে যেত কুয়াশায়। কিন্তু কাছের জিনিসগুলো সব যেন র‍্যাঁদা চালানো, সুস্পষ্ট, ছেনি দিয়ে খোদাই করা—নৌকোটা, জলের কিনারাটা, চরগুলো; অথবা পারের কাছেই পড়ে থাকা, ফেলে দেওয়া একটা পিপে, একটুখানি দুলছে জলে, কিংবা নলখাগড়ার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে হলদে পাতার একটা খেংড়া-কাটি শাখা। পিছিয়ে পড়া একটা গাংচিল ঝটপটিয়ে হয়ত ঠান্ডা জলের মধ্যে ডুব দিয়ে উড়ে গেল, ফের ঝটপটিয়ে অদৃশ্য হল কুয়াশায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম, আর শুনতাম আর অপূর্ব লাগত, ভারি ভালো লাগত আমার! তখন আমি নেহাৎ বাচ্চা, ছেলেমানুষ!..

সত্যি শরৎ ভারি ভালো লাগত আমার, বিশেষ করে হেমন্ত, যখন ফসল কেটে ঘরে তোলা হয়েছে, সব কাজ সারা, শুরু হচ্ছে গাঁয়ের কুটিরে কুটিরে ছোকরা-ছুকরিদের সাঁঝবেলাকার আড্ডা, সবাই রয়েছে শীতের অপেক্ষায়। তখন সবকিছুই হয়ে উঠত বিষণ্ণ, মেঘে ঢাকা আকাশে ভ্রূকুটি। ন্যাড়া বনভূমির ধারে হাঁটা পথে ঘন হয়ে বিছিয়ে থাকত শুধু হলুদ পাতা—সে বন ক্রমেই নীলচে আর কালো হয়ে উঠত, বিশেষ করে সন্ধ্যের দিকে, যখন স্যাঁতসেঁতে কুয়াশা নামত, কুয়াশার ভেতর থেকে গাছগুলো ঝলক দিত দৈত্যের মতো, কদাকার, ভয়াবহ এক একটা প্রেতের মতো; মাঝে মাঝে বেড়াতে বেরিয়ে দেরি হয়ে যেত, অন্যদের থেকে কখন পিছিয়ে পড়তাম। একলা একলা বাড়ি ছুটতাম, গা ছমছম করত, পাতার মতো থরথরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভাবতাম, এই বুঝি একটা বিকটাকার মুখ গাছের কোটর থেকে আমার দিকে তাকাবে; ওদিকে বনের মধ্যে দিয়ে বয়ে

যেত বাতাস, প্যাঁকাটি ডালপালা থেকে এক রাশ পাতা ঝরিয়ে উড়িয়ে শন শন আওয়াজ তুলত, করুণ স্বরে গোঙাত, ঘূর্ণি তুলত। তার পেছু পেছু আকাশ আঁধার করে কান ফাটা ডাক ডেকে লম্বা ঝাঁক বেঁধে ফিরত পাখিরা। ভারি ভয় লাগত, যেন শুনতে পেতাম কে যেন ফিসফিস করে বলছে, 'পালা বাছা, দৌড়ে পালা। এখুনি ভারি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে এখানটা; পালা, পালা!' আর ভয় পেয়ে আমিও দৌড়তাম একেবারে রুদ্ধশ্বাসে। হাঁসফাঁস করে যখন বাড়ি পৌঁছতাম সেখানে তখন সবকিছুই ভারি হাসিখুশি, হৈচৈ। কড়াইশুঁটি আর পোস্ত-দানার খোসা ছাড়ানো ছিল আমাদের বাচ্চাদের কাজ, চুল্লিতে ফট ফট শব্দ করে পুড়ত ভেজা কাঠ, আর সস্নেহে মা চেয়ে চেয়ে দেখতেন আমাদের ফুর্তি করে করা কাজ, আর বুড়ি ধাই-মা উলিয়ানা আমাদের সেকালের গল্প বলত নয়ত শোনাত ডান কি প্রেতের ভয়াবহ কাহিনী। কাছাকাছি ঘন হয়ে আসতাম আমরা, সখিরা, সবার মুখে হাসি। তারপর হঠাৎ চুপ করে যেতাম সবাই—চুপ, কী একটা আওয়াজ, কে যেন দরজা ধাক্কা দিল না? কিন্তু না, বুড়ি ফ্রলোভনার চরকার শব্দ ওটা। তারপর কি কলরোলই না উঠত হাসির! কিন্তু রাত্রে আর ঘুম আসত না ভয়ে, কী ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখতাম। মাঝ রাত্রে চমকে জেগে উঠে নড়াচড়া করতেও সাহস হত না—লেপের তলে কেঁপে কেঁপে শুয়ে থাকতাম সকাল পর্যন্ত। সকালে উঠতাম একেবারে ফুলের মতো তাজা। জানলা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, মাঠঘাট ইতিমধ্যেই শীতের কবলে পড়েছে, নগ্ন ডালপালায় লেগে আছে হেমন্তের হিমানী। বরফের পাতলা চাদরে ঢাকা পড়ে ধুধু করছে দীঘি, শাদা ভাপ উঠছে, আর খুশির কাকলী তুলেছে পাখিরা। চারিদিকে জ্বলজ্বলে রোদ, তাতে দীঘির ওপরকার পাতলা বরফ চৌচির হয়ে যেত কাচের মতো। সে এক জ্বলজ্বলে ঝকমকে হাসিখুশি দুনিয়া! ফের আগুন শোঁ শোঁ করত চুল্লিতে, সামোভার ঘিরে আমরা বসতাম, আর আমাদের কালো কুকুরটা পল্কান—রাত্রের ঠান্ডার দরুন তখনো কাঁপত আর জানলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে লেজ নাড়ত খুশিতে। জানলার সামনে দিয়ে জ্বালানি-কাঠের জন্যে চাঙ্গা ঘোড়া যুতে বনের দিকে রওনা দিত হয়ত কোনো চাষী। সবাই হাসিখুশি, সুখী!.. ওহ্ কী আনন্দেই না কেটেছে আমার ছেলেবেলা!..

সেসব কথা মনে করে এখন কাঁদি বাচ্চার মতো। অতীতটা কী জীবন্ত,

কী জ্বলজ্বলে হয়ে উঠেছিল আমার কাছে আর বর্তমানটা কী মিটমিটে, কী অন্ধকার!.. কবে এর শেষ হবে, কবে চুকবে এসব? জানেন, কেমন যেন মনে হয়, কেমন যেন বিশ্বাস হয়েছে এই শরতের মধ্যেই মরণ হবে আমার। খুবই অসুস্থ আমি। মরণের কথা প্রায়ই ভাবি, কিন্তু এখানে মরতে ইচ্ছে করে না আমার, ইচ্ছে করে না এখানকার মাটিতে কবর নিই। গত বসন্তে যেমন হয়েছিল, তেমনি ধারা হয়ত আবার শয্যা নিতে হবে আমাকে। অসুখ থেকে আসলে আমি এখনো তো সেরে উঠতে পারি নি। যেমন এই এখুনি ভারি কষ্ট হচ্ছে আমার। সারা দিন ফেদোরা কোথায় যেন বাইরে আর আমি একেবারে একা। কিছু দিন থেকে একা থাকতে ভয় করে, কেমন যেন মনে হয় ঘরে আরো একজন কে আছে, কেউ যেন আমার সঙ্গে কথা কইছে—এটা হয় বিশেষ করে যখন কোনো একটা ভাবনায় ডুবে থেকে হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠি আর ভয় লাগে আমার। দীর্ঘ চিঠিখানা লিখলাম সেইজন্যেই। লিখতে শুরু করলে ভয় কেটে যায়। এখন বিদায়। এখানেই শেষ করতে হবে, কেননা আর কাগজ নেই। তাছাড়া সময়ও নেই আর। আমার পোশাক আর টুপিটার দরুন যা পেয়েছিলাম তার আর এক চাঁদি রুবল পরিমাণ বাকি আছে মাত্র। বাড়িউলীকে আপনি দুই চাঁদি রুবল দিয়েছেন এটা খুবই ভালো কথা। কিছু দিন এতে তার চুপ করে থাকার কথা।

আপনার পোশাক-আশাকটা ঠিক করে নেবার চেষ্টা করুন। বিদায় বন্ধু, ভারি দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি, জানি না কেন এত অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কাজ যদি বা পাই তাহলেও করব কী করে? এইটেই আমাকে শেষ করে দিচ্ছে।

ভ. দ.

৫ই সেপ্টেম্বর

আমার আদরের ভারেংকা!

আজ আমার অনেক কিছু হয়েছে গো। যেমন প্রথম কথা, সারা দিন মাথা ধরে ছিল। কোনো রকমে একটু তরতাজা হবার জন্যে বেড়াতে যাই ফন্তানকা দিয়ে। সন্ধ্যেটা ভারি অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে। পাঁচটার পরেই

অন্ধকার হয়ে আসে, এই হয়েছে এখনকার ব্যাপার! বৃষ্টি ছিল না বটে, কিন্তু কুয়াশা যা ছিল তা রীতিমতো একটা বৃষ্টির চেয়েও কম খারাপ নয়। মস্ত মস্ত লম্বা ফালিতে মেঘ ভেসে যাচ্ছিল আকাশে। বাঁধের ওপর দিয়ে লোক হাঁটছিল অবিরাম আর আশ্চর্য, সব লোকের মুখের চেহারাই যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি বিমর্ষ। মাতাল চাষীও ছিল তাদের মধ্যে, থ্যাবড়া নাক, খালি মাথা, টপবুট-পরা ফিন মাগীরাও ছিল, মজুর, গাড়োয়ান, কোনো একটা ধান্দায় বেরুনো আমাদের মতো ব্যস্ত কেরানি, ছেলে-ছোকরা, একটা রোগা ক্ষয়রোগগ্রস্ত ফিটার এপ্রেনটিস ছোকরা, পরনে ডোরা-কাটা আলখাল্লা, মুখখানা তেলতেলে কালো, হাতে একটা তালা; আর একটা বরখাস্ত সিপাই— অসম্ভব ঢ্যাঙা, এই হল গে সব লোকজন। সময়টা এমনই যে অন্য ধরনের লোক আসা সম্ভব নয়। নৌকো যাবার ফন্তানকা ক্যানেল বটে! অসংখ্য বজরা, ওর মধ্যে আঁটলই বা কেমন করে ভেবে পাওয়া যায় না। সাঁকোর ওপর মিইয়ে-যাওয়া ভেজা কেক আর পচা আপেল নিয়ে বসে আছে মেয়েরা— নোংরা একদল ভেজা সপসপে মেয়ে। বেড়াতে যাবার পক্ষে ফন্তানকা একটা হতচ্ছাড়া জায়গা! পায়ের নিচে শুধু ভেজা ভেজা পাথর, দু'পাশে উঁচু-উঁচু, কালো কালো, ঝুল কালি মাখা বাড়ি। পায়ের নিচে কুয়াশা, মাথার ওপরেও কুয়াশা। আজকের সন্ধ্যেটা ছিল এমনি মনমরা, অন্ধকার।

গরোখোভায়া রাস্তায় যখন ঢুকলাম তখন বেশ অন্ধকার, গ্যাস বাতিগুলো জ্বালানো শুরু হয়ে গেছে। এ রাস্তাটায় অনেকদিন আসি নি। সুযোগ হয় নি। বেশ তাজা লাগল। বড়ো ছোটো কত রকম যে সুন্দর সুন্দর দোকান, দামী দামী ছিট আর সার্শির পেছনে ফুল আর ফিতে-বাঁধা টুপিতে ঝলমল করছে। মনে হবে, ওসব জিনিস বুঝি শুধু সুন্দর করে সাজিয়ে রাখার জন্যেই। কিন্তু তা নয়, এসব জিনিস কিনে বৌকে উপহার দেবার মতো লোকও তো আছে। বেশ বড়োলোকী রাস্তা! জার্মান রুটিওয়ালারা অনেকেই এখানে বাস করে, তারাও বেশ ধনী নিশ্চয়। কত গাড়ি যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে; রাস্তায় অতগুলো গাড়ি ধরে কী করে! আর কী ফলাও সব গাড়ি! আয়নার মতো ঝকমকে সার্শি, ভেতরটা সিল্ক আর মখমলে সাজানো, চাকরবাকরদের দরবারী সাজ, কোমরে তরোয়াল, কাঁধে এপলেট। সবকটি গাড়ির ভেতরে তাকিয়ে দেখলাম, সবাই ভারি সুসজ্জিত মহিলা,

হয়ত কাউন্টেস আর প্রিন্সেস। সময়টা তখন নিশ্চয় এমন যে সবাই ছুটছে বলনাচ কি সান্ধ্য-পার্টিতে। কাউন্টেস কি অন্য কোনো মহীয়সী মহিলার দিকে আরো একটু কাছ থেকে ভালো করে তাকিয়ে দেখতে পারলে মন্দ হত না। সেটা খুবই ভালো লাগার কথা। আমি কখনো দেখি নি। অমন করে কে আর উঁকি দেবে। তখন আপনার কথাই মনে পড়ছিল আমার। আদরের রানী আমার, আপনার কথা মনে হয়ে কী যে টনটন করছিল বুক, কী বলি! এত দুঃখ আপনার কেনই বা হবে ভারেঙ্কা? দেবী আমার, অন্যের চেয়ে কিসে আপনি কম? অতি সহৃদয়া আপনি, সুন্দরী, শিক্ষিতা। তাহলে কপালে এমন দুর্ভাগ্য কেন জোটে আপনার? কেন এমন হয় যে ভালো মানুষটা পড়ে রইল অবহেলায় অথচ না চাইতেই সৌভাগ্য এসে হাজির হচ্ছে অন্য কারো কাছে? অবশ্য জানি, জানি গো, এসব কথা ভাবা আমার উচিত নয়, এ হল গে স্বাধীন চিন্তা। কিন্তু অকপটে ন্যায্য কথা বলতে হলে, এটা কেন যে মায়ের পেটে থাকতেই কারো জন্যে ভাগ্যের কাক সৌভাগ্যের ডাক ডেকে ওঠে অথচ অন্য জন অনাথালয় থেকে বেরিয়ে আসে ঈশ্বরের দুনিয়ায়? রূপকথার কাহিনীর মতো সত্যিই সুখ প্রায়ই আসে বোকা ইভানুশকার কপালে। তুই বোকা ইভানুশকা তোর দাদুদের ঝোলাঝুলি হাতড়িয়ে খাওয়া দাওয়া কর, ফুর্তি চালা, আর তুই হতভাগা শুধু ঠোঁট চাট, —ওই তোর কাজ ভায়া, তুই লোকটা অমনই! এরকম করে ভাবা অবিশ্যি পাপ গো, এতে অজান্তেই মনের মধ্যে পাপ ঢোকে। ঐরকমের একটা গাড়িতে কেনই বা আপনি চেপে যাবেন না, আপনার সুনজরের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাক জেনারেলরা, আমাদের মতো কীটানুকীটেরা নয়। আপনার গায়ে যদি উঠত সোনারূপো, চলতেন ফিরতেন এমন জীর্ণ সুতী কাপড়ের পোশাকে নয়, রেশমী সাজসজ্জায়। হতেন যদি এখনকার মতো এমন রোগা-পটকা, অসুস্থ নয়, মিছরির মূর্তির মতো, গোলাপী, তাজা, গোলগাল। তাহলে শুধু আপনার আলোকিত জানলায় বাইরে থেকে একবার উঁকি দিতে পারলে, অন্তত আপনার ছায়াটুকুন শুধু দেখতে পেলে কী সুখীই না হতাম। আপনি সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন শুধু এইটে ভেবেই, ওহ্, কী খুশিই না হতাম, আদরিণী আমার। অথচ এখন অবস্থাটা কী! কুলোকেরা আপনার সর্বনাশ করেছে তাই নয়, কে একটা ওঁছা, বেলেল্লা লোক অপমান করে যাচ্ছে আপনাকে। যেহেতু বাবুগিরি

করার মতো বেশ একটি ফ্রক কোট ওনার আছে এবং অপাঙ্গে চেয়ে দেখার মতো আছে একটি সোনার লর্নেট, সেইহেতু ওই নির্লজ্জটা যেন যা খুশি তাই করতে পারে, প্রশ্রয় দিয়ে তার অভব্য কথা কান পেতে শুনতে হবে। খুব হয়েছে মশাইরা! কিন্তু কেন? কারণ আপনি অনাথিনী, কারণ আপনি অসহায়, কারণ আপনাকে রক্ষা করার মতো ক্ষমতাশীল বন্ধু কেউ নেই। অনাথাকে অপমান করতে যার কিছু এসে যায় না সে কীধরনের লোক, কেমন মানুষ সে?-ওঁছা, মানুষ নয় নিতান্তই ওঁছা! শুধু নামেই মানুষ, আসলে কেউ নয়, এ আমার দৃঢ় ধারণা। এই ধরনের লোক ওরা! গরোখোভায়া রাস্তায় আজ যে অর্গান-বাদকটাকে দেখেছিলাম, মানুষ হিশেবে সেও ওদের চেয়ে শ্রদ্ধা জাগায়। একটা কোপেকের জন্যে সারা দিন রাস্তায় রাস্তায় ও যদি ঘুরেও মরে, খাবার জন্যে পায় অচল পয়সা তবুও ভালো, ও নিজেই নিজের মনিব, নিজের রোজগারে খায়। ভিক্ষে করতে তো যায় না, লোককে আনন্দ দেবার জন্যে দম দেওয়া কলের মতো খাটে, এই যেমন পারি লোকের চিত্ত বিনোদন করছি। অবিশ্যি কাঙাল সে সত্যিই, কাঙালই, কিন্তু মানী কাঙাল। ক্লান্ত হয়ে পড়লেও, শীতে জমে গেলেও ও খাটছে, নিজের মতো করে হলেও কাজ তো করে চলেছে। অনেক সৎ লোক আছে ভারেঙ্কা, যারা নিজের কাজের উপকারিতা আর পরিমাণ অনুসারে অল্প রোজগার করলেও কারো কাছে মাথা নোয়াবে না, কারো কাছেই রুটির টুকরো মাগতে যাবে না। আমি হলাম গিয়ে ঠিক ওই অর্গান-বাদকটির মতো, মানে ঠিক তা নয়, মানে মোটেই ওর মতো নই, কিন্তু চিন্তার দিক দিয়ে, সম্ভ্রান্ত,আভিজাত্যের দিক থেকে ঠিক ওরই মতো। যা পারি যথাসাধ্য খাটি আমি! আমার কাছ থেকে তার বেশি আর হবার নয়, যদি নাই হয় তাহলে আর বলার কী আছে?

অর্গান-বাদকটার কথা বললাম তার কারণ আমার দারিদ্র্যের কথা আজ আমার মনে হল দ্বিগুণ করে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গিয়ে ওকে দেখছিলাম, খেয়াল হল এই একটু অন্যমনস্ক হওয়া যাক, তাই দাঁড়িয়ে গেলাম। দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি, জনকয়েক গাড়োয়ান, কে একজন তরুণী, এবং ছোটো একটি খুকি, একেবারে নোংরা-মাখা। অর্গান-বাদকটা দাঁড়িয়ে ছিল কে জানে কাদের জানলার নিচে। নজরে পড়ল প্রায় বছর দশেকের একটি ছেলে—চেহারা ভালোই, তবে দেখতে অসুস্থ, রুগ্ণ, গায়ে শুধু একটি

শার্ট, প্রায় খালি পা—ছেলেটা হাঁ করে বাজনা শুনছে—বাচ্চা ছেলে তো! দেখছে জার্মানটার পুতুলগুলো কেমন নাচছে—নিজের হাত-পা ওদিকে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় অসাড়, ঠকঠক করে কাঁপছে, শার্টের আস্তিনটা কামড়াচ্ছে। দেখলাম হাতে ওর একটুকরো কাগজ। বেড়া দেওয়া যে বাক্সটার ওপর ফরাসী মহিলাদের সঙ্গে পুতুল নাচ হচ্ছিল সেখানে কে একজন ভদ্রলোক সামান্য একটা পয়সা ফেললেন। পয়সাটা পড়ার ঠন্‌ঠন্‌ শব্দে ছেলেটা চমকে উঠে ভয়ে ভয়ে চারপাশে চাইল। বোধ হয় ভেবেছিল যে পয়সাটা আমিই দিয়েছি। ও দৌড়ে এল আমার কাছে, হাত কাঁপছে, গলা কাঁপছে, সেই কাগজখানা আমায় দিয়ে বললে একটা চিরকুট পড়ে দেখতে! কাগজখানা খুলে দেখলাম—যা থাকে তাই—মা মারা যাচ্ছে, তিন ছেলেমেয়ে আছে না খেয়ে, সহৃদয় ভালো মানুষরা আমায় সাহায্য করুন; আর আমি মরে গেলে আমার বাচ্চাদের যে ভোলেন নি, তার জন্যে পরলোকে আমার উপকারীদের কথাও আমি ভুলব না। তা বলার কী আছে, সবই মামুলী ব্যাপার, কিন্তু আমি ওকে কী দিই? তা কিছুই দিলাম না। এমন দুঃখ লাগল! বেচারি অতটুকু এক বাচ্চা, নীল হয়ে উঠেছে ঠাণ্ডায়! খাওয়াও হয় নি নিশ্চয়। মিথ্যা কথা সে আমায় বলে নি। না, না, মিথ্যা কথা সে বলছে না; সে আমার ভালোই জানা। কিন্তু শুধু এইটেই বিছছিরি, পাজি মায়েরা কেন যে ছেলেগুলোর যত্ন নেয় না, এমন ঠাণ্ডায় আধা-ন্যাংটা অবস্থায় পাঠায় চিরকুট দিয়ে। হয়ত ও একটা বোকা মাগী, মেরুদণ্ড নেই, ওর জন্যে চেষ্টা-চরিত্তির করার মতো কেউ নেই হয়ত, তাই সারা দিন তো গুটিয়ে বসেই থাকে, হয়ত বা সত্যিই অসুস্থ। তাহলেও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছেই তো ওর দরখাস্ত করা উচিত ছিল। তবে মাগীটা বোধ হয় নেহাৎ একটা ঠগ, ইচ্ছে করেই উপোসী পেঁচোয় পাওয়া ছেলেটাকে পাঠিয়েছে লোক ঠকাতে, অসুখ বাধাচ্ছে। আর ঐ চোতা কাগজ বয়ে বয়ে কী শিক্ষা হচ্ছে ছেলেটার? শুধু কঠোর হয়ে উঠছে মনটা। ছুটোছুটি করে ছেলেটা লোকের কাছে গিয়ে মিনতি করছে, কিন্তু লোকে চলে যাচ্ছে, ওর কথা শোনার মতো সময়ই নেই কারো। পাথরের হৃদয় ওদের, কথায় একটুও দয়ামায়া নেই: 'দূর হ'! ভাগ! চালাকি মারছিস!' সবার কাছ থেকে শুধু এইসব শুনে শুনে ছেলেটার মন হয়ে উঠবে কঠোর। খামোকাই ভয়-পাওয়া বেচারি ছেলেটা কাঁপছে ঠাণ্ডায়, ঠিক

যেন একটি পাখির ছানা—পড়ে গেছে ভাঙা বাসা থেকে। হাত পা ওর হিম; নিঃশ্বাস নিতেও যেন পারছে না। তারপর দ্যাখো-না, এই কাশি শুরু হল বলে; বেশি আর সবুর করতে হবে না, কুটিল সাপের মতো ওর বুকের মধ্যে সেঁধবে রোগ। তারপর দেখতে না দেখতে মরণ এসে দাঁড়াবে ওর শিয়রে, কোনো এক পূতিগন্ধ কোণে, ছেলেটাকে যত্ন করা সাহায্য করার মতো কেউ থাকবে না। এই হল ওর গোটা জীবনখানা! জীবন এইরকমই হয় গো। কেউ যখন বলে, 'খ্রীষ্টের নামে কিছু দিন', তখন সেকথা শুনে কিছু না দিয়ে শুধু এই কথা বলে চলে যাওয়া: 'ভগবান তোমায় সাহায্য করবেন-না'—তখন কী যে কষ্ট লাগে ভারেঙ্কা। 'খ্রীষ্টের নামে' কথাটা সবসময়ই তেমন কিছু নয় ('খ্রীষ্টের নামে' হয় গো নানা রকমের)। কোনো কোনোটা হয় লম্বা, টানা টানা, অভ্যস্ত, মুখস্ত করা, স্রেফ ভিখিরির মতো। এরকম কাউকে কিছু না দিলেও তেমন কষ্ট হয় না। সে হল গে পুরনো পেশাদার ভিখিরি। এসবে সে অভ্যস্ত। সে চালিয়ে নেবে, জানে কী করে চালিয়ে নিতে হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে 'খ্রীষ্টের নামে' কথাটা শোনায় ভারি অনভ্যস্ত, রূঢ়, ভয়াবহ,—যেমন আজকে, ছেলেটার কাগজখানা যখন নিচ্ছি তখন বেড়ার কাছটায় কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল, সকলের কাছ থেকে ভিক্ষেও করছিল না, আমায় বললে, 'খ্রীষ্টের নামে একটা পয়সা দিন বাবু!' গলার স্বরটা এমন দমকা-মারা, রূঢ় যে কী একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে আমি চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু পয়সা দিলাম না, ছিলই না আমার। অথচ ভেবে দেখুন, গরিবেরা শুনিয়ে শুনিয়ে তাদের পোড়া কপালের নালিশ করলে বড়োলোকদের সেটা পছন্দ হয় না, বলে কিনা ওরা বিরক্ত করে মারছে, ওরা নাছোড়বান্দা। হ্যাঁ, দারিদ্র্য নাছোড়বান্দাই বটে! উপোসী লোকেদের কাতরানিতে ওদের ঘুমে ব্যাঘাত হয় বুঝি?

আপনাকে কবুল করে বলছি গো, এসব আমি লিখছি খানিকটা বুক হালকা করে নেবার জন্যে এবং তার চেয়েও বেশি করে আমার রচনার উন্নত স্টাইলের নমুনা আপনাকে দেখাবার জন্যে। কেননা, আপনি সম্ভবত নিজেই মানবেন যে সম্প্রতি আমার স্টাইল গড়ে উঠছে। কিন্তু এখন আমার এত মন খারাপ লাগছে যে আমি নিজেই আমার প্রাণের গভীরে সহানুভূতি টের পাচ্ছি আমার চিন্তাগুলোর জন্যে। আর যদিও একথা জানি গো, এরকম সহানুভূতিতে কোথাও গিয়ে পৌঁছব না, তবু নিজের প্রতি খানিকটা

সুবিচার করা যাবে। আর সত্যি সত্যিই লোকে প্রায়ই নিজেই নিজেকে দীন-হীন বলে ভাবে গো, এক কানাকড়িও মূল্য দেয় না নিজের, এক কুচি কাঠের চেয়েও নগণ্য মনে করে নিজেকে। একটা তুলনা দিয়ে বলি, ওই যে কাঙাল ছেলেটা আমার কাছে ভিক্ষে চেয়েছিল, আমি তো নিজেই ঠিক তারই মতো সন্ত্রস্ত আর তাড়া-খাওয়া বলেই এসব ঘটে। একটু দৃষ্টান্ত দিয়ে রূপক ধরনে বলছি ভারেঙ্কা; আমার কথাটা শুনুন গো, আমার এরকম ঘটে থাকে, সাতসকালে তাড়াতাড়ি আপিস যাওয়ার সময় আমি মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখি, শহরটা জেগে উঠে ধোঁয়া ছাড়ছে, টগবগ করছে, শব্দ তুলছে। আর এরকম দৃশ্যে মাঝে মাঝে অভিভূত লাগে, মনে হয় যেন কেউ বুঝি আমার কৌতূহলী নাকটার ওপর এক থাপ্পড় মেরেছে। তখন কুঁকড়ে গিয়ে গোবেচারার মতো পা টেনে টেনে চলে যেতে হয়! উঁকি দিয়ে দেখা যাক ওইসব বড়ো বড়ো, কালো কালো, ঝুলকালি মাখা জবরদস্ত বাড়িগুলোর ভেতরে কী হচ্ছে। একবার তাকিয়ে নিজেই ভেবে দেখুন অকারণে নিজেকে অত নিচু আর বিব্রত করে তোলা উচিত হয়েছে কিনা। মনে রাখবেন ভারেঙ্কা, এসব আমি প্রত্যক্ষ অর্থে বলছি না, বলছি রূপক হিশেবে। তাহলে ঐসব বাড়িগুলোর ভেতরে কী দেখতে পাব আমরা? দেখা যাবে, ধোঁয়া-ভরা কোনো একটা কোণে কুকুর-কুঠরির মতো স্যাঁতসেঁতে এক ঘরে, প্রয়োজনের তাগিদে যাকে ধরা হয় ফ্ল্যাট বলে, সেখানে ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে একটি মজুর। আর ঘুমের মধ্যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ বললে, সারা রাত ধরে সে স্বপ্ন দেখেছে এক জোড়া জুতোর — যেটা আগের দিন সে অনিচ্ছায় নষ্ট করে ফেলেছে। যেন এরকম বাজে স্বপ্নই লোকের দেখা দরকার! কিন্তু ও হল গে মজুর, একজন মুচি, সুতরাং নিজের বিষয়টা নিয়েই শুধু যদি সে চিন্তা করে তবে সেটা তার পক্ষে মার্জনীয়। ওর ছেলেমেয়েগুলো ঘ্যানর ঘ্যানর করছে, ক্ষিদেয় মরছে বৌটা। শুধু যে মুচিদেরই মাঝে মাঝে এরকমভাবে ঘুম ভাঙে তা কিন্তু নয় গো! ওটা কিছু নয়, ও নিয়ে লেখারও মানে হত না, কিন্তু অবস্থাটা কী দাঁড়াচ্ছে দেখুন তো: ঐ একই বাড়িতে, একতলা ওপরে বা নিচে থাকেন একজন খুব বড়োলোক, তিনিও সম্ভবত তাঁর সোনার মহলে শুয়ে শুয়ে সারা রাত ধরে জুতোর স্বপ্ন দেখেছেন, মানে অন্য ধরনের জুতো, অন্য ফ্যাশনের — তবু জুতোরই স্বপ্ন, এবং আমি যা ভাবি সে অর্থে ভারেঙ্কা, আমরা

সকলেই তো খানিকটা মুচির মতোই গো। এতেও অবশ্য কিছু এসে যেত না, কিন্তু এইটেই শুধু খারাপ ব্যাপার যে ঐ অতি ধনী ব্যক্তিটির কাছাকাছি এমন কেউ নেই যে তার কানে কানে বলবে যে 'খুব হয়েছে ও জিনিস নিয়ে ভাবা, শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করা, শুধু নিজের জন্যেই বেঁচে থাকা; তুমি তো আর মুচি নও, ছেলেপিলেগুলোও তোমার নীরোগ, বৌও ক্ষিদেয় মরছে না! চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখো হে, নিজের জুতো জোড়াটি নিয়ে ভাবিত হওয়ার চেয়ে উন্নত কোনো বিষয় তোমার চোখে পড়ছে না কি!' রূপকভাবে এই কথাটিই আপনাকে বলতে চাইছিলাম ভারেঙ্কা। হতে পারে যে এটা বড়ো বেশি রকমের একটা স্বাধীন চিন্তা, কিন্তু ভারেঙ্কা, এ চিন্তাটা মাঝে মাঝে আসে, মাঝে মাঝে দেখা দেয়, তখন আপনা হতেই উত্তেজিত হৃদয় থেকে বাক্যস্রোত বেরিয়ে পড়ে। তাই শহরের সোরগোলে ভয় পেয়ে নিজেকে মূল্যহীন বলে ভাবার কোনো কারণ নেই। পরিশেষে ভারেঙ্কা, এই বলে উপসংহার টানছি যে আপনি হয়ত ভাববেন আমি পরনিন্দা শোনাচ্ছি, পিত্তি জ্বলছে আমার, কিংবা কোনো বই থেকে এসব কথা আমি টুকে দিয়েছি। না গো, না, ওসব ভাববেন না: পরনিন্দা আমি ঘেন্না করি, পিত্তি আমার জ্বলে যায় নি এবং কোনো বই থেকে কিছুই আমি টুকে দিই নি। এই হল গে ব্যাপার!

বাড়ি ফিরেছিলাম মনমরা মেজাজে; কেটলি ফুটিয়ে দু'-এক গেলাস চা খাবার আয়োজন করছি, হঠাৎ দেখি আমাদের সেই গরিব পড়শী গর্শ্‌কভ আসছে আমার কাছে। সকাল বেলাতেই লক্ষ্য করেছিলাম ও ভাড়াটেদের কাছে ঘুরঘুর করছে, আমার কাছেও আসতে চাইছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখি গো, ওর অবস্থা আমার চেয়ে শতগুণ খারাপ। তা হবে না আবার! বৌ রয়েছে, ছেলেপুলে রয়েছে যে! আমি যদি গর্শ্‌কভ হতাম, তাহলে সত্যিই কী করব বুঝে পেতাম না। তা গর্শ্‌কভ ভায়া তো এসে ঘরে ঢুকল, মাথা নুইয়ে নমস্কার করলে, চোখ দিয়ে যেমন জল গড়ায় তেমনি গড়াচ্ছে, চোখের পাতায় পুঁজ; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উশখুশ করতে লাগল, কথা কইতে পারছিল না। আমি ওকে একটা চেয়ারে বসালাম—চেয়ারটা অবিশ্যি ভাঙা, কিন্তু ওটা ছাড়া আর কিছু ছিল না। চা দিলাম খেতে। অনেকখন ধরে ও না-না করলে, তারপর শেষে নিলে গেলাসটা। কিন্তু চিনি নিতে চাইলে না। যখন বোঝালাম যে চিনি দেওয়া দরকার ও অনেকখন ধরে তর্ক

করলে, না-না করে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে ছোটো একটুকরো চিনি নিয়ে আমাকে আশ্বস্ত করে বললে যে চা'টা নাকি আশ্চর্য রকমের মিষ্টি। উঃ, দারিদ্র্যে মানুষকে কিরকম হীনাবস্থাতেই না ফেলে! জিগ্যেস করলাম, 'তা কিরকম চলছে হে?' ও বলতে শুরু করলে, 'এই এই ব্যাপার, আপনি মাকার আলেক্সেয়েভিচ, আপনি আমার হিতৈষী, ঈশ্বরের করুণা দেখান একটু, অভাগা একটি সংসারকে সাহায্য করুন। বৌ রয়েছে, ছেলে রয়েছে, জানেন তো। খাবার কিছুই নেই ওদের। আর আমি তো বাপ, আমার যে কী লাগছে!' আমি কথা বলতে যাব, ও ফের বাধা দিয়ে বলে চলল, 'এখানকার সকলকে বড়ো ভয় করে আমার, মাকার আলেক্সেয়েভিচ, মানে ভয় ঠিক নয়, লজ্জা করে আর-কি। ওরা সবাই বড়ো ডাঁট নিয়ে থাকে, বড়ো গুমোর ওদের। বলে, আপনি আমার সজ্জন, উপকারী, আপনাকে মুশকিলে ফেলার ইচ্ছা ছিল না আমার। জানি আপনার নিজেরই নানা সমস্যা; জানি, আমায় বেশি কিছু দিতেও পারবেন না, তাহলেও অন্তত কিছু ধার দিন। বলে, সাহস করে আপনার কাছে চাইতে পারলাম কারণ জানি যে আপনি সহৃদয় মানুষ, নিজেই আপনি অভাবী, এখন কষ্টে পড়েছেন, মনে আপনার সমবেদনা জাগবে।' এই বলে সে শেষ করলে, 'আমার স্পর্ধা আর অভদ্রতা মাপ করবেন মাকার আলেক্সেয়েভিচ।' আমি বললাম, ওকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হতাম কিন্তু আমার কাছে কিছু নেই, একেবারেই কিছু নেই। ও বললে, 'হেই গো, মাকার আলেক্সেয়েভিচ, আমি বেশি চাইছি না, কিন্তু অবস্থা হল... (বলতে গিয়ে ও লাল হয়ে উঠল) আমার বৌ ছেলেমেয়েগুলো না খেয়ে আছে। অন্তত মাত্র দশ কোপেক যদি দেন...' তখন আমার নিজেরই বুকটা টনটন করে উঠল। মনে হল, এ যে আমাকেও হার মানিয়েছে! ওদিকে আমার কাছে ছিলই মাত্র সর্বসাকুল্যে কুড়ি কোপেক। কালকের জরুরি খরচ চালাবার জন্যে ওইটুকুই আমার ভরসা। বললাম, 'না ভায়া, সত্যি উপায় নেই।' বললাম, 'এই এই ব্যাপার।' বলে, 'হেই গো মাকার আলেক্সেয়েভিচ, যা ভাবতে হয় ভাবুন, অন্তত দশ কোপেক।' দেরাজ থেকে বার করে নিজের কুড়ি কোপেক দিয়ে দিলাম ওকে। এই হল গে আমার সৎকর্ম, ভারেঙ্কা! কী দারিদ্র্য! আলাপ-টালাপ করতে লাগলাম আমরা, জিগ্যেস করলাম, এইরকম অনটন সত্ত্বেও ও চাঁদির পাঁচ রুবল দিয়ে ঘর ভাড়া নিয়ে আছে কেমন করে?

বললে, এসেছিল ছ'মাস আগে, তখন তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়ে দিয়েছিল। তারপর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বেচারির এখন না ঘরকা, না ঘাটকা। ভেবেছিল এর মধ্যে ওর মামলাটার নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। কিন্তু মামলাটা ওর সুবিধের নয়। কী জানেন ভারেংকা, আদালতের কাছে ওকে জবাবদিহি করতে হবে। সরকারি টাকা ফাঁকি দেবার অভিযোগে ও কোন একজন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাচ্ছে। ব্যাপারটা ধরা পড়ায় সে আদালতে সোপর্দ হয়, কিন্তু নিজের দুষ্কর্মে সে গর্শকভকেও জড়িয়ে ফেলে, সেও কেমন করে যেন একই অবস্থায় পড়ে। আসল ঘটনা হল গর্শকভের যে ত্রুটি সেটা মাত্র অসতর্কতা, অবিবেচনা, রাষ্ট্রের স্বার্থে অবহেলা। বছরের পর বছর মামলাটা চলেছে, কিন্তু একটার পর একটা বাধা হচ্ছে গর্শকভের। সে বলে, 'যে অসম্মান আমার ওপর চাপানো হয়েছে, তার কোনো দোষ আমার নেই। আমি একান্তই নির্দোষ! চুরি জালিয়াতি আমি মোটেই করি নি।' কিন্তু মামলা হওয়ার ফলে ওর মানসম্মান খানিকটা চলে গেল। বরখাস্ত হল চাকরি থেকে, এবং যদিও সে একান্তই দোষী বলে প্রমাণিত হয় নি, তাহলেও বেকসুর খালাস ওই ব্যবসায়ীটির কাছ থেকে ওর প্রাপ্য এবং আদালতে ধার্য মোটা রকম একটা টাকা ও পাচ্ছে না। ওর কথা আমি বিশ্বাস করতে রাজি, কিন্তু আদালত তো আর বিশ্বাস করছে না। ব্যাপারটা ভারি জটিল, এত জট পাকানো যে একশ' বছরেও সে জট খুলবে না। জট খানিকটা খোলসা হতে না হতেই ব্যবসায়ীটি গেরোর পর গেরো বানিয়ে বসে। গর্শকভের জন্যে আমার আন্তরিক দুঃখ হয় গো, সহানুভূতি হয় ওর জন্যে। চাকরি নেই লোকটার। ওকে বিশ্বাস নেই বলে কাজ কেউ দেবেও না। যা কিছু পুঁজিপাটা ছিল, খেয়ে শেষ করেছে। মামলাটা গোলমেলে, অথচ দিন তো কাটাতে হবে, ইতিমধ্যে কথা নেই বার্তা নেই, একেবারে অপ্রয়োজনে ছেলে হয়ে গেল একটি—ব্যস, খরচা। ছেলেটা অসুখে পড়ল—আবার খরচা, মারা গেল—তাও খরচা। বৌ অসুস্থ, ওর নিজেরও একটা পুরনো রোগ আছে। মোটের ওপর, লোকটা ভারি কষ্ট পেয়েছে, খুবই পেয়েছে। ও অবিশ্যি বলছে যে দু'চার দিনের মধ্যে একটা অনুকূল রায় হয়ে যাবে, তাতে নাকি কোনো সন্দেহই নেই। লোকটার জন্যে ভারি কষ্ট হয় ভারেংকা। যথাসাধ্য ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। লোকটা একেবারে হালছাড়া, সন্ত্রস্ত হয়ে আছে. সাহায্য

ওর বড়োই দরকার। তাই আমি ওকে সান্ত্বনা দিলাম। এবার বিদায় গো, খ্রীষ্ট আপনার সঙ্গে থাকুন, কুশল হোক আপনার। ভারেঙ্কা, আদরের ভারেঙ্কা আমার, আপনার কথা ভাবলেও যেন ক্ষতবিক্ষত বুকে আমার মলম পড়ে, আর আপনার জন্যে আমার কষ্ট হলেও সেটা তো আমার ভালোই লাগে।

আপনার অকৃত্রিম সুহৃদ
মাকার দেভুশকিন

৯ই সেপ্টেম্বর

স্নেহের ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

আমার প্রায় মাথা খারাপ হবার জোগাড়: দারুণ একটা ঘটনায় একেবারে বিচলিত। মাথা ঘুরছে, মনে হচ্ছে সবকিছুই ঘুরছে আমার চারপাশে। কী যে বলি আপনাকে! এরকম ব্যাপার আমরা যে কল্পনাও করি নি। কিন্তু না, কল্পনায় ছিল না বললে ঠিক হবে না। কল্পনা করেছি বৈকি, আগে থেকেই মন এমনি একটা কিছু গাইছিল। সেদিন এইরকমেরই কিছু একটা স্বপ্নও দেখেছি।

ঘটনাটা এই! কোনো রকম স্টাইল না করেই সেটা বলি, ভগবান আমায় যা বলছেন তাই। আজ সকালে যথারীতি আপিসে গিয়ে আমার জায়গাটিতে বসে লিখতে শুরু করেছিলাম। আপনার জানা দরকার যে গতকালও আমি এই-ই করেছিলাম। তা গতকাল তিমোফেই ইভানোভিচ স্বয়ং এসে বলেছিলেন, তাঁর একটা জরুরি নথি অবিলম্বে নকল করে দিতে হবে। 'এটিকে তাড়াতাড়ি, পরিষ্কার করে, মন দিয়ে নকল করে দিন মাকার আলেক্সেয়েভিচ, আজ এটা সই হতে যাবে।' আপনাকে বলে রাখা উচিত যে গতকাল আমি ঠিক স্বাভাবিক ছিলাম না, তাকিয়ে দেখতেই ইচ্ছে করছিল না কিছু। ভারি একটা দুঃখ আর মন-পোড়ানি পেয়ে বসেছিল। হৃদয় নিষ্প্রাণ, প্রাণের মধ্যে অন্ধকার, মনে হচ্ছিল শুধু, আদরিণী আমার, আপনার কথা। যাই হোক নকল করতে শুরু করলাম, নকল করে দিলাম পরিষ্কার, সুন্দর করে। শুধু জানি না সঠিক করে কী বলি, শয়তানের

কারসাজিই নাকি বিধাতার গোপন নির্বন্ধ, কিংবা হয়ত এইরকমই হবার কথা, গোটা একটা লাইন আমার বাদ পড়ে গিয়েছিল। তাতে করে, ঈশ্বর জানেন, কী মানে দাঁড়ায়, কিন্তু স্রেফ কোনো মানেই দাঁড়াল না। কাগজখানা হুজুরের কাছে নিয়ে যেতে ওদের দেরি হয়েছিল, সই করার জন্যে সেটা পাঠানো হয় কেবল আজকে। এসব কিছুই না জেনে আমি যথাসময়ে আপিসে এসে এমেলিয়ান ইভানোভিচের পাশটিতে তো গিয়ে বসেছি। এখানে আরো একটা কথা বলে নেওয়া দরকার গো, গত কিছুদিন থেকে আমার লজ্জা সঙ্কোচ আগের চেয়ে দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। কারো মুখের দিকে ইদানীং চাইতাম না। চেয়ারের একটুখানি ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ হলেই আমি প্রায় আধ-মড়া। আজো তেমনি গুটিসুটি হয়ে বসে আছি, এফিম আকিমোভিচ (লোকের পেছনে লাগবার যম) সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, 'কী হল আপনার মাকার আলেক্সেয়েভিচ অমন... ইয়ের মতো বসে আছেন যে?' এই বলে সে এমন একখান মুখভঙ্গি করলে যে ওর আশেপাশে যারা ছিল হো-হো করে হেসে উঠল সবাই। ওটা যে আমাকে নিয়েই সে আর বলতে। ওই চলল তো চললই! আমি চোখ কান বুজে বসে রইলাম। এই আমার রীত, এতে তাড়াতাড়ি রেহাই দেবে আমায়। এমন সময় শুনি সোরগোল, ছোটাছুটি, শশব্যস্ততা। কানে ঠিক শুনছি তো? ডাকছে আমায়, তলব করছে, দেভুশকিনেরই ডাক পড়েছে। বুক আমার ঢিপ ঢিপ করে উঠল — নিজেই জানি না কেন অত ভয় পাচ্ছি, জীবনে এমনটা আমার কখনো হয় নি। একেবারে যেন জুড়ে গেলাম চেয়ারের সঙ্গে, এ যেন আমিই নই। কিন্তু ফের শুরু হল সোরগোলটা, কাছে আসতে আসতে একেবারে আমার কানের কাছে: 'দেভুশকিন! দেভুশকিন! কই কোথায় দেভুশকিন?' চোখ তুলে চাইলাম। দেখি এভস্তাফি ইভানোভিচ সামনে দাঁড়িয়ে। বলে, 'মাকার আলেক্সেয়েভিচ, শিগগির ছুটুন হুজুরের কাছে। দলিলখানা নিয়ে বিপদ বাধিয়েছেন।' ওই যেটুকু বললে তাতেই যথেষ্ট, তাই না গো, ওই যথেষ্ট? সর্বাঙ্গ ঠান্ডা হয়ে গিয়ে প্রায় মূর্ছা যাই আর-কি, বোধশক্তি রহিত। প্রথমে একটা কামরা, তারপর আর একটা এবং তারপর তৃতীয় কামরা পেরিয়ে আমায় হাজির করা হল খাস কামরায়! কী যে তখন ভাবছিলাম তার একটা সদর্থক খতিয়ান আপনাকে দিতে পারছি না। দেখি হুজুর দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে ঘিরে সবাই। মনে হয় আমি অভিবাদনও

করি নি, ভুলে গিয়েছিলাম। এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম যে থরথর করছে ঠোঁট আর ঠক্‌ঠক্‌ করছে পা। অবশ্য তার কারণ ছিল গো ভারেঙ্কা। লজ্জা হচ্ছিল, ডান দিকের আয়নাটায় যা দেখেছিলাম, তাতে একটা লোকের একেবারে উন্মাদ হয়ে যাওয়ার কথা! এবং দ্বিতীয়ত, আমি চিরকালই এমনভাবে চলে এসেছি যেন আমি বলে কেউ নেই দুনিয়ায়, আমি বলে একটা লোক আছি এটা হুজুরের বিশেষ জানবার কথা নয়। হয়ত খানিকটা কানে এসেছে যে দেভুশকিন নামে দপ্তরে কেউ আছে কিন্তু অতি সামান্য রকমের জানাশোনাও তাঁর ছিল না।

সক্রোধে উনি শুরু করলেন, 'এটা কী হয়েছে মশাই! কোন দিকে আপনার মন? দরকারী দলিল, জরুরি দলিল — একেবারে নষ্ট করে দিয়েছেন!' হুজুর তারপর এভস্তাফি ইভানোভিচের দিকে ফিরলেন। যা কথা কানে আসছিল তাই শুনলাম: 'এরকম অবহেলা! অমনোযোগ! ফের ঝামেলা...' বার কয়েক চেষ্টা করলাম মুখ খুলতে, ক্ষমা চাইতে, কিন্তু একটা শব্দও বেরুল না। পালাতে পারলে বাঁচতাম, কিন্তু সাহস হল না। তারপর যা কাণ্ড ঘটল গো, এমন ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড যে লজ্জায় কলম পর্যন্ত চলছে না। কোটের বোতামটা — শালা বোতামটা — লেগেছিল শুধু একটুখানি সুতোয়, সেই বোতামটা হঠাৎ ছিঁড়ে, খসে গিয়ে টুংটাং করে লাফাতে লাফাতে গিয়ে, (বোঝা যায় কোথাও ঘষটে গিয়েছিল) হাজির হল সোজাসুজি, একেবারে সোজাসুজি হুজুরের পায়ের কাছে। আর চারিদিকে সবাই তখন একেবারে চুপ করে আছে। এই হল কিনা আমার যতকিছু কৈফিয়ৎ, ক্ষমা প্রার্থনা, জবাবদিহি, হুজুরের কাছে যা বলতে চাইছিলাম, এই হল তার পরিণাম! এর ফলাফল হল ভয়াবহ! হুজুর তক্ষুনি দৃষ্টিপাত করলেন আমার মূর্তিখানার দিকে, আমার পোশাক-আশাকে। আয়নায় কী দেখেছিলাম সেটা মনে পড়ল: গেলাম বোতামটা কুড়িয়ে নিতে! কী যে পেয়ে বসেছিল আমায়! নিচু হয়ে বোতামটা ধরতে গেলাম, কিন্তু সেটা গড়াতেই লাগল, কুড়িয়ে নিতে আর পারি না, মোট কথা, কুড়তে গিয়েও বেশ একটা কৃতিত্ব দেখালাম। টের পাচ্ছিলাম, আমার শেষ শক্তিও উবে যাচ্ছে, সব গেল আমার! মান-মর্যাদা সবকিছু আমার একেবারে গেল, গোটা মানুষটাই আমি গেলাম। মনে হল যেন কানে শুনছি ফালদোনি আর তেরেসার রটিয়ে বেড়ানো নিন্দে। শেষ পর্যন্ত বোতামটার

নাগাল ধরে উঠে দাঁড়িয়ে খাড়া হয়ে রইলাম। কিন্তু আহাম্মকই যদি হই তাহলে দু'পাশে দুই হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেই হত। কিন্তু কোথায়! চেষ্টা করতে লাগলাম বোতামটা ছেঁড়া সুতোয় গুঁজতে, যেন ওটা তাতে ফের ওখানে লেগে থাকবে। তার ওপর আবার সারা সময়টা রইলাম হাসিহাসি মুখ করে, সত্যি, নিতান্ত হাসিহাসি মুখে। হুজুর প্রথমে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর আমার দিকে ফের একবার তাকিয়ে দেখে এভস্তাফি ইভানোভিচকে বললেন, 'এটা কী?.. লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখুন কী ওর চেহারা!.. কী হয়েছে ওর?.. কী ব্যাপার?..' বললে কিনা 'কী হয়েছে ওর?' তোফা একখান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি বটে, তাই না? কানে এল, এভস্তাফি ইভানোভিচ বলছে, 'কাজে গাফিলতি নেই ওর, ধমক দেবার কারণ ঘটে নি, চমৎকার কন্ডাকট্, ভালো বেতন পায় নির্ধারিত হারেই...' হুজুর বললেন, 'যা করে হোক কিছু একটু সুরাহা করুন ওর, কিছু একটা অগ্রিম দিয়ে দিন-না...', 'কিন্তু ওর যা পাওনা সবই সে আগেই নিয়ে নিয়েছে, এত দিনের অগ্রিম। অবস্থার ফেরে পড়েই করেছে বোধ হয়, তবে ওর কন্ডাকট্ চমৎকার, রেকর্ড নিখুঁত, একেবারে নিখুঁত! ওর বিরুদ্ধে একদম কিছু নেই।' নরকের আগুনে আমি তখন পুড়ছি গো, মরছি! শুনতে পাচ্ছিলাম হুজুর জোরে জোরে বলছেন, 'কাগজখানা তাহলে আর একবার তাড়াতাড়ি নকল করে দিক। দেভুশকিন, আসুন এখানে। কাগজখানা ফের নকল করে দেবেন, ভুল যেন না থাকে। আর শুনুন...' হুজুর এই বলে অন্য সকলকে নানা হুকুম দিলেন, সবাই চলে গেল। সবাই চলে যেতেই হুজুর পকেট থেকে টাকার ব্যাগ নিয়ে ব্যাঙ্ক নোটে একশ' রুবল আমার হাতে গুঁজে দিলেন, বললেন, 'নিন... আমি যেটুকু পারি, যা খুশি ভাবুন, তবে নিন।' চমকে উঠলাম ভারেঙ্কা, বুকখানা একেবারে দুরদুর করে উঠল, কী যে আমার হচ্ছিল জানি না, ইচ্ছে হচ্ছিল ওঁর হাতখানা টেনে নিই। উনি কিন্তু একেবারে লাল হয়ে উঠে—এক চুলও মিথ্যে বলছি না গো ভারেঙ্কা—লাল হয়ে উঠে সত্যি সত্যি আমার অপদার্থ হাতখানা টেনে নিয়ে এমনভাবে হ্যান্ডশেক করলেন যেন আমিও এক জেনারেল। বললেন, 'এখন আসুন। যেটুকু পারলাম আর-কি... ভুল-চুক করবেন না। এবার দোষটা আমাদের আধাআধি।'

এখন আমি এই ঠিক করেছি গো, ফেদোরা আর আপনার কাছে অনুরোধ, হুজুরের মঙ্গলকামনা করে প্রার্থনা করবেন। আমার ছেলেপিলে থাকলে তাদেরও বলতাম, বাপের জন্যে যতটা না করে তার চেয়েও বেশি করে যেন প্রতিদিন, চিরকাল প্রার্থনা করে হুজুরের জন্যে। একথাও বলব, আমার আদরের ভারেঙ্কা, জোর গলাতেই বলব, শুনুন গো কথাটা ভালো করে, দিব্যি দিয়েই বলছি, আমাদের চরম দুর্দিনে আপনাকে দেখে, আপনার বিপদ-আপদ দেখে, নিজেকে দেখে, আমার অবমাননা আর অক্ষমতা দেখে মর্মযন্ত্রণায় যতই দগ্ধে মরে থাকি না কেন, তা সত্ত্বেও, শপথ করে বলব যে এই একশ' রুবলটায় তত না, হুজুর এই যে আমার সঙ্গে, একটা খড়কুটো, মাতালের সঙ্গে, তার অপদার্থ হাতখানা নিয়ে করমর্দন করলেন, এই ঘটনাটাই আমার কাছে অনেক বেশি দামী! এতে করে উনি আমায় ফের মানুষ করে দিয়েছেন। এই আচরণে উনি আমায় পুনর্জন্ম দিয়ে চিরকালের জন্যে আমার জীবনটাকে মধুময় করে দিলেন। পরমেশ্বরের কাছে যত পাপই আমি করি না কেন হুজুরের সুখ আর মঙ্গলের জন্যে আমার প্রার্থনা তাঁর সিংহাসনের কাছে পৌঁছবেই!

মনটা এখন সাংঘাতিক বিচলিত হয়ে পড়েছে ভারেঙ্কা, সাংঘাতিক উত্তেজনার মধ্যে আছি। ঢিপঢিপ করছে বুকের ভেতরটা, যেন ফেটে যাবে। কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছি। ব্যাঙ্ক নোটে পঁয়তাল্লিশ রুবল আপনাকে পাঠালাম। কুড়ি রুবল দেব বাড়িউলীকে, নিজের জন্যে রাখছি পঁয়ত্রিশ রুবল। পোশাক-আশাক মেরামত করে নেবার জন্যে লাগবে কুড়ি রুবল। সংসার খরচের জন্যে থাকল পনেরো। সকালবেলাকার এইসব অনুভূতি কেবল এখন একেবারে বেসামাল করে দিচ্ছে আমায়। শুয়ে পড়াই আমার দরকার। তবে মনটা শান্ত হয়ে গেছে আমার, খুবই শান্ত। শুধু ব্যথা করছে যেন প্রাণের ভেতরটা, টের পাচ্ছি অনেক গভীরে সে প্রাণ কাঁপছে, থরথর করছে, নড়ে উঠছে। আপনাদের ওখানে যাব; কিন্তু এত সব কাণ্ডের পর স্রেফ মাতাল-মাতাল লাগছে। ...ভগবান তো সবই দেখছেন গো, সোনামণি আমার!

আপনার সুযোগ্য সুহৃদ
মাকার দেভুশকিন

১০ই সেপ্টেম্বর

আমার অমায়িক মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

আপনার সৌভাগ্যে আমার যা আনন্দ হল বলার নয়, আপনাদের বড়ো কর্তার সৎকর্মের গুণগ্রাহী আমি। তাহলে দুর্ভাবনা থেকে এখন একটু শান্তি পেলেন। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই টাকাটা মিছিমিছি উড়িয়ে দেবেন না। নির্ঝঞ্ঝাটে এবং যথাসাধ্য সাদাসিধাভাবে থাকার চেষ্টা করুন, আর সর্বদাই অন্তত একটু করে জমিয়ে রাখতে শুরু করুন, যাতে দুর্ভাগ্য আবার হঠাৎ করে এসে না পড়ে। আমাদের জন্যে ভাববেন না। ফেদোরা আর আমি কোনো রকমে চালিয়ে নেব। অত টাকা আমাদের জন্যে কেন পাঠালেন মাকার আলেক্সেয়েভিচ? টাকার আদৌ কোনো দরকার নেই আমাদের। যা আছে তাতেই আমরা খুশি। অন্য বাসায় উঠে যেতে হলে অবিশ্যি টাকার দরকার হবে সত্যি, কিন্তু অনেক দিনকার পুরনো একটা ধারের টাকা পাওয়া যাবে বলে ফেদোরা আশা করছে। তবে একান্ত দরকার যদি পড়ে সেজন্যে কুড়ি রুবল রেখে বাকিটা আপনাকে ফেরত পাঠালাম। পয়সাকড়ি সাবধানে রাখবেন মাকার আলেক্সেয়েভিচ। এখন আসি। শান্তিতে দিন কাটান এবার। কুশল হোক আপনার, মন ভালো থাক। ভারি ক্লান্ত লাগছে নইলে আরো লিখতাম। কাল সারা দিন বিছানা ছেড়ে উঠি নি। দেখা করতে আসবেন কথা দিয়ে ভালোই করছেন। সত্যি দেখতে আসুন আমায়।

ভ. দ.

১১ই সেপ্টেম্বর

ভারভারা আলেক্সেয়েভনা, লক্ষ্মীটি আমার!

এখন আমি যখন একেবারে সুখী, সবেতেই খুশি, তখন আমায় ছেড়ে চলে যাবেন না লক্ষ্মীটি, মিনতি করছি। ফেদোরার কথা শুনবেন না, যা চাইবেন আপনার জন্যে সব করব। ঠিক মতো, নিয়মাফিক চলব আমি; শুধু হুজুরের প্রতি শ্রদ্ধাবশতই তা করব। ফের আমরা সুখের চিঠি লিখব

পরস্পরকে, জানাব আমাদের ভাবনাচিন্তা, আমাদের আনন্দ, আর উদ্বেগ থাকলে সে উদ্বেগের কথা। মিলে-মিশে সুখে শান্তিতে বাস করব আমরা। সাহিত্য চর্চা করব গো! ভাগ্য আমার ফিরে গেছে, আর সবই ফিরেছে ভালোর দিকে। বাড়িউলী আলাপী হয়ে উঠেছে। তেরেসার বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে, এমনকি ফালদোনিও হয়ে উঠেছে চটপটে। রাতাজিয়ায়েভের সঙ্গে মিটমাট করে নিয়েছি। আনন্দে আমি নিজেই যেচে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। সত্যিই উনি ভারি ভালোমানুষ গো, লোকে তাঁর সম্পর্কে যত কুকথা রটিয়েছে সব বাজে। এখন জানা গেল এসবই একেবারে জঘন্য অপবাদ। আমাদের নিয়ে বই লেখার কথা উনি কখনো ভাবেনই নি। নিজেই আমাকে উনি সেকথা বললেন এবং নতুন লেখা থেকে কিছু কিছু পড়েও শোনালেন। আর আমাকে যে 'নাগর' বলেছিলেন, সেটা মোটেই গালাগালি বা অশোভন কিছু নয়; সেটা আমাকে বুঝিয়ে বলেছেন। কথাটা হুবহু বিদেশী ভাষা থেকে নেওয়া; তার মানে 'চটপটে ছোকরা'। আর সাহিত্য করে বলতে গেলে তার মানে 'আলগা ফেলে রেখো না হে' — এই হল ব্যাপার, অন্য কিছু নয়। ওটা একটা নিরীহ রহস্য গো। আর আমি তো অশিক্ষিত তাই ভুল বুঝে রাগ করেছিলাম। তাঁর কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছি আমি... তাছাড়া দিনটাও আজকে এত সুন্দর ভারেঙ্কা, ভারি চমৎকার। সকালে একটু কড়া ঠান্ডা নেমেছিল বটে, যেন চালনির মধ্যে দিয়ে ঝিরঝিরিয়ে পড়ছে, কিন্তু ওটা কিছু নয়। তাতে বরং বাতাসটা তাজাই হয়ে উঠেছে। জুতো কিনতে গিয়েছিলাম আর সুন্দর এক জোড়া বুট কিনেছি আমি। যাচ্ছিলাম নেভস্কি সড়ক দিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'পচেলা' কাগজখানাও পড়েছি। ওহো, আসল কথাটাই তো বলতে ভুলে গেছি।

শুনুন তাহলে: আজ সকালে এমেলিয়ান ইভানোভিচ এবং আক্সেন্তি মিখাইলোভিচের সঙ্গে হুজুরকে নিয়ে আলাপ হচ্ছিল। হ্যাঁ ভারেঙ্কা, দেখলাম, শুধু আমাকেই যে উনি দয়া করেছেন তা নয়। শুধু আমারই হিতৈষী তিনি নন। সহৃদয়তার জন্যে হুজুরের নাম আছে, অনেক জায়গা থেকেই ওঁর প্রশংসা আসে, কৃতজ্ঞতায় চোখের জল ঝরায় লোকে। শুনলাম, উনি নাকি একটি অনাথিনীকে পালন করেছিলেন, তারপর বেশ একটি পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেন — লোকটা কেরানি, হুজুরের বিশেষ বিশেষ কাজ করত। বিধবার একটি পুত্রের জন্যেও তিনি একবার

একটি চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন এবং এছাড়াও আরো অনেক সৎকাজ করেছেন। আমি তখন আমার করণীয়টুকু করা উচিত জ্ঞানে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে হুজুরের আচরণের কথা বলি। সবই বললাম ওদের, কিছুই ঢেকে রাখি নি। লজ্জা-টজ্জার কেয়ার করি নি। তাছাড়া এ অবস্থায় কিসের লজ্জা, কিসের আত্মাভিমান! হুজুরের ভালো কাজের প্রশংসা সকলে শুনুক! বেশ উৎসাহ করে আমি বলেছিলাম, উত্তেজিত হয়ে — লজ্জায় লাল-টাল হবার বদলে বরং গর্বই হচ্ছিল যে এরকম ঘটনা আমি বলতে পারছি। ওদের বললাম সবকিছুই (বুদ্ধি করে আপনার কথা কিন্তু কিছুই বলি নি গো)। বাড়িউলী আর ফালদোনি, আর রাতাজিয়ায়েভ আর জুতো আর মার্কভ, মেয়েটের ওপর সবকিছু সম্পর্কেই ওদের বললাম। কেউ কেউ হাসাহাসি করেছিল সত্যি, মানে সকলেই হেসে উঠেছিল। হয়ত আমার চেহারায় হাস্যকর কিছু একটা পেয়েছিল, কিংবা আমার জুতো জোড়ার জন্যে। নির্ঘাৎ ওই জুতোর জন্যেই। খারাপ কিছু ভেবে ওরা এটা করে নি। ওটা এমনি এমনি, বয়স তো অল্প আর অবস্থাও ভালো। কিন্তু কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে, কোনো বিদ্বেষ নিয়ে আমার কথায় হাসা কিছুতেই সম্ভব নয় ওদের। মানে, হুজুরের ব্যাপারে কিছুতেই ওদের হাসি পেতে পারে না। তাই না, ভারেঙ্কা?

এখনো পর্যন্ত সুস্থির হয়ে উঠতে পারছি না গো। ঘটনাগুলো আমায় ভারি বিচলিত করেছে! আপনার জ্বালানি-কাঠ আছে তো? শরীরের যত্ন নেবেন, ঠান্ডা লাগাবেন না ভারেঙ্কা। ঠান্ডা লাগাতে কতক্ষণ। ওহ্ ভারেঙ্কা, আপনার মন খারাপ-করা ভাবনাগুলোয় আমায় শেষ করে দিচ্ছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি গো, কী প্রার্থনাই যে করি আপনার জন্যে! উলের মোজা আর গরম জামাটামা আছে তো? কিছু দরকার থাকলে বুড়ো মানুষটার মনে দাগা দেবেন না, সোজাসুজি আমায় বলবেন। দুঃসময় তো কেটে গেল, আমায় নিয়ে ভাববেন না, সামনেই সুদিন!

ভারি খারাপ সময় এসেছিল আমাদের ভারেঙ্কা, কিন্তু সেসব এখন গেছে! সময় কেটে যাবে, তখন এইসব দিনের কথা মনে করে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়বে আমাদের। আমার অল্প বয়সের কথা মনে পড়ে। ওহ্! মাঝে মাঝে একটা কোপেকও থাকত না, গরম পোশাক নেই, পেটে ক্ষিদে তবু হাসিখুশি ছিলাম তখন। সেসব দিনে সকালে যদি নেভস্কি দিয়ে যেতে যেতে একটি

সুন্দর মুখ চোখে পড়ত, তাহলে তাতে আমার সারা দিন সুখে কেটে যেতে পারত। সে এক কাল গেছে গো! বেঁচে থাকাটা সত্যিই সুন্দর ভারেঙ্কা, বিশেষ করে পিটারবুর্গে। কাল আমি সাশ্রুনয়নে অনুতাপ করেছি ঈশ্বরের কাছে, মনমরা এই দিনগুলিতে আমার যত পাপ তিনি যেন মার্জনা করেন: আমার যত অসন্তুষ্ট গুঞ্জন, উদারনৈতিক চিন্তা, হল্লা-হাঙ্গামা, মাতামাতি — সব। প্রার্থনার মধ্যে সস্নেহে ভেবেছি আপনার কথা। একা আপনিই তো দেবী আমার, আমাকে বাঁচিয়েছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন, সুপরামর্শ দিয়ে পথ দেখিয়েছেন। একথা আমি কখনোই ভুলতে পারি না গো। আজ আপনার চিঠিগুলোর সবকটিতে চুমু দিয়েছি। বিদায় আমার ভারেঙ্কা। শুনেছি, কাছেই কোথায় একটা আপিসের কোট নিলাম হচ্ছে। খানিকটা খোঁজ-টোজ করে দেখি? বিদায় আমার আদরের রানী, বিদায়!

অকপটে আপনার অনুগত
মাকার দেভুশকিন

১৫ই সেপ্টেম্বর

করুণাময় মান্যবর মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

মন আমার সাংঘাতিক বিচলিত হয়ে আছে। কী হয়েছে শুনুন। কেমন যেন টের পাচ্ছি করাল কিছু একটা ঘটতে চলেছে। আপনি নিজেই বুঝে দেখুন, পরম বন্ধু আমার। শ্রীযুক্ত বিকভ এখন পিটারবুর্গে। ফেদোরার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। দ্রজ্‌কি গাড়ি করে যাচ্ছিলেন, গাড়ি থামিয়ে নিজেই তার কাছে গিয়ে জিগ্যেস করেন কোথায় সে থাকে। ফেদোরা প্রথমে বলতে অস্বীকার করে। তখন উনি মুচকি হেসে বলেন যে কে ওর সঙ্গে থাকে তা উনি ভালোই জানেন (নিশ্চয়ই আন্না ফিওদরভনা বলে দিয়েছেন)। ফেদোরা তখন আর সইতে না পেরে ওখানেই, ওই রাস্তাতেই ওকে বেশ একচোট শুনিয়ে দিয়েছে, বলেছে উনি চরিত্রহীন, আমার সব দুর্ভাগ্যের উনিই কারণ। জবাবে উনি বলেন, পয়সা না থাকলে লোকের

দুর্ভাগ্য তো হবেই। ফেদোরা তখন তাঁকে বলে যে আমি অন্তত কাজকর্ম করে চালিয়ে নিতে পারতাম, কিংবা বিয়ে করতে পারতাম কাউকে, নয়ত একটা চাকরি-বাকরিও হতে পারত কোথাও, কিন্তু এখন সুখ আমার চিরকালের জন্যে গেছে, তার ওপর আবার আমি রুগ্ণ, মরতে চলেছি। তাতে উনি মন্তব্য করেন যে আমি এখনো বড়ো ছেলেমানুষ, মাথায় গাঁজলা আছে, 'আমার গুণপনা সব মিইয়ে গেছে' (হুবহু ওঁর কথা)। ফেদোরা আর আমার ধারণা ছিল, কোথায় আছি তা উনি জানেন না, কিন্তু গতকাল গাস্তিনি দ্ভোরে কিছু কেনা কাটার জন্যে যেই একটু বেরিয়েছি, অমনি হঠাৎ আমাদের ঘরে এসে উনি হাজির। মনে হয় উনি চাইছিলেন না যে আমি ঘরে থাকি। তারপর তিনি কেমনভাবে আমাদের দিন কাটছে তা নিয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেন ফেদোরাকে, সবকিছু খুঁটিয়ে নজর করেন, আমাদের হাতের কাজগুলো পর্যন্ত। তারপর শুধান, 'যে কেরানিটির সঙ্গে আপনাদের আলাপ সেটি কে?' ঠিক তখনই আপনি আঙিনা পার হয়ে যাচ্ছিলেন, ফেদোরা আপনাকে দেখিয়ে দেয়। উনি তাকিয়ে দেখে একটু বাঁকা হাসেন। ফেদোরা ওঁকে চলে যেতে বলে। বলে যে নানা হাঙ্গামায় আমি এতই অসুস্থ, ওঁকে দেখলে ফল ভারি খারাপ হবে। উনি খানিক চুপ করে থেকে বলেন, বিশেষ কিছু করার নেই বলে এমনিই এসেছেন। ওকে পঁচিশ রুবল দিতে চান, ও অবিশ্যি নেয় নি। কিন্তু এসবের মানে কী? আমাদের কাছে এলেন কেন? আমাদের সম্পর্কে সব খবর উনি জানলেন কী করে ভেবে কূল পাচ্ছি না। ফেদোরা বলছে, ওর ননদ আক্সিনিয়া, মাঝে মাঝে যে দেখতে আসে আমাদের, তার সঙ্গে ধোপানী নাস্তাসিয়ার আলাপ আছে, এবং আন্না ফিওদরভনার ভাইপোর বন্ধু যে দপ্তরে কাজ করে সেখানেই নাস্তাসিয়ার খুড়তুতো ভাই হল গে দরোয়ান। এই সূত্রেই কোনোভাবে রটনাগুলো পৌঁছয় নি তো? তবে খুবই সম্ভব যে ফেদোরা ভুলই করছে। ভেবে পাচ্ছি না কী ব্যাপার। ফের আসবে নাকি আমাদের এখানে? এই একটা কথা ভেবেই আতঙ্ক হচ্ছে আমার! কাল যখন ফেদোরা এইসব বলছিল, আতঙ্কে আমার তখন প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা। আমার কাছ থেকে আর কী চান উনি! ওঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতেই আমি আর রাজি নই! হতভাগিনী এক মেয়ের কাছে কী ওঁর কাজ? ওহ্! কী আতঙ্কেই না আমি রয়েছি। মনে হয় এই বুঝি বিকভ এক্ষুনি এসে

পড়বে? কী হবে, কী আছে আমার কপালে? এক্ষুনি আসুন আমাদের কাছে, মাকার আলেক্সেয়েভিচ, ভগবানের দোহাই, এক্ষুনি চলে আসুন।

ভ. দ.

১৮ই সেপ্টেম্বর

আদরের ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

আজকের তারিখে আমাদের বাড়িতে একটা সাতিশয় করুণ, দুর্বোধ্য, অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটেছে। বেচারা গর্শ্কভ (আপনাকে জানিয়ে রাখা দরকার গো) পুরোপুরি নির্দোষ সাব্যস্ত হয়েছে। সিদ্ধান্তটা আগেই হয়েছিল, আজ সে গিয়েছিল চূড়ান্ত রায় শুনতে। ওর পক্ষেই ভালোয় ভালোয় মামলাটার নিষ্পত্তি হয়েছে। কাজে অবহেলা, অসাবধানতার দরুন তার যা দোষ তা পুরোপুরি মাপ হয়ে গেছে। রায় দিয়েছে ব্যবসায়ীটির কাছ থেকে সে বেশ মোটা একটা টাকা পাবে, সুতরাং ওর অবস্থা বেশ ফিরল, মান-মর্যাদারও কলঙ্ক মোচন হল। মোটের ওপর, সবকিছুরই সুরাহা হল: ওর আশা মিটল পুরোপুরি। আজ সে বাড়ি ফেরে বিকেল তিনটের সময়। দেখে আর চেনা যায় না, কাগজের মতো ফ্যাকাশে, থরথর করছে ঠোঁটদুটো, কিন্তু তবু হেসেই যাচ্ছে। বৌ আর ছেলেপিলেগুলোকে ও আলিঙ্গন করলে। দল বেঁধে আমরা গেলাম ওকে অভিনন্দন জানাতে। ভারি অভিভূত হয়ে ও অভিবাদন করে গেল অনবরত, আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে বারবার করে করমর্দন করলে। মনে হল কেমন যেন ওকে লম্বা দেখাচ্ছে, পিঠটা সিধে হয়ে এসেছে, চোখের কোণে অনবরত যে জল ঝরত সেটা নেই। বেচারার কী উত্তেজনা! দু'মিনিটের জন্যেও স্থির হয়ে ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, অনবরত এটা-সেটা যা পাচ্ছে তুলছে আবার রাখছে, অনবরত হেসে যাচ্ছে আর অভিবাদন করছে, একবার করে বসছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে, ফের বসছে, আর কী যে বলছে ভগবান জানেন: 'মর্যাদা, আমার মর্যাদা, সুনাম, ছেলেপুলেরা আমার...' বলছে কী, কাঁদতেও শুরু করেছিল ও। আমাদের বেশির ভাগেরই জল এসেছিল চোখে। বোধ হয় ওকে উৎসাহ দেবার জন্যে রাতাজিয়ায়েভ বললেন, 'খাবার না

থাকলে মান-মর্যাদার আর দাম কী হে। টাকা বাপু, আসল কথা টাকা। সেইজন্যেই বরং ভগবানকে ধন্যবাদ দিন!' এই বলে উনি ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন। আমার মনে হয় যেন তাতে গর্শকভ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। মানে, সরাসরি সে তার বিরক্তি প্রকাশ করেছিল তা নয়, কিন্তু রাতাজিয়ায়েভের দিকে ভারি অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে কাঁধ থেকে তাঁর হাতখানা ও নামিয়ে দিলে। এরকম কাজ আগে কখনো তার দ্বারা সম্ভব হত না গো! তবে নানা লোকের নানা চরিত্র। যেমন, এমন আনন্দের দিনে আমি কখনো অতটা গরব দেখাতে পারতাম না। এক একটা সময় আসে যখন মানুষ বেশি করেই দুটো বাড়তি সেলাম জানায়, নিজেকে অতি বিনীত করে রাখতে চায়, আর সেটা আর কিছু নয় শুধু এই জন্যেই যে প্রাণে দয়ামায়ার উচ্ছ্বাস এসেছে, মনটা ভরে উঠেছে কোমলতায়। ...তবে ব্যাপারটা তো আর আমাকে নিয়ে নয়। গর্শকভ বললে, 'হ্যাঁ, টাকাটাও ভালো জিনিস, জয় ভগবান, জয় ভগবান!..' তারপর যতক্ষণ আমরা ওর ওখানে ছিলাম, বারবারই শুধু ওর এই এক কথা, 'জয় ভগবান, জয় ভগবান!' ওর বউ বেশি করে ভালো রকম একটা খাবারের বায়না দিলে। নিজেই রান্না করলে আমাদের বাড়িউলী, বাড়িউলীরও একরকমের দয়ামায়া আছে। দুপুরের খাবার শুরু না হওয়া পর্যন্ত গর্শকভ খুব ছটফট করে বেড়াচ্ছিল। লোকে ডাকুক না ডাকুক, সবকটি ঘরে ঘরে ও যেতে শুরু করলে। এমনি গিয়ে ঢুকছে, একটু হাসছে, চেয়ারে বসছে, হয়ত কিছু একটা বলছে কখনো, কখনো কিছুই তাও বলছে না, উঠে চলে যাচ্ছে। নৌবাহিনীর অফিসারের ওখানে হাতে তাসও নিলে, ওকে চার নম্বরের খেড়ু করে তাস খেলতে বসানো হল। খেলেই চলল ও, তারপর খেলায় কী একটা গোলমাল করে বসল, তিন চারটে বিদঘুটে দান দিয়ে খেলা ছেড়ে দিলে, বললে, 'নাঃ, এ আমি এমনি, ও শুধু এমনি একটু!' বলে চলে গেল। বারান্দায় আমার সঙ্গে দেখা হতেই আমার হাতদুটো ধরে সোজাসুজি তাকাল আমার চোখের দিকে, তবে কেমন অদ্ভুতভাবে; তারপর আমার করমর্দন করে চলে গেল হাসিমুখে, কিন্তু সে হাসিখানা কেমন কষ্টকর, অদ্ভুত, যেন প্রাণহীন। আনন্দে কাঁদছিল ওর বৌ, ওদের ঘরখানায় তখন মহাফুর্তি, উৎসবের আমেজ। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলে ওরা। খাবারের পরে বৌকে ও বললে, 'শোনো গো, একটু গড়িয়ে নিচ্ছি।' এই বলে বিছানায় গেল। ছোট মেয়েটিকে ডেকে

অনেকখন ধরে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। তারপর বৌয়ের দিকে ফিরে জিগ্যেস করলে, 'কিন্তু আমাদের পেতেঙ্কা কোথায় গো?' বৌ তৎক্ষণাৎ ক্রুশ করে ওকে বললে যে পেতেঙ্কা তো মারা গেছে। ও বললে, 'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, সব জানি, পেতেঙ্কা এখন স্বর্গরাজে।' বৌ টের পেয়েছিল যে লোকটা কেমন প্রকৃতিস্থ নয় — ঘটনাটায় ও একেবারে বেসামাল হয়ে গেছে। বললে, 'তুমি বাপু ঘুমিয়ে নাও একটু।' 'হ্যাঁ, তা বেশ, এক্ষুনি ঘুমচ্ছি... একটুখানি আর-কি।' এই বলে ও পাশ ফিরে কিছুক্ষণ শুয়ে রইল, তারপর আবার ফিরল যেন কিছু বলতে চায়। বৌ কিন্তু শুনতে না পেয়ে জিগ্যেস করলে, 'কিছু বলছ?' কিন্তু ও জবাব দিলে না। বৌ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে ঘণ্টাখানেকের জন্যে গেল বাড়িউলীর কাছে। এক ঘণ্টা পরে ফিরে এসে দেখে স্বামী তখনো জাগে নি, নড়াচড়া না করে শুয়ে আছে, ঘুমচ্ছে ভেবে বৌ, তখন এটা-ওটা কিছু কাজ নিয়ে বসে। বৌ বলছে, আধ-ঘণ্টাখানেক ও এমনি কাজ করেছে নিজের মনে, ভাবনায় এমন বিভোর হয়ে ছিল যে মনেই করতে পারে না কী ভাবছিল, বলে, স্বামীর কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু তারপর কেমন যেন একটা আতঙ্কে ও হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে। সর্বপ্রথমে তার ভারি অদ্ভুত লাগে ঘরখানায় কেমন মড়ার মতো একটা স্তব্ধতায়। বিছানার দিকে তাকিয়ে ওর চোখে পড়ল, স্বামী সেই একইভাবে শুয়ে আছে। কাছে এসে কম্বল তুলে দেখা গেল ও একেবারে ঠান্ডা — মারা গেল গো, মারা গেল গর্শকভ, হঠাৎ করে মারা গেল, যেন বজ্রপাতে প্রাণ গেছে ওর! ভগবান জানেন কেন। আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছি ভারেঙ্কা, এখনো ঠিক সামলে উঠতে পারছি না। বিশ্বাসই হচ্ছে না যে এমন অনায়াসে মরে যেতে পারে লোকে? কী অভাগা এই বেচারি গর্শকভ! কী কপাল, কেমনধারা কপাল! ওর বউ কাঁদছে, আঁতকে রয়েছে, ছোটো মেয়েটা সরে গিয়ে সেঁধিয়েছে কোন একটা কোণে। খুব একটা সোরগোল উঠেছে ওদের ঘরে। শুনেছি পোস্টমর্টেম তদন্ত হবে... কিন্তু সঠিক বলতে পারি না। শুধু কষ্ট হচ্ছে, এত খারাপ লাগছে যে বলার নয়। ভাবতেই বিচ্ছিরি লাগছে যে সত্যিই এমনিধারা... দিনক্ষণ জানা নেই, খামোকা প্রাণ গেল মানুষের...

মাকার দেভুশকিন

১৯শে সেপ্টেম্বর

করুণাময়ী মান্যবরা ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

আপনাকে জানাই যে আমাদের রাতাজিয়ায়েভ আমার জন্যে একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন জনৈক লেখকের কাছে। রাতাজিয়ায়েভের কাছে কে একজন এসেছিল ভারি মোটা একটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কাজ অনেক। শুধু হাতের লেখা এত অপরিষ্কার যে কী করে সামলাব জানি না। তাড়াতাড়ি দরকার। এমনভাবে সব লেখা যে পড়ে বোঝা যায় না... কথা হয়েছে এক এক পাতার জন্যে চল্লিশ কোপেক। এই খবরটা আপনাকে এই জন্যে জানাচ্ছি যে বাড়তি টাকা হবে এবার। বিদায় গো, এখন কাজে বসে যেতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত সুহৃদ
মাকার দেভুশকিন

২৩শে সেপ্টেম্বর

মাকার আলেক্সেয়েভিচ, প্রিয় বন্ধু আমার!

গত তিন দিন আপনাকে কিছু লিখি নি। এ তিন দিন আমার ভারি বিপদ আর দুশ্চিন্তায় কেটেছে।

গত পরশু বিকভ এসেছিলেন আমার কাছে। আমি একলা ছিলাম, ফেদোরা কোথায় যেন বেরিয়েছিল। দরজা খুলে ওঁকে দেখেই এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে প্রায় নড়ার শক্তি ছিল না। টের পাচ্ছিলাম যে খুব বিবর্ণ হয়ে গিয়েছি। উনি ঘরে ঢুকলেন ঠিক সেই চিরাচরিত উচ্চ হাসির সঙ্গে, একটা চেয়ার টেনে বসলেন। অনেকখন সম্বিত ফিরে আসছিল না, অবশেষে কোণে গিয়ে বসলাম কাজ নিয়ে। আমার চেহারা দেখেই বোধ হয় ওঁর হাসি মিলিয়ে এসেছিল। ইদানীং আমি ভারি রোগা হয়ে গিয়েছি। চোখ মুখ বসে গেছে আমার, কাগজের মতো ফ্যাকাশেও হয়ে গিয়ে থাকব... এক বছর আগেও যারা আমায় জানত এখন আমায় দেখে তাদের পক্ষে চেনা সত্যিই কঠিন হবে। অনেকখন উনি আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে

রইলেন, তারপর ফের খুশি হয়ে উঠলেন। কিসব যেন বললেন। কী জবাব দিয়েছিলাম মনে নেই, ফের হেসে উঠলেন উনি। পুরো এক ঘণ্টা উনি এখানে রইলেন, কথা কইলেন অনেক, জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। শেষে যাবার সময় আমার হাতটা নিয়ে বললেন (হুবহু তিনি যা বলেছিলেন): 'এ শুধু আপনাকে বলছি ভারভারা আলেক্সেয়েভনা, আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিতা এবং আপনার এই আত্মীয়া আন্না ফিওদরভনাটি হল অতি জঘন্য একটি মেয়েমানুষ! (এই বলে উনি একটা খারাপ কথা যোগ করলেন।) উনি আপনার পিসতুতো বোনকে গোল্লায় পাঠিয়েছেন এবং আপনারও সর্বনাশ করেছেন। আর আমার দিক থেকে, আমি অবশ্য এক্ষেত্রে একটা পাষণ্ডের মতো ব্যবহার করেছি, কিন্তু এ হল সংসারেরই হাল।' এই বলে উচ্চ স্বরে উনি হেসে উঠলেন। তারপর মন্তব্য করলেন, কথা উনি তেমন সাজিয়ে বলতে পারেন না। তবে মূল কথাটা — তাঁর আত্মসম্মানের দরুন যে কথাটা তাঁর বলা কর্তব্য বোধ করেছেন সেটা তিনি বলেছেন, এখন বাকিটুকু তিনি সংক্ষেপে সারবেন। এবং তখন তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি আমার পাণিপ্রার্থী, আমার সম্মান পুনরুদ্ধার করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি মনে করেন, তিনি ধনী, বিয়ের পর তিনি আমায় নিয়ে যাবেন স্তেপ অঞ্চলে তাঁর গাঁয়ে, সেখানে খরগোশ শিকার করা তাঁর সখ। পিটারবুর্গে তিনি আর কখনো ফিরবেন না, কেননা এটা ভারি বিছছিরি শহর। এখানে পিটারবুর্গে আছে, উনি যা বললেন তাঁর এক অপদার্থ ভাইপো, তাকে তিনি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন বলে শপথ নিয়েছেন, সেইজন্যেই অর্থাৎ আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী থাকবে বলে আমায় বিয়ে করতে চান, এই হল তাঁর বিয়ের প্রধান কারণ। অতঃপর মন্তব্য করলেন যে আমি খুব গরিবের মতো আছি, এরকম একটা হতচ্ছাড়া জায়গায় থাকলে রুগ্ণ যে হব তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, আর এক মাস এখানে থাকলে আমার মরণ যে নিশ্চিত সে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করলেন। বললেন, পিটারবুর্গের বাড়ি-গুলো ভারি বিছছিরি এবং জানতে চাইলেন আমার কিছু দরকার আছে কিনা।

তাঁর প্রস্তাবে ভয়ানক বিচলিত হয়ে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। কেন যে কাঁদলাম জানি না। আমার চোখের জলটাকে উনি কৃতজ্ঞতা বলে ধরে নিয়ে জানালেন, আমি যে একজন সহৃদয়া, অনুভূতিপ্রবণা এবং শিক্ষিতা

মেয়ে তা তিনি চিরকালই জানতেন, তবু আমার বর্তমান চাল-চলনের খুঁটিনাটির খোঁজ খবর না করে তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। তারপর তিনি আপনার কথা জিগ্যেস করলেন। বললেন যে উনি সব শুনেছেন, আপনি উন্নত নীতির লোক, উনিও তাঁর দিক থেকে আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকতে চান না। আমার জন্যে আপনি যাকিছু করেছেন তার দরুন পাঁচশ' রুবল আপনার কাছে যথেষ্ট হবে কিনা? আমি যখন বললাম যে আপনি যা করেছেন, তা টাকা দিয়ে শোধ করা যায় না, তাতে উনি বললেন, যত বাজে কথা; নিতান্ত নভেলীপনা, আমি একান্তই ছেলেমানুষ, কবিতা-টবিতা পড়ার বাতিক আছে, নভেল থেকেই যত তরুণী মেয়েদের সর্বনাশ ঘটে। বই-জিনিসটাই শুধু নীতিবোধ নষ্ট করে, বই তিনি মোটেই দেখতে পারেন না। পরামর্শ দিলেন, ওঁর মতো বয়স হবার পরেই যেন লোকজন সম্পর্কে মতামত দিতে যাই। যোগ করলেন, 'তখন লোকজনকে চিনতে পারবেন।' তারপর বললেন, ওঁর প্রস্তাবগুলো যেন আমি ভালো করে বিবেচনা করে দেখি, না ভেবেচিন্তে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা পদক্ষেপ নিলে ওঁর পক্ষে খুবই অপ্রীতিকর হবে। জানালেন, অবিবেচনা আর কোনো কিছু একটা নিয়ে মাতনই অনভিজ্ঞ তরুণদের সর্বনাশ ডেকে আনে, কিন্তু আমার কাছ থেকে একটা অনুকূল সম্মতি পেতে তিনি খুবই চান, অন্যথায় মস্কোর জনৈক বেনিয়ার মেয়েকে বিয়ে করতে তিনি বাধ্য হবেন, কেননা ঐ হারামজাদা ভাইপোটাকে সম্পত্তি দেবেন না বলে তিনি শপথ নিয়েছেন। আমার আপত্তি সত্ত্বেও জোর করে তিনি আমার এম্ব্রয়ডারি ফ্রেমের ওপর পাঁচশ' রুবল রেখে গেছেন। বললেন, টাকাটা কিছু মিষ্টি খাবার জন্যে। বললেন, গ্রামাঞ্চলে গেলে আমি লুচির মতো ফুলে উঠব, ওঁর কাছে থাকব দুধে-ভাতে। উপস্থিত তিনি প্রচন্ড ব্যস্ত, সারা দিন ধরে কাজের ব্যাপারে ছুটোছুটি করেছেন। কাজের ফাঁকে সময় করে আমার এখানে ঘুরে গেলেন। এই বলে বিদায় নিলেন তিনি। এইসব নিয়ে আমি অনেকখন ধরে ভেবে ভেবে কষ্ট পেয়েছি, অবশেষে মন ঠিক করে ফেলেছি। বন্ধু আমার, ওঁকেই আমি বিয়ে করব। ওঁর প্রস্তাবেই সায় দেওয়া আমার উচিত। আমার কলঙ্ক থেকে কেউ যদি আমায় উদ্ধার করতে পারে, আমার সুনাম ফিরিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতে দুঃখ-কষ্ট দুর্ভাগ্যের হাত থেকে কেউ যদি আমায় বাঁচাতে পারে, তবে শুধু উনিই পারবেন। ভবিষ্যতের কাছ থেকে আশা করার মতো

আমার আর কী আছে, চাইবার কী আছে ভাগ্যের কাছে? ফেদোরা বলছে, সুখের সুযোগ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়; এই অবস্থায় সুখ আর কাকে বলে? নিজের দিক থেকে আমি আর কোনো উপায় দেখছি না, বন্ধু আমার। কী করব আমি? খেটে খেটে স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। অবিরাম কাজ করে যেতে আর পারি না। পরের ঘরে চাকরানি হব? মনঃকষ্টে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মারাই যাব, তাছাড়া আমাকে দিয়ে কারো পোষাবেও না। স্বভাবতই আমি রুগ্ণ, কারো না কারো ওপর বোঝা হয়েই থাকতে হবে। জানি, যেখানে যাচ্ছি সেটা কিছু স্বর্গধাম নয়, কিন্তু তাছাড়া করবই বা কী, বন্ধু আমার, কী আমার করার আছে? বাছাবাছির কী আছে আমার?

পরামর্শ আমি অবশ্য সত্যিই চাইছি না আপনার কাছে। ঠিক করেছিলাম নিজেই ভেবে দেখব। যে সিদ্ধান্তের কথা আপনাকে এখন লিখলাম, সেটার বদল হবে না। বিকভ এমনিতেই তাগিদ দিচ্ছেন আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্যে, এটা অবিলম্বে জানিয়ে দেব ওঁকে। উনি বলেছেন, ওঁর কাজকর্ম আছে, ওঁকে চলে যেতে হবে, আজেবাজে ব্যাপারের জন্যে উনি ব্যাপারটা মুলতবি রাখতে রাজি নন। সুখী হব কি হব না, ভগবানই জানেন, আমার ভাগ্য তাঁরই পবিত্র, দুর্জ্ঞেয় ইচ্ছার অধীন। লোকে বলে বিকভ দয়ালু লোক। আমায় তিনি সম্মান দেখাবেন, আমিও হয়ত ওঁকে শ্রদ্ধা করব। আমাদের বিয়ে থেকে আর কী আশা করা সম্ভব?

যা বলবার সব আপনাকে বললাম মাকার আলেক্সেয়েভিচ, জানি, আমার কী কষ্ট তা আপনি সব বুঝবেন। আমার সংকল্প থেকে আমায় ফেরাবার চেষ্টা করবেন না। সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। একাজ করতে কেন বাধ্য হলাম সেটা নিজের মনেই একবার বিচার করে দেখুন। প্রথমটা খুবই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু এখন শান্ত। পরে কী হবে কে জানে। ভগবান যা করেন, যা হবার তাই হোক!..

এইমাত্র বিকভ এলেন, চিঠি শেষ না করেই উঠতে হচ্ছে, যদিও অনেক কথা বলার ছিল। বিকভ ঘরেই রয়েছেন!

ভ. দ.

ভারভারা আলেক্সেয়েভনা আমার!

তাড়াতাড়ি করে আপনার চিঠির উত্তর দিতে বসেছি; আমি আপনাকে বলতে চাইছি যে আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি গো। সবই কেমন যেন তেমনটা নয়... গতকাল আমরা গর্শকভকে কবর দিয়ে এলাম। এটা তাই, ভারেঙ্কা, এটা তাই; বিকভ উদার চরিত্রের মতো কাজ করেছেন, সেইজন্যেই বুঝেছেন গো, আপনিও সম্মতি দিয়েছেন, অবিশ্যি সবই ভগবানের ইচ্ছা, এটা তাই, নিশ্চয় তাই, মানে অবশ্য-অবশ্যই এখানে ভগবানের ইচ্ছা থাকার কথা, স্বর্গীয় স্রষ্টার বিধান আর অবশ্যই ভাগ্যের দুর্জ্ঞেয় আশীর্বাদ, সবই তাই। ফেদোরাও আপনার ভাগ্যের শরিক। এবার নিশ্চয় আপনি সুখী হবেন গো, সুখেস্বচ্ছন্দে থাকবেন আমার সুন্দরী রানী, চোখের মণি আমার, কিন্তু কী জানেন ভারেঙ্কা, এত তাড়াতাড়ি কেন?.. অবিশ্যি হ্যাঁ, বিকভ মশায়ের কাজকর্ম পড়ে আছে। কারই বা কাজকর্ম নেই, ওঁরও থাকতে পারে... উনি যখন আপনাদের বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিলেন, তখন ওঁকে দেখলাম। বেশ সুপুরুষ, সুপুরুষ চেহারা, বলতে কি, খুবই সুপুরুষ। শুধু এসব কিছু ঠিক যেন তেমনটা নয়। উনি সুপুরুষ কিনা সেটা কথা নয়, আসলে আমি বড়ো বিচলিত হয়ে পড়েছি। এবার থেকে আমরা পরস্পরকে চিঠি লিখব তাহলে কেমন করে? আমি, এই আমি লোকটাই বা কী করে একলা থাকবে। আপনি যা বলেছিলেন, সবগুলি কারণ আমি মনে মনে বিচার করে দেখছি, সারাক্ষণ খতিয়ে দেখছি, বিচার করছি। পাণ্ডুলিপিটার বিশ পাতা নকল করছিলাম, এমন সময় কিনা এই ব্যাপার! আপনি তো চলে যাচ্ছেন, নানা রকম কেনা কাটি তো এখন দরকার জুতোটুতো, ফ্রকটক। এদিকে গরোখোভায়াতে একটা দোকান জানা আছে আমার। দোকানটার কথা আপনাকে আগেও বলেছিলাম, মনে আছে? কিন্তু না, না! এ আপনি কী বলছেন গো! এ কী কথা! এখন, এখন আপনার চলে যাওয়া অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব! কত কী জিনিস কিনতে হবে, গাড়িও লাগবে একটা। তার ওপর আবার আবহাওয়াটাও এখন বিছছিরি। দেখুন-না কিরকম অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। একেবারে ভেজা চবচবে! তাছাড়া... তাছাড়া আপনার ঠাণ্ডা লাগবে রানী আমার।

বুকখানায় তো আপনার ঠান্ডা বসে যাবে! অচেনা লোককে আপনার ভয়, তবু চলে যাচ্ছেন। তাহলে আমি কার জন্যে এখানে একলা থাকব? ফেদোরা বলেছে আপনার কপাল ফিরবে... কিন্তু ফেদোরা হল গে একটা হাঙ্গামাবাজ মাগী, শুধু আমার সর্বনাশ করতেই চায়। সান্ধ্য উপাসনায় আসবেন তো? তাহলে আপনাকে একবার দেখবার জন্যে আমিও যাব। একথা সত্যি গো, অতি সত্যি যে আপনি বিদুষী, সহৃদয়া, অনুভূতিপ্রবণা। তাহলেও উনি বরং ব্যবসায়ীর মেয়েটিকেই বিয়ে করুন! আপনার কী মনে হয়, ভারেঙ্কা? ব্যবসায়ীর মেয়েটিকে বিয়ে করলেই কি ভালো হত না? সন্ধ্যে হয়ে এলে ঘণ্টাখানেকের জন্যে আপনার কাছে যাব ভারেঙ্কা। আজকাল তো আঁধার হয়ে আসে তাড়াতাড়ি, এমনি আমি যাব। আজই ঘণ্টাখানেকের জন্যে যাবই গো। এখন আপনি বিকভের জন্যে অপেক্ষা করছেন। উনি চলে গেলেই আমি যাব... সবুর করুন গো, আমি যাচ্ছি...

মাকার দেভুশকিন

২৭শে সেপ্টেম্বর

বন্ধু আমার, মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

শ্রীযুক্ত বিকভ বলছেন, ওলন্দাজ ছিটের তিন ডজন শেমিজ আমার অবশ্যই দরকার। তাই তাড়াতাড়ি দর্জি মেয়ে জোগাড় করতে হবে, যারা দু'ডজন সেলাই করে দিতে পারবে; ওদিকে সময় ভারি কম। শ্রীযুক্ত বিকভ রাগারাগি করছেন, বলছেন, এইসব ন্যাকড়াপাতির ব্যাপারগুলো ভারি ঝামেলা ঘটায়। বিয়ে হতে আর পাঁচ দিন। বিয়ের পরদিনই আমরা চলে যাব। বিকভের ভীষণ তাড়া, বলছেন, আজেবাজে জিনিসে সময় নষ্ট করার কোনো দরকার নেই। আমি এত ছুটোছুটি করেছি যে দাঁড়িয়ে থাকারও শক্তি নেই আর। এক গাদা কাজ বাকি, এসব না হলেই বাঁচতাম। আর একটা কথা: আমাদের কাছে ব্লন্দ আর লেস বিশেষ নেই, আরো কিনতে হবে। শ্রীযুক্ত বিকভ নিজেই যা বলছেন, তিনি চান না যে তাঁর স্ত্রীকে রাঁধুনির মতো দেখাক, ওঁর ভাষায়, 'জমিদার-গিন্নিদের' তিনি 'চোখ-ছানাবড়া

করে দিতে' চান। তাই গরোখোভায়া রাস্তায় মাদাম শিফোনের কাছে গিয়ে আপনি একটু বলবেন, মেয়ে দর্জি পাঠিয়ে দিতে, অথবা দয়া করে উনি নিজেই যেন আসেন। শরীরটা আজ আমার ভালো নেই। আমাদের নতুন বাসাটা ভারি ঠান্ডা আর ভারি অগোছালো। বিকভের যে খুড়ি এখানে আছেন, তিনি এতই বুড়ি এবং অসুস্থ যে ভয় হচ্ছে আমরা চলে যাবার আগেই তিনি না মারা যান। কিন্তু শ্রীযুক্ত বিকভ বলছেন, ও কিছু নয়, উনি ঠিক ভালো হয়ে যাবেন। এখানে সবকিছুই ভারি এলোমেলো। বিকভ এখানে থাকেন না, চাকরবাকরগুলো অনবরত ছুটোছুটি করছে কোথায় কে জানে। মাঝে মাঝে কাজ করবার জন্যে পাওয়া যায় শুধু ফেদোরাকে। বিকভের খানসামার ওপরেই এখানকার ভার — তিন দিন ধরে ওর পাত্তা নেই। বিকভ আসেন প্রতি সকালে, এবং সর্বদাই তাঁর মেজাজ চড়া। কাল বাবুর্চিকে এমন পেটানি দিয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাঙ্গামায় পড়তে হয়েছিল। ...একজনও নেই, যাকে দিয়ে আপনাকে চিঠি পাঠাই। তাই ডাক বাক্সে দিতে হয়েছে! ওহ্ হো, সবচেয়ে জরুরি কথাটাই বলতে ভুলে গেছি: মাদাম শিফোনকে বলে দেবেন যে গতকালকার নমুনা মতো ব্লন্দটাকে যেন বদলে দেন। পারলে তিনি নিজে এসে আমায় নতুন প্যাটার্নটা দেখিয়ে গেলে ভালো হয়। বলবেন, যে সানেজু সম্পর্কে আমার মত বদলেছি: জিনিসটা এম্ব্রয়ডারি করতে হবে ক্রোচার দিয়ে। আর রুমালের ওপর মনোগ্রামগুলো ক্রুশকাঠি দিয়ে বোনা চাই। কথাটা হল ক্রুশকাঠি দিয়ে বোনা, প্লেন সাটিন নয়, বুঝলেন তো? শুধু ভুলবেন না, ক্রুশকাঠি দিয়ে বোনা! আর একটা কথাও প্রায় ভুলেছিলাম আর-কি! ওঁকে একটু বলবেন যে দোহাই ভগবান, ফার কোটের সামনের ঝুলটাও একটু তুলে দিতে হবে আর ভেতরকার গাসেট্-টা হবে পাটকরা, কলারে থাকবে লেসের কুঁচি, কিংবা চওড়া ফালবালা। ভুলবেন না যেন, এটুকু করে দিন আমার জন্যে, মাকার আলেক্সেয়েভিচ।

আপনার

ভ. দ.

পুঃ, আমার বরাতগুলো দিয়ে আপনাকে জ্বালিয়ে মারছি বলে ভারি লজ্জা হচ্ছে। গত পরশু দিনও সারা সকাল ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয়েছে

আপনাকে। কিন্তু কী করি! আমাদের এখানে ব্যবস্থা বলতে কিছুই নেই, তার ওপর আমি অসুস্থ। তাই রাগ করবেন না মাকার আলেক্সেয়েভিচ। এত মন খারাপ করছে! কী হবে, কী যে আমার হবে, মাকার আলেক্সেয়েভিচ বন্ধু আমার, হৃদয়বান, লক্ষ্মীটি আমার! ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে ভয় লাগে। কী একটা যেন জানানি দিচ্ছে, দিন কাটাচ্ছি যেন একটা ঘোরের মধ্যে।

পুঃ পুঃ, যা যা আপনাকে বলেছি, দোহাই ভগবান, ভুলবেন না কিন্তু। ভয় হচ্ছে, গণ্ডগোল করে বসবেন। মনে রাখবেন, প্লেন সাটিন নয়, ক্রুশকাঠি দিয়ে বোনা।

ভ. দ.

২৭শে সেপ্টেম্বর

করুণাময়ী সুচরিতা ভারভারা আলেক্সেয়েভনা!

আপনার বরাত মতো সব ঠিকঠাক করেছি। মাদাম শিফোন বললেন, তিনি নিজেই ক্রুশকাঠি দিয়ে বুনবেন ভাবছিলেন, সেইটাই বেশি ভালো না কি-একটা হবে বললেন, ঠিক মনে নেই, ভালো করে বুঝি নি। তাছাড়া আপনি ফালবালার কথা লিখেছেন। ফালবালা সম্পর্কেও তিনি কী যেন বলেছিলেন, শুধু কী বলেছেন ভুলে গেছি গো। এইটুকু কেবল মনে আছে যে ফালবালা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন অনেক কিছু—কী যে একটি হতচ্ছাড়ি মাগী! ধুৎ, কী এমন ব্যাপার? উনি নিজেই সেসব আপনাকে বললেই পারতেন। আমি এখন একেবারে জেরবার হয়ে গেছি গো, আপিসেও যাই নি। কিন্তু আপনি, লক্ষ্মীটি আমার, খামোকা দুশ্চিন্তা করছেন। আপনার মানসিক শান্তির জন্যে আমি শহরের সবকটি দোকানে ছুটতে রাজি। লিখেছেন, ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে আপনার ভয় লাগে। কিন্তু আজ সাতটার সময় সবই তো জানতে পারবেন। মাদাম শিফোন নিজেই আপনার কাছে আসবেন। তাই হতাশ হবেন না গো, আশা রাখুন, সবই হয়ত মঙ্গলের জন্যেই। কিন্তু ঐ শালার ফালবালা, এহ্, —যতসব ফালবালা আর ফালবালা! আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব গো, নিশ্চয় যাব। এমনিতেই

আপনাদের বাড়ির ফটকের কাছে আমি গিয়েছি দুবার, কিন্তু বিকভ, মানে বলছিলাম শ্রীযুক্ত বিকভ সবসময় এমন রাগী-রাগী যে আমি সত্যিই আর... যাক গে!

মাকার দেভুশকিন

২৮শে সেপ্টেম্বর

করুণাময় মান্যবর মাকার আলেক্সেয়েভিচ!

লক্ষ্মীটি, এক্ষুনি স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে বলুন যে মুক্তো আর পান্না দেওয়া দুল জোড়ার আর দরকার নেই। শ্রীযুক্ত বিকভ বলছেন যে দামটা গলা কাটা। বিরক্তই হয়েছেন উনি। বলছেন, এমনিতেই অনেক খরচা হয়ে গেছে তাঁর, তাঁকে নাকি প্রায় লুঠ করতে শুরু করেছি আমরা। গতকালও তিনি বলেছিলেন, এমন খরচ হবে জানলে তিনি নাকি জড়িয়ে পড়তেন না। বলছেন, বিয়ে হয়ে যাবার পরই আমরা চলে যাব, কোনো রকম অতিথি অভ্যাগতের ঝামেলা করা চলবে না। আমি ঘুরঘুর করে বেড়াব, নাচব, এসব যেন আমি না ভাবি। উৎসব-টুৎসবের এখনো অনেক দেরি আছে। এমনি ধারা ওঁর কথা! অথচ ঈশ্বর জানেন, এসবে আমার বড়ো দরকার! শ্রীযুক্ত বিকভ নিজেই তো এসবের বরাত দিয়েছিলেন। ওঁর কথার জবাব দিতেই সাহস হয় না আমার, ভারি রগচটা। কী হবে আমার?

ভ. দ.

২৮শে সেপ্টেম্বর

ভারভারা আলেক্সেয়েভনা, সোনামণি আমার!

আমি... মানে স্বর্ণকার বলছে ঠিক আছে; আর আমি, প্রথমে নিজের কথা বলতে চাইছিলাম যে আমি অসুস্থ, শয্যা ছেড়ে উঠতে পারছি না। এই তো, এত সব যখন করবার, করা জরুরি, ঠিক সেইসময়েই ঠান্ডা লেগে গেল। শত্রুদের মুখে ছাই! এও আপনাকে জানাই যে আমার নিজের এই

বিপদ চূড়ান্ত করে হুজুর সম্প্রতি ভারি চটে গিয়েছিলেন এমেলিয়ান ইভানোভিচের ওপর, বকতে বকতে একেবারে দম যায় আর-কি, বেচারি। এই সবকিছুই আপনাকে জানালাম আর-কি। আরো কিছু লেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আপনাকে কষ্টে ফেলব বলে ভয় হচ্ছে। আমি তো বোকাসোকা গোছের লোক গো, সাধারণ মানুষ, যা মনে আসে তাই লিখে বসি, হয়ত আপনার কাছে কিছু একটা তেমন—ধুৎ, থাক গে ওসব!

আপনার

মাকার দেভুশকিন

২৯শে সেপ্টেম্বর

ভারভারা আলেক্সেয়েভনা, বাছা আমার!

আজ ফেদোরার সঙ্গে দেখা হয়েছিল গো। ও বললে, কাল আপনার বিয়ে এবং পরশু দিনই আপনারা চলে যাবেন, বিকভ মশাই ঘোড়া ভাড়া করে ফেলেছেন। হুজুর সম্পর্কে খবরটুকু তো আপনাকে আগেই দিয়েছি। ও হ্যাঁ, আরো একটা কথা, গরোখোভায়ার দোকান থেকে যে বিলগুলো পাঠিয়েছে, তা আমি যাচাই করে দেখেছি। সবই ঠিক আছে, তবে খরচা পড়ে গেছে খুব বেশি। কিন্তু তাতে আপনার ওপর বিকভ মশায়ের চটবার কী আছে? যাই হোক, সুখে থাকুন গো। আমার আনন্দই হচ্ছে; হ্যাঁ গো, আপনি সুখে থাকলে আনন্দই হবে আমার। বিয়ের অনুষ্ঠান আমি দেখতে যেতাম গির্জায়, কিন্তু পারছি না, কোমরে ব্যথা। তাহলে চিঠিগুলো সম্পর্কে এবার বলি... কে তাহলে দেয়া-নেয়া করবে চিঠি? হ্যাঁ, ফেদোরার আপনি বড়ো উপকার করেছেন, বন্ধু আমার! খুব ভালো করেছেন। অত্যন্ত সৎকর্ম! আর প্রতিটি সৎকর্মের জন্যে ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবেন। সৎকাজের পুরস্কার আছেই আছে। যে সৎকাজ করেছে, আজ হোক, কাল হোক, ঈশ্বরের ন্যায় তার উপর বর্ষিত হবেই। ভারেঙ্কা গো! অনেক কিছু লেখার ইচ্ছে ছিল, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মিনিট ইচ্ছে করে শুধু লিখি আর লিখি! আপনার ঐ 'বেলকিনের গল্প' বইটা আমার কাছে রয়ে গেছে। এটা আর নেবেন না লক্ষ্মীটি, উপহার দিয়ে যান। বইটা পড়তে যে খুব ইচ্ছে

করছে সেজন্যে ঠিক নয়; কিন্তু বুঝতেই পারছেন গো, শীত আসছে, সন্ধ্যেগুলো হবে বড়ো লম্বা, মনমরা, তখন পড়া যাবে আর-কি। আমার ঘরটা ছেড়ে দিয়ে আপনার পুরনো বাসাটায় উঠে যাব, ফেদোরার ভাড়াটে হব। ভারি সৎ মেয়ে ওটি, ওকে আর ছাড়ব না। তার ওপর খাটতে পারে তো খুব। কাল আপনার খালি ঘরখানা সব খুঁটিয়ে দেখেছি। যেখানে এম্ব্রয়ডারি ফ্রেমখানা থাকত, তার ওপর সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ যা করার সেগুলো তেমনি আছে সেখানে। কেউ ছোঁয় নি, কোণেই রয়ে গেছে। আপনার সেলাইয়ের কাজগুলো দেখলাম, নানান রকমের ন্যাতাকানিও কিছু চোখে পড়ল। আমার একটা চিঠির ওপর আপনি সুতো জড়াতে শুরু করেছিলেন। টেবিলে দেখলাম একটুকরো কাগজ। তাতে লেখা: 'করুণাময় মান্যবর মাকার আলেক্সেয়েভিচ, তাড়াতাড়ি করে লিখছি...' শুধু ওইটুকুই। বোঝা যাচ্ছে, সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক জায়গাটিতেই কেউ আপনার ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। কোণের দিকে, পর্দার আড়ালে আপনার ছোট্ট খাটখানা রয়েছে। ...আদরের পাখি আমার!! কিন্তু বিদায়, বিদায় ভারেঙ্কা। ভগবানের দোহাই, চিঠিটার জবাবে কিছু না কিছু লিখে পাঠান তাড়াতাড়ি।

মাকার দেভুশকিন

৩০শে সেপ্টেম্বর

মাকার আলেক্সেয়েভিচ, অকৃত্রিম বন্ধুবরেষু!

যা হবার হয়ে গেল, পাশার দান যা পড়বার পড়ে গেছে। কপালে কী আছে জানি না, ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই মেনে নেব। কাল চলে যাচ্ছি, শেষ বারের মতো বিদায় অমূল্য বন্ধু আমার, আমার হিতৈষী, আমার আপন জন! আমার জন্যে শোক করবেন না। সুখে থাকুন, আমায় মনে রাখবেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হবে আপনার ওপর! প্রায়ই মনে করব আপনার কথা, আমার ভাবনায়, আমার প্রার্থনায়। এই তাহলে শেষ হয়ে গেল এই দিনগুলো! অতীতের স্মৃতি থেকে সামান্য আনন্দই আমি নিয়ে যাচ্ছি নতুন জীবনে; সেইজন্যে আরো বেশি মূল্যবান হয়ে থাকবে আপনার স্মৃতি, আরো বেশি আপনি মূল্যবান হয়ে রইলেন আমার হৃদয়ের কাছে।

আপনি আমার একমাত্র বন্ধু, এখানে একমাত্র আপনিই আমায় ভালোবাসতেন। আপনি যে আমায় কত ভালোবেসেছেন সে তো আমি সব দেখেছি, সে তো আমি জানি। আমার একটুখানি হাসি, এক লাইন চিঠিতেই আপনি খুশি হয়ে উঠতেন। এবার আমাকে ছাড়াই চলতে হবে আপনাকে। একলা কী করে থাকবেন এখানে! কার ভরসায় থাকবেন আমার সহৃদয়, অমূল্য, একমাত্র বন্ধু! বইটা আর এম্ব্রয়ডারির ফ্রেম আর যে চিঠিটা লিখতে শুরু করেছিলাম, সেগুলো আপনার কাছেই রেখে গেলাম। চিঠির এই শেষ না করা লাইনটা যখন দেখবেন, তখন বাকিটুকু সম্পর্কে আমার কাছ থেকে যা শুনতে চেয়েছিলেন, পড়তে চেয়েছিলেন, যা আমি লিখে উঠি নি, আর এখন কী যে আমি না লিখতাম, সব মনে মনে ভেবে নেবেন! আপনার হতভাগিনী ভাবেঙ্কাকে মনে রাখবেন। খুব ভালোবাসত সে আপনাকে। ফেদোরার আলমারির ওপরকার দেরাজে আপনার সবকটি চিঠি রেখে এসেছি। লিখছেন আপনি অসুস্থ। কিন্তু শ্রীযুক্ত বিকভ কিছুতেই আজ আমায় বেরুতে দিলেন না। আপনাকে চিঠি লিখব বন্ধু আমার, কথা দিচ্ছি বৈকি, কিন্তু ভগবানই জানেন কী হবে। তাই এবার চিরকালের জন্যে বিদায়, বিদায় আমার বন্ধু, আমার আদরের ধন, আমার আপন জন, চিরকালের মতো... আহ্, এখন আপনাকে আলিঙ্গন করার কী ইচ্ছেই না হচ্ছে! বিদায়, বন্ধু আমার, বিদায়। কুশলে থাকুন, সুখে থাকুন! চিরকাল আপনার জন্যে প্রার্থনা করে যাব আমি। ওহ্, এত কষ্ট হচ্ছে, হৃদয় এত ভারাক্রান্ত যে বলার নয়। শ্রীযুক্ত বিকভ ডাকছেন। বিদায়।

আপনার চির-অনুরক্তা

ভ.

পুঃ, কান্নায়, কেবল কান্নায় ভরে উঠছে আমার প্রাণ...
চোখের জলে গলা আটকে আসছে, আমায় বিদীর্ণ করে দিচ্ছে!
হায় ভগবান, কী যে খারাপ লাগছে!
আপনার হতভাগিনী ভারেঙ্কাকে মনে রাখবেন!

ভারেংকা আমার, আমার প্রাণাধিক, অমূল্য ধন আমার!

আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আপনাকে, চলে যাচ্ছেন আপনি! আমার কাছ থেকে আপনাকে কেড়ে না নিয়ে বরং আমার হৃদয়টাকে ওরা ছিঁড়ে নিক! কী করে এটা আপনি পারলেন! কাঁদছেন, আবার চলেও যাচ্ছেন! চোখের জলে ভেজা আপনার চিঠিখানা পেলাম এই মাত্র। তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে আপনি যেতে চান নি, তাহলে ওরা আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে জোর করে... তাহলে আমার জন্যে কষ্ট হচ্ছে আপনার... তাহলে আমায় আপনি ভালোবাসেন! কিন্তু কেমন করে, কার সঙ্গে এখন থাকবেন আপনি? আপনার যে খারাপ লাগাবে, প্রাণ কাঁদবে, হিম হয়ে উঠবে বুক। দুঃখ কুরে কুরে খাবে আপনাকে, দুঃখে বুক ফেটে যাবে। ওখানে যে মরণ হবে আপনার, সোঁদা মাটিতে ওরা গোর দেবে, কেউ থাকবে না যে কাঁদবে। বিকভ মশাই কেবল ব্যস্ত থাকবেন খরগোশ শিকারে... হায় হায় গো, কী করে বসলেন! এমন একটা সিদ্ধান্ত আপনি কী করে নিতে পারলেন! কী করছেন! কী করলেন, কী করলেন আপনি নিজের ওপরেই! ওরা তো আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে কবরে, ওরা যে আপনাকে শুকিয়ে মারবে, রানী আমার। আপনি যে গো একটা পালকের মতো পলকা। আর আমিই বা কোথায় ছিলাম এতক্ষণ? কী করছিলাম আমি বোকার মতো? আমি তো বুঝেছিলাম যে ছেলেমানুষ একটা ঝোঁক ধরেছে, অসুখ করেছে ওর! আমি যদি সোজাসুজি — কিন্তু না! বোকার মতো কাজ করেছি আমি। কিছু ভাবি নি, কিছু দেখতে চাই নি, যেন ওইটেই ঠিক, যেন ব্যাপারটার সঙ্গে আমার কোনো সংস্রব নেই। তার ওপর আবার ছুটলাম ফালবালার পেছনে!.. না ভারেংকা, বিছানা ছেড়ে উঠব আমি, কাল সম্ভবত আমি সুস্থ হয়ে যাব, বিছানা ছেড়ে উঠবই! আপনার গাড়ির চাকার তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি, যেতে দেব না! সত্যি, এটা কী হচ্ছে? কী অধিকার ওদের! আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাব আমি — আমায় যদি না নেন তাহলে আপনার গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটব আমি। যতক্ষণ শক্তি আছি, দম না ফুরিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ ছুটে যাব! জানেন কি, কোথায় আপনি চলেছেন গো? জানেন না যখন, তখন আমায় জিগ্যেস করতে পারতেন! ওটা যে স্তেপ অঞ্চল, ন্যাড়া স্তেপ, আমার এই হাতখানার তালুর মতোই ন্যাড়া!

আছে সেখানে শুধু বেদরদী মাগী আর চোয়াড়ে চোয়াড়ে মাতাল চাষাভুষো। গাছের পাতাও সেখানে এখন ঝরে পড়ছে! কেবল বৃষ্টি আর ঠান্ডা। চলেছেন সেই রকম একটা জায়গায়! বিকভ মশায়ের অবিশ্যি কাজ থাকবে, মেতে রইবেন তাঁর খরগোশ নিয়ে, কিন্তু আপনি? আপনি কি গো জমিদারগিন্নি হয়েই থাকতে চান?.. তাহলে দেবী আমার, নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। জমিদারগিন্নি বলে আপনাকে মনে হয় কি?.. এ কেমন করে হতে পারে ভারেঙ্কা! তাহলে এবার কার কাছে গো চিঠি লিখব আমি? আপনি শুধু একবার ভেবে-চিন্তে দেখুন গো, কার কাছে লোকটা এবার চিঠি লিখবে? কাকে তখন আমার আদরিণী বলে ডাকব গো, ঠিক ওই নাম ধরে? তখন কোথায় আপনাকে পাব বলুন দেবী আমার? নিশ্চয় আমি আর বাঁচব না ভারেঙ্কা, নিশ্চয় মারা যাব। এ শোক আমার বুকে আর সইবে না। দিব্য জ্যোতির মতো আপনাকে আমি ভালোবাসতাম, ভালোবাসতাম আমার নিজের মেয়ের মতো, আপনার সবকিছুই আমি ভালোবেসেছি, গো, আমি যে বেঁচে ছিলাম সে শুধু আপনার জন্যেই! আমি চাকরি করেছি, দলিল নকল করেছি, হেঁটেহুঁটে বেড়িয়েছি, আর সবকিছু অন্তরঙ্গ চিঠি লিখে জানিয়েছি শুধু এইজন্যে যে আপনি থাকবেন আমার উল্টো দিকে, কাছাকাছি; আপনি হয়ত সেকথা কখনো বোঝেন নি, কিন্তু এই হল সত্যি কথা! হ্যাঁ, শুনুন গো, আপনি আমাদের কাছ থেকে কী করে চলে যেতে পারছেন, এ নিয়ে কথা তুলেছেন। লক্ষ্মীটি আমার, এ যে চলে না, এ একেবারেই অসম্ভব! একথাই উঠতে পারে না। বৃষ্টি পড়ছে — আপনি তো দুবলা, নির্ঘাৎ ঠান্ডা লেগে যাবে। ভারি আপনাদের গাড়িটা ভিজে সপসপ করবে, নিশ্চয় করবে, কোনো সন্দেহ নেই। শহর ছেড়ে যেতে না যেতেই ও গাড়ি ভেঙে পড়বে, চক্রান্ত করেই ভেঙে পড়বে। এখানে পিটারবুর্গে তো গাড়ি বানায় একেবারে জঘন্য রকমের! ওই গাড়িওলাদের সবাইকে আমি জানি। ওরা শুধু ফ্যাশন আর কিছু একটা খেলনা ঝোলাতেই ওস্তাদ, মজবুত করে বানাতে জানে না। দিব্যি দিয়ে বলছি, সবই বেমজবুত করে বানায়! বিকভ মশায়ের কাছে আমি হাঁটু গেড়ে বসব গো, সবকিছু প্রমাণ করে দেব, সবকিছু দেখিয়ে দেব! আর আপনিও মধুময়ী আমার, আপনিও ওঁকে বুঝিয়ে দিন! ওঁকে বলবেন যে যেতে পারেন না, এখানেই থাকবেন!.. হায়, হায়, কেন যে উনি

মস্কোর সেই ব্যবসায়ীর মেয়েটিকে বিয়ে করলেন না! বেনিয়ার মেয়েটিই তাঁর পক্ষে ভালো, অনেক ভালো হত তাহলে। কেন সেটা আমি তো জানি! তাহলে তো আপনি এখানে থাকতে পারতেন, আমার কাছে! সত্যি বিকভের কী দরকার গো আপনার? হঠাৎ উনি আপনার কাছে আদরণীয় হয়ে উঠলেন কেমন করে? উনি আপনার জন্যে ফালবালা-টালবালা কীসব কিনছেন বলেই হয়ত? দূর ছাই, ফালবালা! কী দরকার গো ফালবালার? কোনো মানে হয় না তার! প্রশ্নটা তো ফালবালা নিয়ে নয়, সে তো ন্যাতাপাতি, এ হল একটা জীবন নিয়ে ব্যাপার। আপনাকে বলি শুনুন, আমার মাইনে পাওয়া পর্যন্ত একটু সবুর করুন, ফালবালা আপনাকে কিনে দেব গো। আমারও চেনা দোকান আছে একটা। শুধু মাইনে পাওয়া পর্যন্ত একটু সবুর করুন, আমার দেবী! ও ভারেঙ্কা, হায় ভগবান! তাহলে সত্যিই আপনি শ্রীযুক্ত বিকভের সঙ্গে চলে যাবেন স্তেপাঞ্চলে? চিরকালের মতো চলে যাবেন? হায় ভারেঙ্কা! না, না! ফের চিঠি লিখবেন আপনি, সবকিছু লিখবেন, আর চলে গেলে সেখান থেকে চিঠি পাঠাবেন। নইলে, দেবী আমার, এইটেই যে হয়ে দাঁড়াবে শেষ চিঠি; সে যে অসম্ভব! এ চিঠি যে শেষ চিঠি হতেই পারে না। সে কী করে হয়? কথা নেই, বার্তা নেই— হঠাৎ শেষ চিঠি! আমি আপনাকে লিখেই যাব। আপনিও আমায় লিখবেন... আমার স্টাইলটা সবে গড়ে উঠতে শুরু করেছে... কিন্তু আদরিণী আমার, স্টাইলে কী এসে যায়! কী বলছি, কী লিখছি কিছু খেয়ালই নেই আমার, পড়েও দেখছি না, মাথা ঘামাচ্ছি না স্টাইল নিয়ে, শুধু লিখে, কেবল লিখে যেতে পারলেই আমার হল... আদরিণী আমার, অন্তরের ধন আমার, আমার প্রিয়তমা!

শুক্লা যামিনী

ভাবাকুল প্রেমাখ্যান

(স্বপ্নজীবীর স্মৃতি থেকে)

...নাকি, এই বলে জন্ম ওর
ক্ষণিক হলেও নয় হোক
থাকবে প্রাণের কাছে তোর?..

ইভান তুর্গেনেভ

প্রথম রাত্রি

অপূর্ব রাত, প্রিয় পাঠক, এমন রাত হতে পারে কেবল যখন আমরা তরুণ। আকাশ তারায় এমন ছাওয়া, এমন ফরসা যে সেদিকে তাকিয়ে আপনা থেকেই নিজেকে জিগ্যেস করতে হয়: এমন আকাশের নিচে হরেক রকমের বদরাগী খামখেয়ালী লোক থাকতে পারে কি? প্রিয় পাঠক, এটাও তারুণ্যের একটা প্রশ্ন, অতিশয় তারুণ্যের, কিন্তু ভগবান প্রশ্নটা একটু ঘন ঘন আপনাদের মনে জাগান!.. খামখেয়ালী আর যতসব বদরাগী লোকের কথা বলতে গিয়ে আমার সেদিনকার সদাচরণের কথা মনে না করে পারি না। একেবারে সকাল থেকেই কেমন একটা অদ্ভুত মন-পোড়ানি পেয়ে বসেছিল আমায়। হঠাৎ আমার মনে হল সবাই আমায় একা ফেলে চলে যাচ্ছে, সবাই সরে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে। সকলেই অবশ্য সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করতে পারে: এই সবাই-টা কারা? কেননা এই যে আট বছর পিটারবুর্গে আছি, তার ভেতর একটিও পরিচিত জোটাতে পারি নি। কিন্তু পরিচিতের আমার কী দরকার? এমনিতেই তো গোটা পিটারবুর্গই আমার পরিচিত। সেইজন্যেই আমার মনে হল গোটা পিটারবুর্গ যখন সচকিত হয়ে উঠে হঠাৎ চলে গেল পল্লীভবনে, তখন সবাই আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। একা পড়ে থাকতে ভয় হল আমার, তিন-তিনটে দিন আমি শহরে ঘুরে বেড়িয়েছি ভয়ানক মন-পোড়ানিতে, একেবারেই ভেবে পাচ্ছিলাম না কী হচ্ছে আমার। নেভস্কি সড়ক বা পার্ক দিয়েই যাই বা নদী তীরের

রাস্তায় পায়চারিই করি, সারা বছর ওই একই জায়গায় নির্দিষ্ট একটা সময়ে যাদের দেখতে আমি অভ্যস্ত তেমন চেনা মুখ একটিও নেই। ওরা অবিশ্যি আমায় জানে না, কিন্তু আমি তো ওদের জানি; ওদের মুখচ্ছবি প্রায় খুঁটিয়ে দেখেছি, যখন ওরা হাসিখুশি তখন মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি আর মুখ ওদের আঁধার দেখলে একেবারে মাটি হয়ে যায় মেজাজ। একটি বৃদ্ধের সঙ্গে আমি প্রায় বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছিলাম, প্রতিদিন নির্দিষ্ট একটা সময়ে ওঁকে দেখা যেত ফন্তানকায়। মুখের ভাবটা গুরুগম্ভীর, চিন্তামগ্ন; কেবলি বিড়বিড় করে আপন মনে, বাঁ হাতটা ঝাঁকায়, ডান হাতে কাঠির মতো একটা ছড়ি, হাতলটা গিল্টি করা। আমাকেও উনি লক্ষ্য করেছিলেন, মনে মনে আমাকে নিয়ে তাঁর একটা গরজ ছিল। ফন্তানকার ঐ জায়গাটায়, ঐ সময়টায় আমি যদি না থাকি, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওঁর মন খারাপ হয়ে যাবে। এইজন্যেই আমরা মাঝে মাঝে প্রায় যেন মাথা নুইয়ে সম্ভাষণ জানাতাম পরস্পরকে, বিশেষ করে দুজনেরই মেজাজ যখন ভালো থাকত। এই তো সেদিন, পুরো দু'দিন আমাদের দেখা না হবার পর তৃতীয় দিনে যখন সাক্ষাৎ হল, আমরা তখন টুপি তুলে অভিবাদন করতেই যাচ্ছিলাম আর-কি, তবে সময় থাকতেই সচেতন হয়ে হাত নামিয়ে নিলাম, বন্ধু সন্নিধানে দরদী বন্ধুর মতো চলে গেলাম আমরা। ঘরবাড়িগুলোও আমার পরিচিত। রাস্তা দিয়ে যখন যাই, প্রতিটি বাড়ি যেন ছুটে আসে আমার সামনে, সমস্ত জানলাগুলো দিয়ে চেয়ে দেখে আমার দিকে, যেন এই বলে উঠবে: 'নমস্কার, কেমন আছেন? আমি তো ভগবানের কৃপায় ভালোই আছি, মে মাসে আরো এক তলা উঠবে আমার।' কিংবা: 'কেমন আছেন? কাল তো আমার মেরামতি।' অথবা: 'আমি প্রায় পুড়ে যাচ্ছিলাম, ভয় পেয়েছিলাম ভয়ানক,' ইত্যাদি। ওদের ভেতর অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে আমার। এই গ্রীষ্মে তাদের একজনের চিকিৎসা হবার কথা স্থপতির কাছে। ইচ্ছে করে রোজ যাব তার কাছে, ভগবান করুন, খানিকটা চিকিৎসা যেন ওর হয়। তবে কখনোই ভুলব না সুন্দর একটি হালকা গোলাপী রঙের ছোট্ট একটি বাড়ির কাহিনী। এমন মিষ্টি দালান-বাড়ি এটি, এমন সাদরে চাইত আমার দিকে, তার বেঢপ পড়শীদের দিকে এমন গরবভরে তাকাত যে ওর কাছ দিয়ে যাবার সময় আমার বুক ভরে উঠত আনন্দে। হঠাৎ গত সপ্তাহে রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে সখার দিকে চাইতেই কানে এল করুণ অনুযোগ: 'আমাকে ওরা হলদে

রঙে ছোপাচ্ছে!' দুর্বৃত্ত! বর্বর! থাম, কার্নিস—কিছুতেই ওদের মায়া নেই, আমার সখা হলুদ হয়ে উঠল ক্যানারি পাখির মতো। এব্যাপারে পিত্তি আমার প্রায় জ্বলে গিয়েছিল, কদাকার করে তোলা বেচারিটির সঙ্গে দেখা করার সামর্থ্য আমার হয় নি এখনো—ওকে রাঙানো হয়েছে স্বর্গতলের পীত সাম্রাজ্যের রঙে।

তাহলে বুঝতে পারছেন পাঠক, কিভাবে গোটা পিটারবুর্গের সঙ্গে আমার পরিচয়।

আগেই বলেছি, কারণটা ধরতে না পারা পর্যন্ত তিন-তিনটে দিন আমায় জ্বালিয়েছে অস্থিরতায়। রাস্তাতেও খারাপ লাগত, (এটা নেই, সেটা নেই, ওটাই বা গেল কোথায়?)—বাড়িতেও পাগলা-পাগলা লাগে নিজেকে। দু'দুটো সন্ধে ধরে আমি বোঝার চেষ্টা করলাম কী নেই আমার কোণটিতে? এতে থাকতে এমন বিদঘুটে লাগে কেন? কিছু ভেবে না পেয়ে তাকিয়ে দেখলাম আমার ধোঁয়াটে সবুজ দেয়াল, মাকড়শার জাল ঝোলা সিলিং, অতি সাফল্যের সঙ্গে মাত্রিওনা এগুলিকে পালন করেছে, পরীক্ষা করলাম আসবাবপত্র, যাচিয়ে দেখলাম প্রত্যেকটা চেয়ার, মনে হল গেরোটা এখানেই নয় তো? (কেননা আমার অন্তত একটা চেয়ারও যদি কাল যেমন ছিল তেমনটা না থাকে, তাহলে উদ্‌ভ্রান্ত লাগে আমার), চাইলাম জানলার দিকে, সবই বৃথা গেল... উপকার হল না একটুও! ভাবলাম মাত্রিওনাকে ডেকে ওই মাকড়শার জাল আর সাধারণভাবেই অবহেলার জন্যে কিছু পিতৃসুলভ ধমক দিই; কিন্তু সে শুধু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে চলে গেল কোনো জবাব না দিয়ে, ফলে মাকড়শার জাল এখনো পর্যন্ত নিরাপদে ঝুলছে তার স্বস্থানে। অবশেষে কেবল আজ সকালে ঠাহর হল ব্যাপারটা কী। এহ্‌! ওরা যে সবাই আমার কাছ থেকে চম্পট দিচ্ছে তাদের পল্লীভবনে! গতানুগতিক ওই শব্দটা মাপ করুন, কিন্তু কথার ছিরি-ছাঁদ নিয়ে ভাবার অবকাশ ছিল না আমার, কেননা পিটারবুর্গে যারাই ছিল, সবাই হয় চলে গেছে নয় পল্লীভবনে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে; কেননা ভারিক্কি চেহারার মান্যগণ্য প্রতিটি ভদ্রসন্তান গাড়ি ভাড়া করে আমার চোখের সামনে তক্ষুনি পরিণত হচ্ছেন মান্যগণ্য পরিবার-কর্তায় যিনি দৈনন্দিন চাকুরির পর ঝাড়া হাত-পায়ে রওনা দিচ্ছেন পরিবারের গর্ভে, পল্লীভবনে; কেননা প্রতিটি পথচারীরই এখন এমন একটা ভাব যেন কারো সঙ্গে দেখা

হলেই তাকে বলে বসবে: 'আমরা মশাই এখানে আছি এই একটু পথে পড়েছে বলে, ঘণ্টাদুয়েক বাদেই আমরা চলে যাব পল্লীভবনে।' হয়ত জানলা খুলল, চিনির মতো শাদা সরু সরু আঙুলের টোকা তাতে পড়ল প্রথমে, সুন্দরী একটি মেয়ে মুখ বারিয়ে ডাকল ফুলগাছের টব-বাহককে, তক্ষুনি আমি বুঝি, আমার মনে হয় এসব ফুলগাছ কেনা হচ্ছে এমনি-এমনি, অর্থাৎ বসন্ত কালে শহরের গুমোট ফ্ল্যাটে ফুল উপভোগ করার জন্যে নয়, খুব শিগগিরই ওরা চলে যাবে বাগান-বাড়িতে, সঙ্গে নিয়ে যাবে গাছ। শুধু তাই নয়, আমার এই বিশেষ ধরনের নতুন আবিষ্কারে আমি এতই সাফল্য লাভ করেছি যে শুধু এক নজরেই নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারি কে কোন বাগান-বাড়িতে যাচ্ছে। কামেন্নি আর আপতেকারস্কি দ্বীপে যারা থাকে, অথবা পিটারগফ রাস্তায়, তাদের বৈশিষ্ট্য পরিশীলিত মার্জিত চাল-চলন, ফুলবাবু-গোছের গ্রীষ্মকালীন পোশাক আর চমৎকার ঘোড়ার গাড়ি, যা চেপে তারা এসেছে শহরে। পারগোলোভ এবং আরো দূরের অধিবাসীরা এক নজরেই 'অভিভূত' করে তাদের বুদ্ধিমত্তা আর রাশভারিত্বে। ক্রেস্তভস্কি দ্বীপের বাসিন্দাদের বৈশিষ্ট্য অবিচলিত হাসিখুশি ভাব। যাই দেখি, যত রাজ্যের তুর্কী অথবা অ-তুর্কী আসবাবপত্র, চেয়ার টেবিল সোফা এবং অন্যান্য সাংসারিক পোঁটলা-পুঁটলি এবং তদুপরি উপবিষ্ট, চোখের মণির মতো বাবুর দৌলত রক্ষয়িত্রী থুত্থুড়ে রাঁধুনিকে নিয়ে মালপত্রের কাছে আলস্যে লাগাম হাতে ধরে মাল-বওয়া ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের লম্বা মিছিল; অথবা নেভা কি ফন্তানকায়, চের্নায়া নদী বা দ্বীপগুলোর দিকে পাড়ি দেওয়া গার্হস্থ্য মালপত্রে বোঝাই নৌকো; সবই আমার চোখে দশ গুণ, শত গুণ বড়ো হয়ে ওঠে; মনে হয় সবাই উঠে পড়ে কাতারে কাতারে বাগান-বাড়িতে চলেছে; মনে হয় সমস্ত পিটারবুর্গ পরিণত হতে চলেছে জনহীন মরুভূমিতে; ফলে শেষ পর্যন্ত কেমন লজ্জা হয়, ক্ষোভ হয়, মন খারাপ হয়ে যায়। আমার পক্ষে বাগান-বাড়িতে যাবার কোনো কারণই নেই, কোথাও যাবার নেই। আমি অবিশ্য প্রতিটি মালগাড়ির সঙ্গে, গাড়ি ভাড়া করা মান্যগণ্য চেহারার প্রতিটি বাবুর সঙ্গে বাগান-বাড়িতে যেতে রাজি। কিন্তু কেউই একেবারেই নেমন্তন্ন করল না আমায়। আমার কথা যেন ওরা ভুলে গেছে, আমি যেন সত্যিই ওদের পর!

হাঁটাহাঁটি করেছিলাম অনেক, এবং অনেকখন ধরে, ফলে আমার

অভ্যাসমতো ভুলেই গিয়েছিলাম কোথায় আছি আমি, হঠাৎ চমক ভাঙল তোরণের কাছে। মুহূর্তে মন খুশি হয়ে উঠল আমার, ফটক পেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম বীজ বোনা ক্ষেতে, মাঠে। ক্লান্তি বোধ হয় নি, শুধু আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে টের পাচ্ছিলাম যে কী একটা বোঝা যেন নেমে যাচ্ছে। পথচারীরা সবাই এমন অমায়িকভাবে চাইছিল যে সম্ভাষণে মাথা নোয়াই, সবারই কেমন যেন আনন্দ, সবাই সিগ্যারেট ফুঁকছিল। আমারও বেশ আনন্দ হল যা আগে কখনো হয় নি। ঠিক যেন আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছি ইতালিতে, আমি আধা-অসুস্থ শহুরে, তার দেয়ালে ঘেরাও হয়ে প্রায় হাঁপিয়ে উঠছি, এমন একটা লোককে প্রচন্ড অভিভূত করে ফেলেছিল প্রকৃতি।

আমাদের পিটারবুর্গের প্রকৃতিতে অনির্বচনীয় মর্মস্পর্শী কিছু একটা আছে যখন বসন্ত সমাগমে হঠাৎ সে তার সমস্ত সামর্থ্য মেলে ধরে, আকাশ থেকে পাওয়া সমস্ত উপহার, পল্লবিত হয়ে সেজেগুজে ওঠে বিচিত্র ফুলের বাহারে। আমায় তা যেন আচম্বিতে মনে করিয়ে দেয় কোনো রুগ্ণ, ক্ষয়গ্রস্তা কুমারীর কথা, যাকে দেখে কখনো করুণা হয়, কখনো-বা সমবেদনায় মেশা স্নেহ, কখনো স্রেফ নজরই করি না, হঠাৎ এক মুহূর্তে, কেমন যেন অজান্তে, অব্যাখ্যাত অলৌকিক উপায়ে সে পরিণত হল অপরূপায়, সবিস্ময়ে, দোলায়িত চিত্তে নিজেকে শুধাতে হয়: বিষণ্ণ আত্মমগ্ন এই চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল কোন শক্তিতে? ফ্যাকাশে, রোগাটে গালদুটোয় রক্তের উচ্ছ্বাস এল কী করে? মুখের এই কোমল আদল কেমন করে ছেয়ে গেল আবেগে? কেন দুরদুর করে উঠছে ওর বুক? বেচারি মেয়েটির মুখে হঠাৎ এমন শক্তি, সঞ্জীবনী সৌন্দর্য এল কোথা থেকে, কে তার মুখে এমন হাসি ফুটিয়েছে, এমন ঝকমকে, খিলখিল করে কে হাসাচ্ছে তাকে? এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি, কারো সন্ধান করি, অনুমান করি। ...কিন্তু কিছুক্ষণ যেতেই, হয়ত কালই ফের চোখে পড়বে আগের মতোই সেই আনমনা, চিন্তাক্লিষ্ট দৃষ্টিপাত, সেই বিবর্ণ মুখচ্ছবি, অঙ্গভঙ্গিতে সেই বশীভূত সঙ্কোচের ছাপ, এমনকি অনুশোচনা, এমনকি মরণাধিক মনঃকষ্ট আর মুহূর্তের আহ্লাদের জন্যে যন্ত্রণার চিহ্ন।... আর এই ভেবে তখন কষ্ট হয় যে এত অচিরে, এত অমোঘে নেতিয়ে পড়ল ক্ষণিক লাবণ্য, এত অলীকতায় এত মিছেই সে জ্বলজ্বল করে উঠেছিল যে ওকে ভালোবাসার সময়ই পাওয়া গেল না...

তাহলেও যামিনী আমার দিবসের চেয়েও ভালো! ব্যাপারটা এই।

আমি শহরে ফিরেছিলাম বেশ রাত করে, বাসার দিকে যখন যাচ্ছি, তখনই দশটার ঘণ্টা বাজছে। আমার পথটা গিয়েছিল নদীতীরের ক্যান্যাল বরাবর, এই সময় সেখানে একটা লোকেরও দেখা পাওয়া যায় না। আমি অবশ্য থাকি শহরের সুদূর একটা অঞ্চলে। যেতে যেতে গান গাইছিলাম আমি, কেননা প্রাণে সুখ থাকলে আমি নির্ঘাৎ আপন মনে কিছু একটা গুণগুণ করে থাকি যা করে প্রত্যেকটি সুখী লোক যার বন্ধু নেই, ভালোরকম পরিচিতও নেই কেউ, যার সুখের মুহূর্তে সে সুখ অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেবার মতো কেউ মেলে না। হঠাৎ অতি অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটল আমার।

এক পাশে ক্যান্যালের রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল একজন নারী; বোঝা যায়, জাফরির ওপর কনুইয়ে ভর দিয়ে সে একান্ত মনোযোগে তাকিয়ে দেখছিল ক্যান্যালের ঘোলা জল। মাথায় তার ভারি মিষ্টি একটা হলুদ টুপি, গায়ে রঙ্গিলা ঢঙের আংরাখা। ভাবলাম: 'মেয়েটির চুল নিশ্চয় কালো।' মনে হয় আমার পদশব্দ তার কানে যায় নি। যখন আমি দম বন্ধ করে প্রচণ্ড দুরুদুরু বুকে ওর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, তখন সে নড়লে না পর্যন্ত। ভাবলাম: 'আশ্চর্য! নিশ্চয় কিছু একটা নিয়ে অত্যন্ত ভাবিত।' হঠাৎ নিথর হয়ে থেমে গেলাম। শুনলাম চাপা একটা কান্না। না! ভুল হয় নি আমার: মেয়েটি কাঁদছে, মিনিটে মিনিটে বেড়ে উঠছে তার ফোঁপানি। ঈশ্বর! বুক আমার আড়ষ্ট হয়ে এল। মেয়েদের কাছে আমি যতই সংকোচ বোধ করি না কেন, কিন্তু সময়টা যে অন্যরকম!.. আমি ফিরে এগিয়ে গেলাম ওর দিকে এবং অবশ্যই বলতাম: 'ভদ্রে!' যদি অবশ্য না জানা থাকত যে এই সম্ভাষণটি হাজার বার উচ্চারিত হয়েছে রুশী উচ্চ সমাজের সমস্ত উপন্যাসে। শুধু এই ব্যাপারটাই আমায় থামাল। কিন্তু আমি যখন উপযুক্ত কথা হাতড়াচ্ছি, মেয়েটির ততক্ষণে টনক নড়ল, সম্বিত ফিরল, চোখ নিচু করে আমার পাশ কাটিয়ে চলে যেতে লাগল তীরের রাস্তা দিয়ে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই ওর পিছু নিলাম, কিন্তু ও সেটা টের পেলে, তীর ছেড়ে রাস্তা পার হয়ে হাঁটিতে শুরু করল ফুটপাথ দিয়ে। রাস্তা পার হবার সাহস আমার ছিল না। ধরা পড়া পাখির মতো বুক আমার তিরতির করছিল। হঠাৎ একটা ঘটনা সহায় হল আমার।

ফুটপাথের অন্য দিক থেকে আমার অপরিচিতার অল্প দূরে দেখা দিলেন ফ্রক কোট পরা ভারিক্কি বয়সের এক ভদ্রলোক, তবে চলনটিও যে তাঁর ভারিক্কি এমন কথা বলা চলে না। সাবধানে দেয়ালে ভর দিয়ে তিনি আসছিলেন টলতে টলতে। মেয়েটি কিন্তু যাচ্ছিল তীরবেগে, তাড়াহুড়ো করে, ভয়ে ভয়ে, যেভাবে যায় তেমন সমস্ত মেয়েই যারা চায় না যে কেউ রাত্রে তাকে বাড়ি পেঁাছে দেবার প্রস্তাব দেবে। এবং আমার ভাগ্য তাঁকে অস্বাভাবিক একটা উপায় জুগিয়ে না দিলে টলায়মান ভদ্রলোকটি অবশ্যই তার পাল্লা ধরতে পারতেন না। হঠাৎ একটি কথাও না বলে ভদ্রলোক প্রবর ঠ্যাং তুলে ছুটতে লাগলেন আমার অপরিচিতার পাল্লা ধরবার জন্যে। মেয়েটি যাচ্ছিল বায়ুবেগে, কিন্তু দোলায়মান ভদ্রলোকটি ক্রমশ সঙ্গ ধরে ফেলল তার; চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি ,এবং... এই দফায় ডান হাতে আমার খাশা একটি ডাল ভাঙা লাঠি থাকায় ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানালাম আমি। মুহূর্তে আমি হাজির হলাম ফুটপাথের ওই দিকটায়, অনাহূত ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ বুঝলেন কী ব্যাপার, অকাট্য যুক্তিটা বিবেচনা করলেন, চুপ করে রইলেন এবং থেকে গেলেন, কেবল আমরা যখন সেখান থেকে অনেক দূরে চলে গেছি, তখন বেশ জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ করলেন আমার বিরুদ্ধে। তবে কথাগুলো বিশেষ পেঁাছল না আমাদের কাছে।

অপরিচিতাকে বললাম, 'আমার হাত ধরুন, আমাদের পেছু লাগতে ওঁর আর সাহস হবে না।'

নীরবে সে হাত বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে, উত্তেজনায় এবং ভয়ে তখনো তা কাঁপছে। ওহ্, অনাহূত ভদ্রলোকটির প্রতি সেই মুহূর্তে কী কৃতজ্ঞতাই না বোধ করেছিলাম আমি! একটু চেয়ে দেখলাম মেয়েটির দিকে; ভারি মিষ্টি চেহারা, চুল কালো — ঠিকই ধরেছিলাম আমি। তার কালো চোখের পাতায় তখনো চিকচিক করছে জল, সেটা খানিক আগের ভয়বশত নাকি আগের কোনো দুঃখভোগের জন্যে — জানি না। কিন্তু ঠোঁটে ততক্ষণে হাসির ঝলক দিয়েছে। সেও আমার দিকে চুপিসাড়ে চেয়ে সামান্য রাঙা হয়ে চোখ নামিয়ে নিলে।

'দেখলেন তো, কেন তখন আমার কাছ থেকে পালালেন? আমি ওখানে থাকলে কিছুই ঘটত না...'

'কিন্তু আমি তো আপনাকে জানতাম না। ভেবেছিলাম আপনিও...'

'আর এখন কি আমায় জেনে ফেলেছেন?'

'খানিকটা। যেমন ধরুন, কেন আপনি কাঁপছেন?'

'সত্যি আপনি এক নজরেই ধরে ফেলেছেন!' জবাব দিলাম আমি এই উল্লাসে যে মেয়েটি বুদ্ধিমতী: রূপ থাকলে তাতে কোনো বাধা হয় না। 'হ্যাঁ, দেখেই আপনি ধরতে পেরেছেন লোকটা কে? ঠিকই, মেয়েদের কাছে আমি সংকোচ বোধ করি, আপত্তি করব না যে ঠিক সুস্থির লাগছে না আমার, এক মিনিট আগে ওই ভদ্রলোকের ভয়ে আপনার যেমন হয়েছিল তার চেয়ে কম নয়।... এখন কেমন একটা ভয় আমায় পেয়ে বসেছে। এ যেন একটা স্বপ্ন আর স্বপ্নের মধ্যেও আমি ভাবতে পারি নি যে আমি কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা কইব কখনো।'

'সেকি? সত্যি?'

'হ্যাঁ, আমার হাত যে কাঁপছে সেটা এই কারণে যে আপনার মতো এমন সুন্দর ছোট্ট কোনো হাত কখনো আমার হাত ধরে নি। মেয়েদের কাছ থেকে আমি একেবারে সরে গেছি; মানে, তাদের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে পারি নি কখনোই। আমি যে একা... তাদের সঙ্গে কী করে কথা কইতে হয় তাও জানি না। যেমন এই এখন — বুঝতে পারছি না কোনো একটা বাজে কথা বলে ফেললাম কি? সোজাসুজি বলুন; আপনাকে জানিয়ে রাখছি, অভিমান আমার নেই...'

'না, না, তেমন কিছুই বলেন নি; বরং উল্টো। আর আমি খোলাখুলি বলি এই যদি আপনি চান, তাহলে বলব, এরকম সংকোচ মেয়েদের ভালো লাগে, যদি আরো জানতে চান, এটা আমারও ভালো লাগে, একেবারে বাড়ি না পৌঁছনো পর্যন্ত আপনাকে ছাড়ছি না।'

আনন্দে রুদ্ধশ্বাসে আমি আরম্ভ করলাম, 'আপনি আমাকে নিয়ে যা শুরু করছেন তাতে তক্ষুনি আমার সংকোচ কেটে যাবে, আর তখন — বিদায় আমার সমস্ত অস্ত্র!..'

'অস্ত্র? কিসের অস্ত্র, কী জন্যে? এটা সত্যি খারাপ।'

'ঘাট মানছি, আর বলব না, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে কথাটা; কিন্তু কী করে আপনি চাইছেন যে এমন মুহূর্তে ইচ্ছে হবে না...'

'ইচ্ছে হবে না যে মনে ধরি, তাই কি?'

'মানে, হ্যাঁ; শুধু ভগবানের দোহাই, একটু নরম হোন। ভেবে দেখুন,

আমি লোকটা কে! বয়স আমার ছাব্বিশ বছর, অথচ কাউকে কখনো দেখি নি। তাহলে কী করে আমি ভালোভাবে, গুছিয়ে, প্রাসঙ্গিক কথা কইতে পারি? সবকিছু খোলাখুলি বাইরে বেরিয়ে এলে তো আপনারই সুবিধে। ...আমার প্রাণ যখন কথা কয়ে ওঠে তখন মুখ বুজে থাকতে আমি পারি না। যাক গে, কী আর হবে... বিশ্বাস করুন, কোনো নারীকে, কখনো না, কখনো না! কোনো পরিচয় নেই আমার! শুধু প্রতিদিন কল্পনা করি যে অবশেষে কখনো কারো দেখা পাব আমি। আর যদি জানতেন কতবার যে আমি ওইরকম প্রেমে পড়েছি!..

'কিন্তু কেমন করে, কার প্রেমে?'

'না, কারো প্রেমে নয়, আদর্শ রমণীর প্রেমে, যে দেখা দেয় স্বপ্নে। কল্পনায় আমি গোটাগুটি এক-একটা রোমান্স বানিয়ে তুলি। ও, আপনি আমায় জানেন না! কিন্তু সত্যি, তাছাড়া যে চলে না, দু-তিনটি নারীকে আমি দেখেছি সত্যি, কিন্তু কেমন নারী তারা? সবাই এরা এমন গিন্নি যে... কিন্তু আপনাকে একটু হাসাই, আপনাকে বলে নিই যে রাস্তায় কোনো অভিজাত মহিলার সঙ্গে এমনি খানিক আলাপ করার কথা ভেবেছি বার কয়েক, বলাই বাহুল্য যখন সে একা; কথা বলব অবশ্য সসংকোচে, সম্মান করে, আবেগ ফুটিয়ে; বলব, নিঃসঙ্গতায় মারা যাচ্ছি আমি, আমায় যেন উনি পায়ে না ঠেলেন, কোনো নারীকে জানার, তার মনে ছাপ ফেলার কোনো উপায় আমার নেই, আমার মতো একজন হতভাগ্যের এই ভীরু প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান না করা এমনকি নারীর কর্তব্যই। শেষত বলব যে আমি মাত্র এইটুকু চাই যে আমার সঙ্গে অন্তত দুটো কথা বলুন ভাইয়ের মতো, দরদ দিয়ে, প্রথমেই আমাকে ফেরাবেন না, আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি যা বলব সবটা শুনুন, হাসতে চান হাসুন, কিন্তু আশা দিন আমায়, দুটো কথা বলুন আমার সঙ্গে, শুধু দুটো কথা, পরে আর কখনো আমাদের দেখা না হয়, না হোক!.. কিন্তু আপনি হাসছেন... তবে সেইজন্যেই তো আমি এসব বলছি...'

'দুঃখ করবেন না; হাসছি কারণ আপনি নিজেই নিজের শত্রুতা করছেন, আপনি যদি চেষ্টা করে দেখতেন তবে ব্যাপারটা অন্তত রাস্তায় দেখা কোনো মহিলা নিয়ে হলেও উৎরে যেত; যত সরল হবেন ততই ভালো। ...কোনো সহৃদয় মেয়েই, যদি সে হাঁদা না হয় অথবা সেই

মুহূর্তে কোনো কিছুর জন্যে যদি চটে না থাকে তাহলে যে দুটি কথা আপনি অমন ভয়ে ভয়ে ভিক্ষে করছেন তা না বলেই ফেরাবে না আপনাকে। ...তবে আমার কথা আর-কী! অবশ্যই আপনাকে পাগল বলে ভাবতাম। আমি তো নিজেকে দিয়েই স্থির করতাম। লোকে দুনিয়ায় কিভাবে দিন কাটাচ্ছে সে তো আমি জানি অনেক!'

'ওহ্, ধন্যবাদ আপনাকে,' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'আপনি যে আমার কী করলেন তা আপনি জানেন না!'

'থাক, হয়েছে, হয়েছে। কিন্তু বলুন তো, কেন আপনি ভাবলেন যে আমি এমন মেয়ে যার সঙ্গে... মানে যাকে আপনি... মনোযোগ আর বন্ধুত্বের যোগ্য মনে করেন... এক কথায়, আপনি যা বললেন, যে গিন্নি গোছের নয়। কেন আপনি আমার কাছে আসবেন বলে ঠিক করলেন?'

'কেন? কেন? কিন্তু আপনি যে ছিলেন একা আর ওই ভদ্রলোকটি বড়ো বেশি হিম্মত রাখেন, সময়টা আবার রাত: নিশ্চয় মানবেন যে ওটা আমার কর্তব্য...'

'না, না, তারও আগে, অন্য দিকটায় যখন ছিলাম। আপনি তো আমার কাছে আসতে চাইছিলেন?'

'ওখানে, অন্য দিকটায়? কিন্তু সত্যি জানি না কী জবাব দেব; ভয় হচ্ছে আমার... জানেন আজ আমি ছিলাম বেশ খোশ মেজাজে; চলেছি গান গাইতে গাইতে; গিয়েছিলাম শহরের বাইরে; এমন সুখের মুহূর্ত আমার কখনো আসে নি। আপনি... কিন্তু হয়ত ওটা আমার নেহাৎ এমনি ধারণা হয়েছিল। ...কিন্তু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি বলে মাপ করবেন: আমার মনে হল আপনি যেন কাঁদছেন, আর আমি... কান্না আমি শুনতে পারি না... বুকে আমার ঘা লাগল... ওহ্ ভগবান! কিন্তু আপনার জন্যে কষ্ট হওয়া আমার অনুচিত কি? আপনার প্রতি ভাইয়ের মতো একটা সমবেদনা বোধ করা কি পাপ?.. মাপ করবেন যে সমবেদনা বললাম। ...মানে এক কথায়, আপনা থেকেই আপনার কাছে যাবার যে ইচ্ছে হয়েছিল, তাতে কি আপনার মনে আঘাত দেয়া সম্ভব?..'

'থামুন, আর বলবেন না...' আমার হাতে চাপ দিয়ে চোখ নিচু করে বললে মেয়েটি। 'আমার নিজেরই দোষ যে কথাটা তুলেছি; কিন্তু আপনার ব্যাপারে আমার ভুল হয় নি বলে আমি খুশি... কিন্তু এই এসে গেছি;

ওই গলিটায় যেতে হবে, ওখান থেকে দু'পা মাত্র। ...বিদায়, ধন্যবাদ আপনাকে...'

'তাহলে কি, তাহলে কি আর কখনো দেখা হবে না আমাদের?.. এইভাবেই কি এটার ইতি?'

হেসে মেয়েটি বললে, 'দেখছেন তো, আপনি প্রথমে চেয়েছিলেন শুধু দুটি কথা, আর এখন। ...তবে কিছুই বলব না আপনাকে... হয়ত দেখা হবে...'

বললাম, 'কাল আমি আসব এখানে। ওহ্, মাপ করবেন, আমি যে জিদ করতে শুরু করেছি...'

'হ্যাঁ, আপনার ধৈর্য নেই!.. প্রায় জিদ করছেন!..'

'শুনুন, শুনুন!' বাধা দিয়ে বললাম আমি, 'ফের অমনধারা যদি কিছু বলে ফেলি, মাপ করবেন। ...কিন্তু ব্যাপারটা হল এই: কাল আমি এখানে না এসে পারি না। আমি স্বপ্নজীবী, বাস্তব জীবন আমার ভারি কম। তাই এখনকার এইরকম মুহূর্ত আমার এত বিরল যে স্বপ্নে তার পুনরাবির্ভাব না ঘটিয়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। সারা রাত, সারা সপ্তাহ, সারা বছর আমি স্বপ্ন দেখব আপনার। অবশ্যই কাল আসব এখানে, ঠিক এইখানেই, এই জায়গাটাতেই, ঠিক এই সময়েই, আর গত কালটা হবে আমার সুখস্মৃতি। এ জায়গাটা আমার কাছে মধুর হয়ে উঠেছে। পিটারবুর্গে এমন জায়গা আমার আছে গোটা দুই-তিন। আপনার মতো স্মৃতিচারণে আমিও কেঁদেছিলাম একবার... কী করে জানব যে আপনি মিনিট দশেক আগে স্মৃতিচারণেই কেঁদেছিলেন। ...তবে ক্ষমা করুন আমায়, ফের আমি আনমনা হয়ে পড়েছিলাম; হয়ত আপনি এখানে নিজেকে বিশেষ সুখী বোধ করেছিলেন কখনো...'

মেয়েটি বললে, 'বেশ, আমিও তাহলে এখানে আসব ওই দশটার সময়। দেখছি আপনাকে বারণ করার অধিকার নেই আমার। ...আসলে এখানে আমায় আসতেই হবে; ভাববেন না যে আপনার সঙ্গে দেখা করাতে চাইছি বলে; জানিয়ে রাখি যে এখানে আসা আমার দরকার নিজের জন্যেই। কথাটা হল এই... মানে আপনাকে সোজাসুজি বলছি; আপনিও যদি আসেন তাতে কিছু এসে যাবে না; প্রথমত, আজকের মতো একটা অঘটনও ঘটতে পারে, কিন্তু সেটা অন্য ব্যাপার... মোট কথা, স্রেফ আপনাকে

দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে আমার... দ্বটো কথা কইবার জন্যে। শ্বধ্ব জানেন, এখন আমার দোষ ধরছেন কি? ভাববেন না আমি অমন সহজে দেখা করার কথাটা বলছি। ...বলতাম না যদি। ...কিন্তু না, ওটা থাক আমার গোপন কথা! বোঝাপড়া হবে কেবল ভবিষ্যতে...'

'বোঝাপড়া! বল্বন, সব বল্বন আগে থেকে, আমি সবকিছ্বতে রাজি, সবকিছ্বর জন্যে তৈরি,' সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'নিজের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি — কথা শ্বনব আপনার, সম্মান রেখে চলব। আপনি তো আমায় জানেন যে...'

'আপনাকে জানি বলেই কাল ডাকছি আপনাকে,' হেসে বললে মেয়েটি, 'আপনাকে আমি প্বরোপ্বরি জানি। তবে দেখবেন, আসবেন কিন্তু একটা শর্তে: প্রথমত (শ্বধ্ব আমার যা অন্বরোধ সেটা পালন কর্বন, দেখছেন তো, আমি খোলাখ্বলি বলছি), প্রেমে পড়বেন না আমার। ...আপনাকে নিশ্চয় করে বলছি, সেটা অসম্ভব। বন্ধ্বত্বে আমি রাজি, এই নিন আমার হাত। ...কিন্তু আমাকে ভালোবাসা, সেটা চলবে না, মিনতি করছি আপনাকে!'

তার হাতখানা নিয়ে আমি সাবেগে বলে উঠলাম, 'শপথ করছি!'

'খ্বব হয়েছে, শপথ করার দরকার নেই, আমি তো জানি যে আপনি বার্বদের মতো জ্বলে উঠতে পারেন। একথা বলছি বলে রাগ করবেন না আমার ওপর। আপনি যদি জানতেন... আমারও এমন কেউ নেই যার সঙ্গে দ্বটো কথা বলি, যার কাছে কিছ্ব পরামর্শ চাইতে পারি। রাস্তায় কারো কাছে তো পরামর্শ চাওয়া যায় না। অবিশ্যি আপনি এর ব্যতিক্রম। আমি আপনাকে এতটা জেনে গেছি যেন বিশ বছর ধরে আমাদের বন্ধ্বত্ব। ...আপনি পালটে যাবেন না, তাই না?'

'সেটা দেখবেন... শ্বধ্ব ভেবে পাচ্ছি না অন্তত একটা দিনও কী করে কাটাব।'

'বেশ করে ঘ্বমোন; শ্বভ রাত্রি... আর মনে রাখবেন যে আপনাকে আমি বিশ্বাস করেছি। এই কিছ্বক্ষণ আগে আপনি এমন সাড়া দিয়ে উঠেছিলেন: যেকোনো আবেগ, এমনকি ভ্রাতৃস্নেহেও অমন সাড়া দেয় না কেউ! শ্বন্বন, আপনি যে কথাগ্বলো বলেছিলেন তা এতই ভালো যে তক্ষ্বনি আপনাকে বিশ্বাস করার ইচ্ছেটা ঝলক দিয়ে উঠেছিল মনে...'

'দোহাই ভগবান, কিন্তু কিসের বিশ্বাস? কী?'

'সেটা হবে কাল। আপাতত এটা থাক গোপন। সে তো আপনার পক্ষে ভালোই; দূর থেকে সেটা আপনার কাছে রোমান্সের মতো লাগবে। হয়ত কাল আপনাকে বলব, কিংবা হয়ত বলব না। ...ভবিষ্যতে আপনার সঙ্গে আরো কথাবার্তা হবে, পরিচয় হবে আরো ভালো করে...'

'ওহ্, কালই যে আমি নিজের সম্পর্কে আপনাকে সবই বলব! কী এটা? এ যে অলৌকিক একটা ব্যাপার ঘটল আমার... ভগবান, আমি আছি কোথায়? কিন্তু বলুন, অন্যদের মতো আপনি যে আমার ওপর রাগ করেন নি, প্রথমেই আমাকে খেদিয়ে দেন নি তার জন্যে সত্যিই কি আপনার ক্ষোভ আছে? দুই মিনিটেই আপনি আমাকে সুখী করে দিয়েছেন চিরকালের মতো। হ্যাঁ, সুখীই!.. কেন আপনি আমার সঙ্গে ভাব করলেন, আমার সমস্ত সন্দেহ ঘুচিয়ে দিলেন, সেটা জানলে হত... তবে তেমন মুহূর্ত হয়ত আমার আসবে... তবে কাল আমি আপনাকে সব বলব, সব জানবেন আপনি...'

'বেশ, সেই কথাই রইল; আপনিই শুরু করবেন...'

'ঠিক আছে।'

'আসি।'

'ফের দেখা হবে!'

বিদায় নিলাম আমরা। সারা রাত আমি হেঁটে বেড়ালাম, বাড়ি ফিরতে মন চাইছিল না। এত সুখ আমার... রইলাম আগামী কালের প্রতীক্ষায়!

দ্বিতীয় রাত্রি

'তাহলে মারা যান নি এখনো!' হেসে আমার দুই হাতে চাপ দিয়ে সে বললে।

'দুঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি এখানে; জানেন সারাটা দিন আমার কী করে কেটেছে!'

'জানি, জানি... কিন্তু এবার কাজের কথা হোক। জানেন কেন এলাম? কালকের মতো ছাইভস্ম বকবক করার জন্যে নয়। শুনুন, ভবিষ্যতে

আমাদের আরো বুদ্ধিমানের মতো চলা দরকার। কাল সন্ধ্যায় এ নিয়ে অনেক ভেবেছি।'

'কিসে, কী করে বুদ্ধিমান হতে হবে? আমার দিক থেকে আমি প্রস্তুত; সত্যি, এখনকার মতো বুদ্ধিমন্ত কিছু সারা জীবনেও ঘটে নি আমার।'

'সত্যি? প্রথমত আপনাকে অনুরোধ করছি, অত জোরে আমার হাতে চাপ দেবেন না; দ্বিতীয়ত আপনাকে বলি, আজ অনেকখন ধরে ভেবেছি আপনাকে নিয়ে।'

'তা কী সিদ্ধান্তে এলেন?'

'সিদ্ধান্ত? সেটা দাঁড়াল এই যে সবই ফের গোড়া থেকে শুরু করতে হবে, কেননা শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করলাম যে আপনি আমার কাছে একেবারে অপরিচিত, কাল আমি বাচ্চার মতো, খুকির মতো ব্যবহার করেছি এবং বলাই বাহুল্য দাঁড়াল এই যে সবকিছুর জন্যে দায়ী আমার কোমল হৃদয়, অর্থাৎ আত্মপ্রশংসা করলাম, নিজেকে বিচার করতে বসলে সর্বদাই যা হয়ে থাকে। আর দোষটা শোধরাবার জন্যে ঠিক করলাম আপনার সম্পর্কে অতি বিশদে সবকিছু জানা দরকার। কিন্তু কারো কাছ থেকে যে জানব তেমন কেউ না থাকায় আপনার ভেতর-বাহিরের সবখানি আপনাকেই জানাতে হচ্ছে। মানে, কেমন লোক আপনি? তাড়াতাড়ি শুরু করুন, বলুন আপনার ইতিহাস।'

'ইতিহাস!' ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'ইতিহাস! কিন্তু কে আপনাকে বললে যে আমার ইতিহাস আছে? কোনো ইতিহাস নেই আমার...'

'আপনি যখন বেঁচে-বর্তে দিন কাটিয়েছেন তখন ইতিহাস থাকবে না?' হেসে সে বাধা দিলে আমার কথায়।

'একেবারে কোনো ইতিহাস নেই! দিন কাটিয়েছি যাকে বলে, নিজে নিজে, অর্থাৎ একা, একেবারে একা, সম্পূর্ণ একা, — একা ব্যাপারটা কী বোঝেন?'

'একা কেমন করে হয়? তার মানে আপনি কখনো কাউকে দেখেন নি?'

'আরে না, দেখা সে তো দেখি, তাহলেও একা।'

'সেকি, আপনি কি কারো সঙ্গে কথাও বলেন না?'

'কঠোর অর্থে, কারো সঙ্গে না।'

'তাহলে আপনি কেমনধারা লোক বুঝিয়ে বলুন! দাঁড়ান, আমি ধরার চেষ্টা করি: আপনার নিশ্চয় আমার মতো ঠাকুমা আছে। উনি অন্ধ, সারা জীবন উনি আমায় কোথাও যেতে দেন নি, ফলে কথা কইতেই প্রায় ভুলে গেছি আমি। আর বছর দুই আগে আমি যখন বেয়াদপি করি, উনি আমায় কাছে ডেকে নিজের পোশাকের সঙ্গে আমার ফ্রক পিন দিয়ে গেঁথে রাখেন — এইভাবেই সারা দিনমান বসে থাকি আমরা। কানা হলেও উনি মোজা বোনেন আর আমি বসে থাকি ওঁর কাছে, সেলাই করি, নয়ত বই পড়ে শোনাই—এ এক বিচিত্র রেওয়াজ, ফলে আজ দু'বছর আমি পিনে গাঁথা...'

'হা ভগবান, কী দুর্ভাগ্য! কিন্তু না, আমার তেমন কোনো ঠাকুমা নেই।'

'নেই যখন তখন ঘরে বসে থাকতে পারেন কেমন করে?..'

'শুনুন, আপনি জানতে চাইছেন আমি লোকটা কে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!'

'কথাটার কঠোর অর্থে?'

'একান্ত কঠোর অর্থে!'

'তাহলে বলি, আমি একটি টাইপ।'

'টাইপ, টাইপ! কেমনধারা টাইপ?' চেঁচিয়ে উঠে মেয়েটি এমনভাবে খিল খিল করে হেসে উঠল যেন সারা জীবনে সে হাসির সুযোগ পায় নি। 'সত্যি ভারি হাসাতে পারেন আপনি। এই দেখুন, এখানে একটা বেঞ্চি রয়েছে, বসা যাক! এখান দিয়ে কেউ যায় না, কেউ শুনতে পাবে না আমাদের কথা — তাহলে শুরু করুন আপনার ইতিহাস; কেননা আপনি আমায় ভোলাতে পারবেন না, ইতিহাস আপনার আছে শুধু চেপে যাচ্ছেন সেটা। প্রথমত টাইপ জিনিসটা কী?'

'টাইপ? টাইপ হল গে ভারি মৌলিক ধরনের লোক, হাস্যকর লোক,' ওর ছেলেমানুষি হাসির সঙ্গে সঙ্গে আমিও হোহো করে হাসতে হাসতে জবাব দিলাম তাকে, 'ও একধরনের চরিত্র। আচ্ছা, স্বপ্নজীবী কী জিনিস জানেন?'

'স্বপ্নজীবী! তা জানব না কেন? আমি নিজেই তো স্বপ্নজীবী!

ঠাকুমার কাছে বসে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে কত কীই-না মাথায় আসে। অমনি শুরু হয়, স্বপ্নে বিভোর হয়ে যাই, মানে স্রেফ যেন চীনা রাজপুত্রকেই বিয়ে করতে চলেছি... মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখা তো ভালোই! কিন্তু না, তবে ঈশ্বরই জানেন! বিশেষ করে যখন তা ছাড়াই ভাবনার কিছু থাকে,' কথাটা সে এবার যোগ দিলে বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই।

'চমৎকার! আপনি যখন চীনা বর্গাদিখানকেই বিয়ে করতে গেছেন, তাহলে আপনি আমাকে নির্ঘাৎ বুঝতে পারবেন। তাহলে শুনুন... কিন্তু মাপ করবেন, আমি যে আপনার নামটাই এখনো জানি না।'

'খেয়াল হল তাহলে! দেরি হয় নি!'

'হা ভগবান! খেয়ালই হয় নি, এত ভালো লাগছিল সব...'

'আমার নাম নাস্তেনকা!'

'নাস্তেনকা! ব্যস?'

'শুধু ওইটুকু। সেটা কি কম হল, কিছুতেই কি আপনার মন ওঠে না!'

'কম? বরং অনেক, অনেক, অনেকখানি, এত ভালো মন আপনার যে প্রথমেই আপনি আমার কাছে এসেছেন আপনার ডাক নামে!'

'তাহলে? এ্যাঁ?'

'শুনুন নাস্তেনকা, কেমন হাস্যকর ব্যাপার দাঁড়ায়।'

আমি ওর পাশে বসে গুরুগম্ভীর পণ্ডিতী ভাব নিয়ে প্রায় পুঁথি পাঠের মতো করে বলতে শুরু করলাম:

'আছে নাস্তেনকা, আপনার জানা না থাকলেও পিটারবুর্গে অতি বিচিত্র সব কোণ আছে। পিটারবুর্গের সমস্ত লোককে আলো দেয় যে সূর্য তা যেন এখানে উঁকি দেয় না, উঁকি দেয় নতুন অন্য কী একটা সূর্য, যেন এইসব জায়গার জন্যেই তা বরাত করা, আলোটাও তার অন্যরকম। এইসব জায়গায় নাস্তেনকা, বয়ে চলে যেন একেবারেই অন্য একটা জীবন, আমাদের চারপাশে যে জীবন টগবগ করছে মোটেই তার মতো নয়, আমাদের এখানে, আমাদের এই অতি গুরুগম্ভীর কালের সে জীবন চলেছে বুঝি কোন কোন এক রূপকথার রাজ্যে। আর এই জীবনটা হল বিশুদ্ধ অতি-কল্পনা আর দীপ্ত আদর্শের সঙ্গে (হায় নাস্তেনকা) অবিশ্বাস্য রকমের তুচ্ছতা না বললেও ম্যাড়মেড়ে গদ্য আর মামুলিয়ানার মিশেল।'

'থুঃ, মাগো! কী একখান গৌরচন্দ্রিকা! কীসব শুনব তারপর?'

'শুনুন নাস্তেনকা (মনে হচ্ছে আপনাকে বার বার নাস্তেনকা বলে ডেকেও ক্লান্ত হব না), শুনুন আপনি, এইসব জায়গায় দিন কাটায় অদ্ভুত সব লোক, স্বপ্নজীবী। স্বপ্নজীবীর যদি একটা বিশদ সংজ্ঞা দেবার প্রয়োজন হয়, তবে সে ঠিক মানুষ নয়, মাঝামাঝি গোছের কিছু একটা জীব। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সে ঠাঁই নেয় দুষ্প্রবেশ্য কোনো একটা কোণে, যেন দিনের আলো থেকেও লুকিয়ে থাকতে চায় তার ভেতরে, আর নিজের মধ্যে একবার গুটিয়ে গেলে সে তার কোণটির সঙ্গেই জুড়ে যায় শামুকের মতো, অন্তত এদিক থেকে তার খুবই সাদৃশ্য আছে সেই প্রাণীটির সঙ্গে যে একাধারে প্রাণী এবং গৃহ, যাকে বলা হয় কাছিম। কী মনে করেন, কেন সে ভালোবাসে তার ঐ চারটি দেয়াল, অবশ্য-অবশ্যই যার রঙ হবে সবজেটে, চ্যাটচেটে, বিষণ্ণ, এবং অমার্জনীয় রকমে তামাকু সেবনের ধোঁয়ায় ভরা? কেন এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে তার বিরল পরিচিতদের কেউ দেখা করতে এলে (আর পরিণামে তো তার পরিচিতরা সবাই উবে যায়), কেন এই হাস্যকর ভদ্রলোকটি তার সামনে পড়ে হয়ে ওঠে অত বিব্রত, মুখের ভাব পালটে যায়, এমন থতমতো খেতে থাকে যেন এইমাত্র সে তার চার দেয়ালের ভেতরে কোনো একটা অপরাধ করেছে, যেন জাল করেছে কোনো একটা দলিল, কিংবা পত্রিকায় বেনামী চিঠিতে একটি পদ্য পাঠাচ্ছে যাতে বোঝানো হয়েছে যে আসল কবি মারা গেছেন এবং তাঁর শোলোকগুলো প্রকাশ করা পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে তাঁর বন্ধু? বলুন নাস্তেনকা, কেন এই দুই সহালাপীর মধ্যে আলাপ জমে ওঠে না? হঠাৎ আসা হতভম্ব এই বন্ধুটি অন্য ক্ষেত্রে খুবই ভালোবাসে হাসতে, তুখোড় কথা কইতে, মানবজাতির রমণীয় অর্ধাংশ এবং আরো নানা ফুর্তির বিষয় নিয়ে আলাপ জমাতে, কেন কোনো হাসি, কোনো তুখোড় কথা ফুটছে না তার মুখে? শেষত কেন এই বন্ধুটি, নিশ্চয় সে পরিচিত হয়েছে অল্প কিছুদিন আগে আর দেখা করতে এসেছে এই প্রথম বার, কেননা এরূপে ক্ষেত্রে বন্ধু আর দ্বিতীয় বার আসে না — কেন এই বন্ধুটি গৃহস্বামীর বিপর্যস্ত মুখচ্ছবি দেখে তার সমস্ত বাক্‌চাতুর্য সত্ত্বেও (যদি অবশ্য সেটা তার আদৌ থেকে থাকে) নিজেই থতমতো খেয়ে যায়, আড়ষ্ট হয়ে যায়, ওদিকে গৃহস্বামী আবার আলাপটাকে সামলে-সুমলে তোলার জন্যে, সেও যে জাগতিক ব্যাপার-স্যাপার জানে, মানবজাতির রমণীয় অর্ধাংশ নিয়ে কথাবার্তা

চালাতে পারে এসব দেখাবার জন্যে, ভুল করে যে বেচারি তার কাছে এসে পড়েছে তার মনে ধরার জন্যে বিনয় দেখাবার প্রাণপণ তবে ব্যর্থ চেষ্টার পর একেবারেই গোলমালে পড়ে যায়, বুদ্ধিসুদ্ধি যায় চুলোয়, সেটা কেন? অবশেষে হঠাৎ কেন অতিথির অতি জরুরি একটা কাজের কথা মনে পড়ে যায় যার অস্তিত্ব নেই, এবং তাড়াতাড়ি টুপিটি তুলে নিয়ে কোনোক্রমে হাত ছাড়িয়ে নেয় গৃহস্বামীর উত্তপ্ত চাপ থেকে, যে সর্বোপায়ে দেখাতে চাইছে তার অনুশোচনা, ক্ষতিটা শুধরে নেবার বাসনা? প্রস্থানোদ্যত বন্ধুটি কেন দরজা পেরিয়েই হেসে ওঠে এবং তৎক্ষণাৎ শপথ নেয় কখনোই আর এই খাপছাড়াটার কাছে আসবে না যদিও খাপছাড়াটি আসলে চমৎকার ছোকরা, এবং তাহলেও কেন এই অতিথিটির কল্পনায় ছোট্ট একটা খেয়াল না এসে পারে না, যথা: সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকালে তার এই সহালাপীর চেহারাটাকে সুদূরলম্বিত গোছের হলেও একটা হতভাগ্য বেড়ালছানার সঙ্গে তুলনা করা, বাচ্চারা যাকে ধাপ্পা দিয়ে ধরে ফেলে ধামসে ছেড়েছে, ভয় পাইয়ে দিয়েছে, সবরকমে হেনস্থা করেছে, একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়েছে তাকে, আর ছানাটা শেষ পর্যন্ত ওদের হাত ছাড়িয়ে অন্ধকারে গিয়ে লুকিয়েছে টেবিলের নিচে এবং সেখানে অবকাশের পুরো ঘণ্টাটা সে বাধ্য হয়েছে লোম কাঁটা-কাঁটা করে তুলতে, ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করতে, দুই থাবা দিয়ে মুখ মুছতে, আর তার পরেও প্রকৃতি, জীবন, এমনকি দরদী ভাঁড়ারিনী বাবুদের ভোজনশেষের যে এঁটোকাঁটা তাকে এনে দিয়েছে সেটাকেও সে বিদ্বেষের চোখে দেখেছে অনেকখন, কেন?'

'শুনুন,' আমায় বাধা দিলে নাস্তেনকা, এতক্ষণ সে বড়ো বড়ো চোখে মুখ হাঁ করে অবাক হয়ে শুনছিল আমার কথা, 'শুনুন, এসব কেন ঘটল আর কেনই বা আপনি আমায় এমন হাস্যকর প্রশ্ন করছেন তা আমি একেবারেই জানি না; কিন্তু এটা নিশ্চয় করে জানি যে ব্যাপারটা ঘটেছে বর্ণে বর্ণে আপনার ক্ষেত্রে।'

'কোনো সন্দেহ নেই,' জবাব দিলাম অতি গুরুত্বের ভাব নিয়ে।

নাস্তেনকা বললে, 'সন্দেহ যখন নেই তখন বলে যান, কেননা ভারি জানতে ইচ্ছে করছে শেষটা কী হল।'

'আপনি কি নাস্তেনকা এই জানতে চাইছেন যে আমার নায়ক, বরং বলা ভালো আমি, কেননা আমার সামান্য নিজস্বতা নিয়ে নায়ক সে

আমিই—তা আমি কী করলাম আমার কোণটিতে; আপনি জানতে চাইছেন বন্ধুর অপ্রত্যাশিত আগমনে আমি অমন হতচকিত হয়ে সারা দিনটা কেন কাটালাম বিহ্বল হয়ে? আমার ঘরের দরজা যখন খুলল তখন কী কারণে আমি অমন ঝটপটিয়ে, লাল হয়ে উঠলাম? কেন আমি অতিথি বরণ করতে পারলাম না, নিজের আতিথেয়তার ভারে অমন লজ্জায় মরলাম কেন?'

'মানে হ্যাঁ,' নাস্তেনকা বললে, 'সেইটেই হল ব্যাপার। শুনুন, আপনি চমৎকার করে বলতে পারেন, কিন্তু অমন চমৎকার করে না বললে কি চলে না? আর এ যেন আপনি কথা কইছেন না, বই পড়ছেন।'

কোনোক্রমে হাসি চেপে গুরুগম্ভীর কঠোর গলায় বললাম, 'নাস্তেনকা, মিষ্টি নাস্তেনকা, আমি জানি যে, আমি উচ্চগ্রামে কথা কইছি, কিন্তু—ঘাট মানছি, অন্যভাবে কথা কইতে আমি পারি না। এখন আমি নাস্তেনকা, রাজা সলোমনের প্রেতাত্মার মতো, হাজার বছর যে ছিল সাতটা সীলমোহর করা পেটিকায়, অবশেষে তা খুলে ফেলা হয়। এখন, মিষ্টি নাস্তেনকা, এখন যখন আমাদের ফের দেখা হল দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর, কেননা আমি তো আপনাকে অনেকদিন থেকেই চিনি নাস্তেনকা, কেননা অনেকদিন থেকেই আমি কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, আর আপনাকেই যে খুঁজছিলাম, এখন আমাদের দেখা হওয়াই যে নির্বন্ধ এটা তারই লক্ষণ—এখন আমার মাথার ভেতরে হাজার হাজার রুদ্ধদ্বার খুলে গেছে, এখন আমাকে বয়ে যেতে হবে কথার নদী হয়ে, নইলে আমি মারা যাব। তাই অনুরোধ করি নাস্তেনকা, লক্ষ্মীর মতো চুপচাপ শুনে যান, নচেৎ আমি মুখ বন্ধ করব।'

'না, না, না, বলে যান! এবার আমি আর একটা কথাও বলব না।'

'বলছি: নাস্তেনকা বন্ধু আমার, অসাধারণ আমি ভালোবাসি আমার দিনের একটি ঘণ্টা। সেই ঘণ্টা যখন সব কাজ, চাকরি-বাকরি, দায়দায়িত্ব ফুরোয়, সবাই বাড়ির দিকে ছোটে খেয়ে দেয়ে গড়িয়ে নেবার জন্যে, আর রাস্তায় দেখা দেয় সন্ধ্যা, রাত আর বাকি অবসর সময়টা নিয়ে হাসিখুশি অন্য প্রসঙ্গ। এই সময়টা আমাদের নায়কও—অনুমতি দিন নাস্তেনকা, প্রথম পুরুষেই বলি, কেননা উত্তম পুরুষে এসব বলা ভারি লজ্জার কথা—তাহলে এই সময়টা আমাদের নায়ক, যারও কাজকর্ম কিছু ছিল, সেও অন্য সকলের সঙ্গে হেঁটে চলে, কিন্তু তার বিবর্ণ, খানিকটা দলামোচড়া

মুখে দেখা দেয় তৃপ্তির ঝলক। পিটারবুর্গের ঠান্ডা আকাশে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে যে সান্ধ্য বিভাস, সেটার দিকে সে তাকিয়ে দেখে উদাসীন চিত্তে নয়, তবে তাকিয়ে দেখে যে বলছি সেটা মিছে কথা: সে দেখে না, যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকে, অথবা আরো বেশি চিত্তাকর্ষক অন্য কোনো একটা বিষয়ে সে ভাবিত, তাই চকিতে, প্রায় অনিচ্ছায় চারিপাশের দিকে দৃষ্টিপাত করার সময় পাচ্ছে সে। সে খুশি কেননা তার পক্ষে বিরক্তিকর সব 'ব্যাপারগুলো' সে চুকিয়ে দিতে পেরেছে কাল সকাল পর্যন্ত, পেয়ারের খেলাধুলা আর দুষ্টুমিতে মাতবার জন্যে ইস্কুল থেকে ছুটি পাওয়া বালকের মতো তার আনন্দ। পাশ থেকে ওকে লক্ষ্য করুন নাস্তেনকা: সঙ্গে সঙ্গেই দেখবেন যে আনন্দের অনুভূতি একটা সুপ্রভাব ফেলেছে তার ক্ষীণ স্নায়ু আর উত্তেজিত রুগ্ণ অতিকল্পনার ওপর। যেমন এখন কী নিয়ে সে ভাবছে। ...আপনার ধারণা খাবারের কথা? আজকের সন্ধ্যার কথা? অমন করে কী ও দেখছে? ওই ভারিক্কি চেহারার ভদ্রলোকটিকে কি, যিনি তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়া টগবগে ঘোড়ায় টানা ঝকঝকে গাড়ির আরোহিণী মহিলার উদ্দেশে অমন দেখনসই ঢঙে মাথা নোয়ালেন? না, নাস্তেনকা, এসব তুচ্ছ ব্যাপারে এখন আর ওর মন নেই! এখন সে 'তার নিজস্ব' জীবনে ধনী; হঠাৎ কেমন যেন ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছে সে, আর নিভন্ত সূর্যের বিদায় বেলার কিরণ খামোকাই তার কাছে জ্বলজ্বল করে উঠে উষ্ণ হৃদয়ে একরাশ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে নি। যে রাস্তার অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার-স্যাপার আগে তাকে বিস্মিত করতে পারত, সেটা এখন সে বড়ো একটা খেয়ালই করছে না। এখন 'অতিকল্পনার দেবী' (জুকোভস্কি যদি আপনার পড়া থাকে নাস্তেনকা) সে দেবী এখন তার খেয়ালী হাতে তার জন্যে সোনার কাপড় বুনে দিয়েছে, অভূতপূর্ব অপরূপ জীবনের নকশা তুলতে শুরু করেছে তার জন্যে—আর কে জানে, আহামরি যে গ্রানাইট সরণি বেয়ে সে ফিরে চলেছে তার ঘরে, হয়ত তার খেয়ালী হাতে সেখান থেকে তাকে তুলে দিয়েছে স্ফটিকের সপ্তম স্বর্গে। এখন ওকে থামাবার চেষ্টা করে দেখুন-না, আচমকা জিগ্যেস করুন: কোথায় সে আছে এখন, কোন রাস্তা দিয়ে এসেছে?—নিশ্চয় ওর কিছু মনে পড়বে না, কোন রাস্তা দিয়ে সে এসেছে তাও না, কোথায় এখন সে আছে তাও না, হতাশায় লাল হয়ে উঠে ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে নিশ্চয় কিছু একটা বানিয়ে বলবে সে।

সেইজন্যেই যখন অতি শ্রদ্ধাভাজন এক বৃদ্ধা রাস্তার মাঝখানে তাকে সৌজন্য সহকারে তার হারিয়ে ফেলা রাস্তাটার কথা শুধান, তখন অমন চমকে উঠেছিল সে, প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে আর-কি, সভয়ে তাকিয়েছিল চারিদিকে। দুঃখে ভুরু কুঁচকে সে চলল এগিয়ে, বিশেষ খেয়ালই করল না যে পথচারীদের অনেকেই তাকে দেখে হাসছে, চেয়ে থাকছে তার পানে, আর কে একজন ছোট খুকি সভয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে বড়ো বড়ো চোখে তার আত্মমগ্ন প্রশস্ত হাসি আর হাতের ভঙ্গি দেখে সজোরে হেসে উঠল হোহো করে। কিন্তু সেই একই অতিকল্পনা তার লীলাময় ধাবনে বৃদ্ধা আর কৌতূহলী পথচারীদের আর হাস্যরতা মেয়েটিকে, আর যে লোকগুলো সান্ধ্যাহার করে ফস্তানকাকে জাম করে দেয়া (ধরে নেওয়া যাক আমাদের নায়ক তখন সেখান দিয়েই যাচ্ছিল), সবাইকেই, মাকড়শার জালে মাছি ধরার মতো সবাইকে এবং সবকিছুকেই বুনে নিল তার ক্যানভাসে এবং এই নতুন সঞ্চয় নিয়ে রওনা দিলে তার আনন্দময় বিবরে, খেতে বসলে, খাওয়া সারা হল অনেকখন, সম্বিত ফিরল কেবল তখন যখন তার কাজকর্ম যে করে দেয় সেই চিন্তামগ্ন সদাবিষণ্ণ মাত্রিওনা টেবিল থেকে খাবার-দাবার সব পরিষ্কার করে তাকে এগিয়ে দিলে পাইপ। সম্বিত ফিরে অবাক হয়ে তার মনে পড়ল যে দিব্যি তার খাওয়া হয়ে গেছে এবং স্থিরভাবে তাকিয়ে দেখল কিভাবে এসব ঘটে গেছে। অন্ধকার হয়ে এল ঘরখানা; মনের ভেতরটা শূন্য, বিষণ্ণ; স্বপ্নের গোটা একটা রাজ্য চুরমার হয়ে গেছে তার চারপাশে, চুরমার হয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে, বিনা শব্দে, বিনা ঝাঁকুনিতে, মিলিয়ে গেছে স্বপ্নের মতো অথচ নিজেই সে মনে করতে পারছে না কী স্বপ্ন সে দেখেছিল। কিন্তু, সেটা কেমন একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন অনুভূতি যা থেকে বুক তার সামান্য টনটন করছে, উত্তেজিত হয়ে উঠছে, কেমন একটা নতুন কামনা প্রলুব্ধ করে সুড়সুড়ি দিচ্ছে তার অতিকল্পনায়, চাগিয়ে তুলছে তাকে, অলক্ষ্যে ডেকে আনছে এক ঝাঁক নতুন অপচ্ছায়া। ছোট্ট ঘরখানায় নৈঃশব্দ্যের রাজত্ব; নিঃসঙ্গতা আর আলস্যে প্রশ্রয় পায় কল্পনা, খানিকটা শিথায়িত হয়ে ওঠে তা, খানিকটা ফুটতে থাকে বৃদ্ধা মাত্রিওনার কফি পাত্রের জলের মতো, আর মাত্রিওনা নিশ্চিন্তে ঘুরঘুর করছে কাছেই, রান্নাঘরে, বানাচ্ছে তার রাঁধুনি-মার্কা কফি। এবার কল্পনাটা অনায়াসে বেরিয়ে এল ফুলকি দিয়ে, কোনো লক্ষ্য না নিয়ে যদি কাজে লেগে যায় এই

ভেবে আমাদের স্বপ্নজীবী যে বইটা টেনে নিয়েছিল তার তিন পাতা পড়তে না পড়তেই সেটা খসে পড়ে তার হাত থেকে। কল্পনা এখন তার ফের সচকিত, উদ্রিক্ত, আর ফের একটা নতুন জগৎ, মোহনীয় নতুন একটা জীবন তার সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে তার ঝকমকে পরিপ্রেক্ষিতে। নতুন স্বপ্ন — নতুন সুখ! সূক্ষ্মায়িত সুমধুর বিষের নতুন প্রয়োগ! ওহ্, কী হবে তার আমাদের এই বাস্তব জীবন নিয়ে! তার চিত্তজয়ী দৃষ্টির তলে আপনি আমি নাস্তেনকা, দিন কাটাই ভারি আলস্যে, ধীরে-সুস্থে, গা ছেড়ে দিয়ে। তার মতে, সবাই আমরা নিজেদের ভাগ্যে ভারি অসন্তুষ্ট, আমাদের জীবনে ভারি কষ্ট পাই আমরা! আর সত্যিই, দেখুন-না, প্রথম নজরেই চোখে পড়বে আমাদের সমস্ত কিছুই কী নিষ্প্রাণ, ভ্রূকুটিত, প্রায় ক্রুদ্ধ... 'বেচারি!' ভাবে আমাদের স্বপ্নজীবী। আর হ্যাঁ, তা যে ভাবে সেটায় অবাক হবার কিছু নেই! চেয়ে দেখুন ঐসব যাদুকর অপচ্ছায়ার দিকে, কী মোহময় তা, কী খেয়ালীপনায়, কী অবহেলায় তারা জুড়ে যাচ্ছে একটা বিস্তৃত, অনুপ্রাণিত ঐন্দ্রজালিক ছবিতে, যার কেন্দ্রমণি, তার প্রধান চরিত্র অবশ্যই সে নিজে, তার সমস্ত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আমাদের ঐ স্বপ্নজীবীটি। দেখুন-না কী বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা, উল্লসিত স্বপ্নের কী অন্তহীন ঝাঁক। আপনি হয়ত বলবেন, কী স্বপ্ন সে দেখছে? কী লাভ ওকথা জিগ্যেস করে! স্বপ্ন দেখছে সবকিছু সম্পর্কে... কবির ভূমিকা, প্রথমে যে স্বীকৃতি পায় নি, পরে সার্থকতা লাভ করেছে; হফমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব; বারথোলমিউ রাত, দিয়ানা ভেরনন, ইভান ভাসিলিয়েভিচের কাজান জয়কালের বীরত্ব, ক্লারা মভব্রাই, এভফিয়া দেন্‌স, ঋত্বিকপ্রধানদের সম্মেলন আর তাদের সামনে হুস, রবার্টে মৃতদের অভ্যুত্থান (সঙ্গীতটা মনে আছে? কবরখানার গন্ধ ছাড়ে!), মিন্না আর ব্রেন্দা, বেরেজিনার কাছে লড়াই, কাউন্টেস ভ.-দ.য়ের ওখানে কবিতা পাঠ, দানন্তোঁ, ক্লিয়োপাত্রা ei suoi amanti* কলোমনার ছোটো বাড়িটি, নিজের ঘরটি, কাছেই মিষ্টি একটি প্রাণী, চোখ বড়ো বড়ো করে মুখ হাঁ করে সে শুনত আমার কথা, যেমন এখন আপনি শুনছেন দেবী আমার। ...না নাস্তেনকা, আপনি আমি যে জীবনটা চাইছি, সেটা ওর কাছে, অলস কামাতুরের কাছে কী? ওর ধারণা এটা দীনহীন

* এবং তার প্রণয়ীরা (ইতালি)।

করুণ জীবন, ভাবছে না যে ওর মধ্যেও কখনো দেখা দিতে পারে বিষন্ন মুহূর্ত, যখন একদা সে এই দীনহীন জীবনের জন্যে দিতে রাজি থাকবে তার অতিকল্পনার সবকটি বছর, এবং দেবে আনন্দের জন্যে, সুখের জন্যে নয়, শুধু দুঃখ, অনুতাপ, অনিবার মনঃকষ্টের সেই মুহূর্তটায় স্রেফ বাছ-বিচার করার কোনো ইচ্ছেই তার নেই। কিন্তু এই মুহূর্তটা, ভয়ঙ্কর সেই সময়টা যতক্ষণ না আসছে, ততক্ষণ কিছুই সে চাইছে না, কেননা সে কামনার ঊর্ধ্বে, কেননা তার সবই রয়েছে, কেননা সে ঊর্ধ্বাতিঊর্ধ্বে, কেননা নিজেই সে তার নিজ জীবনের শিল্পী, প্রতি মুহূর্তে নিজের নতুন নতুন খেয়াল-খুশি অনুসারে সে তা সৃষ্টি করছে। আর কত অনায়াসে, কত স্বাভাবিকভাবেই না গড়ে উঠছে এই রূপকথার, অতিকল্পনার জগৎ! যেন এসব মোটেই অপচ্ছায়া নয়! সত্যি কখনো কখনো সে এই কথাই বিশ্বাস করতে রাজি যে এই জীবনটা আবেগপ্রসূত উদ্‌ভাবন নয়, মরীচিকা নয়, কল্পনার ছলনা নয়, এটা বাস্তব, সত্য, বিদ্যমান! কেন, বলুন তো নাস্তেনকা, কেন সেরকম মুহূর্তে প্রাণে হাঁপ ধরে, কেন কী একটা যাদুতে, অজানা কার একটা মর্জিতে দ্রুততর হয়ে ওঠে নাড়ির স্পন্দন, স্বপ্নজীবীর চোখ থেকে ছিটকে পড়ে জল, তপ্ত হয়ে ওঠে তার বিবর্ণ, সজল গন্ড, এবং অমন দুর্নিবার আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে তার সমস্ত সত্তা? কেন বিনিদ্র রাতের পর রাত কেটে যায় ক্ষণিকে, অফুরান হর্ষে আর সুখে, আর যখন জানলায় গোলাপী কিরণে ঝলমলিয়ে ওঠে ঊষা, আমাদের এই পিটারবুর্গের মতো গোমড়ামুখো ঘরখানাকে অপ্রাকৃত আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে প্রভাত, তখন আমাদের ক্লান্ত, জর্জরিত স্বপ্নজীবী দেহ এলায় শয্যায়, এবং ঘুমিয়ে পড়ে নিজের রুগ্‌ণ ব্যাকুল প্রাণের উল্লাস হেতু নিস্পন্দতায়, বুকের মধ্যে অমন বিধুর-মধুর ব্যথা নিয়ে? হ্যাঁ নাস্তেনকা, বাইরের লোক আত্মপ্রতারণা করে অনিচ্ছাতেই, বিশ্বাস হয়ে যায় যে সত্যিকারের অকপট আবেগেই তার প্রাণ আলোড়িত, তার বিদেহী স্বপ্নে প্রতিভা ও জীবন্ত কিছু আছে। কিন্তু কী ছলনা—যেমন, প্রেম এল তার প্রাণে, এল তার অফুরান আনন্দ আর যতকিছু দম্ধে মারা যাতনা নিয়ে। ...শুধু একবার ওর দিকে তাকালেই টের পাবেন! ওকে দেখে মিষ্টি নাস্তেনকা, বিশ্বাস করবেন কি, উদগ্র স্বপ্নে যাকে সে অত ভালোবেসেছে তাকে সে জানেই না কখনো? সত্যিই কি তাকে সে দেখেছে কেবল মন-ভোলানো কোনো ছায়ামূর্তিতে, এ হৃদয়াবেগটা

তারা কেবল স্বপ্ন? সত্যিই কি ওরা জীবনের এতকটা বছর কাটায় নি হাতে হাত রেখে, গোটা বিশ্বকে ত্যাগ করে, শুধু ওরা দুজন, নিজের জগৎ, নিজের জীবন অপরের জীবনে মিলিয়ে? আর বিচ্ছেদের মুহূর্তে যখন আসন্ন তখন গভীর রাতে ফুঁপিয়ে, আতুর হয়ে তার বুকে যে মুখ লুকিয়েছে সে কি এই মেয়েটিই নয়, শোনে নি অকরুণ আকাশের নিচে ঝড়ের মাতামাতি, কর্ণপাত করে নি বাতাসের দমকায় যা তার কালো আঁখিপল্লব থেকে ঝরিয়ে নিয়ে গেছে অশ্রুজল? সত্যিই কি এসবই স্বপ্ন—বিষণ্ণ, অবহেলিত বুনো-বুনো এই বাগান, যার হাঁটা-পথগুলো ছেয়ে গেছে শ্যাওলায়, নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ এই বাগান, যেখানে তারা কতবার হেঁটে বেড়িয়েছে দুজনে, আশা করেছে, ব্যথা সয়েছে, ভালোবেসেছে, ভালোবেসেছে এতদিন ধরে, 'এতদিন ধরে এত কোমলতায়'! আর এই অদ্ভুত মান্ধাতার আমলের বাড়িটা, যেখানে সে এতগুলো বিমর্ষ দিন কাটিয়েছে একা একা, বুড়ো একটা গোমড়া-মুখো মানুষের সঙ্গে, সর্বদাই যে চুপচাপ, রগচটা, ভয় পাইয়ে দিয়েছে তাদের, এই ভীরুগুলোকে, যারা বাচ্চার মতো মনমরা হয়ে ভয়ে ভয়ে পরস্পরের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে তাদের ভালোবাসা? কী কষ্ট সয়েছে ওরা, কী ভয় পেত ওরা, কী নিষ্পাপ, নির্মল ওদের ভালোবাসা, লোকেরা কী যে (সে তো বলাই বাহুল্য নাস্তেনকা) বিদ্বেষপরায়ণ! হায় ভগবান, পরে সত্যিই কি তার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না, স্বদেশের তীরভূমি ছেড়ে অনেক দূরে, অন্য একটা তপ্ত, দ্বিপ্রাহরিক আকাশের নিচে, চিরন্তন এক আশ্চর্য নগরে, বলনাচের ঝলকে, সঙ্গীতের সংঘোষে, ঝাড়ে ঝাড়ে বাতির প্রাসাদে (অবশ্য-অবশ্যই প্রাসাদে), গোলাপ আর মিরটল ফুলে ভরা ঝুল-বারান্দায়, যেখানে মেয়েটি তাকে চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি খুলে ফেলবে ছদ্মবেশী নাচের মুখোশ, এবং ফিসফিসিয়ে 'আমি কারো বাক্‌দত্তা নই' কথাটুকু বলে কম্পিত দেহে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার আলিঙ্গনে এবং উল্লাসে অস্ফুট চিৎকার করে তারা জড়িয়ে ধরবে পরস্পরকে, মুহূর্তে ভুলে যাবে দুঃখ, বিরহ, যন্ত্রণা, গোমড়া-মুখো বাড়ি আর বুড়োটাকে, দূর স্বদেশের বিষণ্ণ বাগানটাকে, সেই বেঞ্চিটাকেও যেখানে শেষ উদগ্র চুম্বনের পর হতাশায় বেদনায় আড়ষ্ট করে দেওয়া তার আলিঙ্গন খসিয়ে সে চলে গিয়েছিল। ...সত্যি নাস্তেনকা, পাশের বাগান থেকে চুরি করা আপেলটি সবে পকেটে ঢুকিয়েছে এমন

এক বালকের মতো আমি ছটফট করে উঠে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে লাল হয়ে উঠেছিলাম বৈকি যখন কিনা ঢেঙা, তাগড়াই, রগচড়ে ভাঁড় কে একটি ছোকরা, অনাহূত কে এক বন্ধু দরজা খুলে যেন কিছুই হয় নি এমনি ঢঙে হাঁক দিলে, 'আমি ভায়া এইমাত্র আসছি পাভলভ্স্ক থেকে!' হায় ভগবান, বৃদ্ধ কাউন্ট মারা গেছে, শুরু হচ্ছে অবর্ণনীয় সুখের দিন, এমন সময় কিনা লোকে আসছে পাভলভ্স্ক থেকে!'

আমার করুণ বিষাদোচ্ছ্বাস শেষ করে আমি করুণভাবে চুপ করে রইলাম। মনে আছে, সাংঘাতিক ইচ্ছে হয়েছিল কোনোক্রমে জোর করে হোহো করে হেসে উঠি কেননা আমি টের পাচ্ছিলাম যে আমার ভেতর নড়েচড়ে উঠছে কী একটা বাচ্চা শয়তান, আমার গলা আটকে আসছে, কেঁপে উঠছে থুতনি, ক্রমেই সজল হয়ে উঠছে চোখ... বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটি বড়ো বড়ো করে নাস্তেনকা এতক্ষণ আমার কথা শুনছিল, ভেবেছিলাম এবার সে তার ছেলেমানুষি, অদম্য ফুর্তির হাসিতে হেসে উঠবে, ফলে অনুতাপই হচ্ছিল যে বাড়াবাড়ি করেছি, যা আমার বুকের মধ্যে বহুদিন থেকে ফুঁসে উঠছে, যেটা আমি অমন বইয়ের ভাষায় বলতে পারছি কারণ নিজের ওপর দণ্ডাজ্ঞা আমি আগেই তৈরি করে রেখেছিলাম, এবং আমাকে কেউ বুঝবে এমন আশা না রেখেই এখন সে দণ্ডাজ্ঞা পাঠ না করে, কবুল না করে যে পারলাম না, এসব খামোকাই। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে নাস্তেনকা চুপ করে রইল, খানিক বাদে সামান্য চাপ দিল আমার হাতে, কেমন যেন ভীরু ভীরু দরদে জিগ্যেস করলে:

'সত্যিই কি এমনি করে আপনি সারা জীবন কাটিয়েছেন?'

বললাম, 'সারা জীবন নাস্তেনকা, সারা জীবন, মনে হয় ওইভাবেই সেটার শেষও হবে!'

'না, তা চলে না,' অস্থির হয়ে সে বললে, 'তা হবে না। আমিও তো সারা জীবন কাটাচ্ছি ঠাকুমার কাছে। কিন্তু এভাবে দিন কাটানো যে খারাপ তা জানেন?'

'জানি নাস্তেনকা, জানি!' ভাবাবেগ আর চেপে রাখতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'আর এখনই আমি সবচেয়ে বেশি করে বুঝছি যে বৃথায় আমি আমার সেরা বছরগুলো খুইয়েছি! এখন সেটা আমি জেনেছি আর সে চেতনায় বেশি কষ্ট হচ্ছে আমার, কেননা আমায় সেকথা বলে, প্রমাণ

করে দেবার জন্যে স্বয়ং ঈশ্বরই আপনাকে, আমার বরদা দেবীকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে। এখন, আমি যখন আপনার কাছে বসে কথা কইছি আপনার সঙ্গে, তখন ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভয় হচ্ছে আমার, কেননা ভবিষ্যতে ফের তো সেই একাকিত্ব, ফের এই ছাতা-পড়া নিষ্প্রয়োজন জীবন আর আপনার পাশাপাশি আমি যখন বাস্তবে এতটা সুখী, তখন স্বপ্ন দেখার কী রইল আমার! আহ্, ধন্য হোন লক্ষ্মী মেয়ে, প্রথমেই আমাকে ফেরান নি আপনি, জীবনের অন্তত দুটি সন্ধ্যা আমি যে বেঁচে থেকেছি একথা বলতে পারছি আজ!'

'ও, না, না!' চেঁচিয়ে উঠল নাস্তেনকা, জল চিকচিক করে উঠল তার চোখে, 'না, না, তা আর হবে না, অমনভাবে বিদায় নেব না আমরা! দুই সন্ধ্যা আর-কি!'

'আহ্ নাস্তেনকা, নাস্তেনকা! জানেন কি, কতদিনের জন্যে আপনি আমায় নিজের কাছে ফিরিয়ে দিলেন? জানেন, কোনো কোনো সময় আমি নিজেকে যা ভাবতাম তেমন হীন আর ভাবব না এবার থেকে? জানেন, জীবনে দোষ আর অপরাধ করেছি কেননা এমন জীবনটাই যে দোষ, অপরাধ, সেকথা ভেবে কষ্ট দেব না নিজেকে! আর ভাববেন না যে আমি কোনো কিছু অতিরঞ্জিত করে বলেছি, দোহাই ভগবান, সেটা ভাববেন না, নাস্তেনকা, কেননা মাঝে মাঝে এত কষ্ট লাগে, এত কষ্ট... কেননা সেসব মুহূর্তে আমার মনে হতে থাকে যে সত্যিকারের জীবনযাপনের সাধ্য আমার কখনো হবে না, কেননা আমার ধারণাই হয়ে গেছে যে বাস্তবের সঙ্গে তাল দিতে আমি পারি না, তার সব বোধ আমি হারিয়েছি, কেননা, শেষত, আমি নিজেই অভিশপ্ত করেছি নিজেকে; কেননা আমার অতিকল্পনায় ভরা রাতগুলোর পরে আসে অপ্রমত্ত মুহূর্ত, সে ভয়ানক! অথচ কানে আসে জীবনের ঘূর্ণিঝড়ে সশব্দে পাক খাচ্ছে লোকের ভিঁড়, কানে আসে, দেখতে পাই কিভাবে দিন কাটাচ্ছে মানুষ, দিন কাটাচ্ছে বাস্তবে, দেখতে পাই, জীবন তাদের অবাধ, স্বপ্নের মতো, কল্পমায়ার মতো তা ভেসে যায় না, জীবন তাদের সর্বদা নবীভূত, সর্বদা নবীন, তার কোনো একটা ঘণ্টা অন্যটার মতো নয়, অন্য দিকে বিষণ্ণ, ওঁছা রকমের একঘেয়ে ভীতগ্রস্ত অতিকল্পনা ছায়ার, ভাবকল্পের দাস, প্রথম সেই মেঘখানার দাস যা আচম্বিতে সূর্যকে ঢেকে দিয়ে সত্যিকারের পিটারবুর্গ হৃদয়কে মুচড়ে

তোলে কষ্টে—যে হৃদয়ের কাছে সূর্য অত আদরণীয়—আর কী অতিকল্পনাই না সে কষ্টে! টের পাই সেটা ক্লান্ত হয়ে পড়বে অবশেষে, অবিরাম উত্তেজনায় ফুরিয়ে যাবে এই 'অফুরান' অতিকল্পনা, কেননা আমার তো বয়স হচ্ছে, কাটিয়ে উঠছি আগেকার আদর্শ; সেগুলো বেড়ে ওঠে ধুলোয়, ভেঙে পড়া টুকরোয়; আর অন্য জীবন যখন নেই, তখন সেটা গড়তে হবে এই ভাঙা টুকরোগুলো দিয়েই। অথচ প্রাণ যেন অন্য কী একটা চায়! আর বৃথাই স্বপ্নজীবী তার পুরনো স্বপ্নগুলোর মধ্যে খোঁড়াখুঁড়ি করে, যেন এই ভস্মস্তূপের মধ্যে অন্তত একটা ফুলকি সে পেয়ে যাবে যাতে ফুঁ দিয়ে নতুন করে জ্বালিয়ে তোলা আগুনে সে তপ্ত করে তুলবে শীতল হয়ে আসা হৃদয়, ফের পুনরুজ্জীবিত করবে সবকিছু যা ছিল অত মধুর, অত মর্মস্পর্শী, যাতে টগবগ করে উঠেছে রক্ত, চোখে জল টেনে এনেছে আমার, রাজকীয় ছলনা করেছে! জানেন নাস্তেনকা কোথায় আমি পৌঁছেছি? জানেন কি, আমি এখন আমার অনুভূতিগুলোর বার্ষিকী পালনে বাধ্য, তার বার্ষিকী যা আগে ছিল অত মধুর এবং আসলে যার অস্তিত্বই ছিল না,—কেননা এই বার্ষিকীও পালিত হচ্ছে সেই একই নির্বোধ, কায়াহীন স্বপ্নচারণ দিয়ে— সেটা করব কারণ এইসব নির্বোধ স্বপ্নগুলোর তো আর অস্তিত্ব নেই, কিছু নেই তাদের কাটিয়ে ওঠার মতো: অথচ স্বপ্নও তো কাটিয়ে ওঠা যায়! জানেন, এক সময় নিজের মতো করে যেসব জায়গায় আনন্দ পেয়েছি, সেগুলো স্মরণ করতে, কিছু দিন পর পর সেখানে যেতে এখন ভালো লাগে আমার, যা অতীতের গর্ভে গেছে, আর ফেরার নয় তারই ধাঁচে গড়তে ভালোবাসি নিজের বর্তমানকে, ছায়ার মতো আমি ঘুরে বেড়াই পিটারবুর্গের রাস্তায় আর অলিগলিতে, অপ্রয়োজনে, লক্ষ্যহীন, বিষণ্ণ আর বিমর্ষ। কী সেসব স্মৃতি! যেমন, মনে পড়ছে, ঠিক এইখানে, ঠিক এক বছর আগে, ঠিক এই সময়টাতেই, এই ফুটপাথেই ঘুরে বেড়িয়েছি ঠিক এখনকার মতোই একা একা, বিষণ্ণ মনে! মনে পড়ছে, তখনো স্বপ্নগুলো ছিল ভারাক্রান্ত, যদিও আগেও তা বিশেষ ভালো ছিল না, তাহলেও দিন কাটানো যেত যেন কিছু সহজে, নিশ্চিন্তে, এই যে দুশ্চিন্তাটা আমায় এখন ছেঁকে ধরেছে, সেটা ছিল না; ছিল না এই বিমর্ষ, অপ্রসন্ন বিবেকদংশন যা দিনে রাতে শান্তি দিচ্ছে না আমায়। নিজেকেই শুধাই: আমার স্বপ্নগুলো গেল কোথায়? মাথা নেড়ে বলতে হয়, কী দ্রুত

কেটে যাচ্ছে বছরগুলো! ফের নিজেকে শুধাই: নিজের বছরগুলো নিয়ে কী করলে তুমি? কোথায় কবর দিলে তোমার সেরা সময়টাকে? তুমি কি বেঁচে ছিলে নাকি ছিলে না? নিজেকে বলি, সাবধান, দ্যাখো কী ঠাণ্ডা হয়ে আসছে পৃথিবী। আরো কিছু বছর কাটতেই তার পেছু পেছু আসবে নিরানন্দ নিঃসঙ্গতা, আসবে ক্রাচে ভর দিয়ে থুড়থুড়ে বার্ধক্য, তার পেছনে মন-পোড়ানি আর অসন্তুষ্টি। বিবর্ণ হয়ে যাবে তোমার অতিকল্পনার জগৎ, শুকিয়ে যাবে, নেতিয়ে পড়বে, ঝরে পড়বে গাছের ঝরা পাতার মতো... ওহ্ নাস্তেনকা! একা, একেবারে একা থাকতে যে কষ্ট হবে, এমনকি খেদ করার মতোও যে কিছু থাকবে না, একেবারে কিছু না... কেননা যা হারাল, তার কিছুই তো কিছু না, সবই নির্বোধ, প্রকাণ্ড একটা শূন্য, ছিল শুধুই স্বপ্নচারণ!'

'কিন্তু আমার মন আর গলিয়ে দেবেন না, দোহাই!' চোখ থেকে গড়িয়ে আসা জলটুকু মুছে বললে নাস্তেনকা, 'এবার সব চুকে গেল! এবার থেকে আমরা রইলাম দুজনে, এবার আমার যাই ঘটুক, ছাড়াছাড়ি হব না কখনো। শুনুন, আমি নেহাৎ সাধারণ একটা মেয়ে, পড়াশুনা আমার কম, যদিও ঠাকুমা একজন গৃহশিক্ষক রেখেছিলেন। কিন্তু সত্যি, আমি আপনাকে বুঝতে পারছি কেননা আপনি এখন যা বললেন সেটা আমার জীবনেও ঘটেছে, যখন ঠাকুমা আমার ফ্রক পিন-বন্ধ করে রেখেছিলেন। অবিশ্যি আপনি যেমন সুন্দর করে বললেন সেটা আমি বলতে পারতাম না, আমি তো পড়াশুনা করি নি,' ভয়ে ভয়ে সে যোগ দিলে, কারণ আমার করুণাত্মক ভাষণ আর উচ্চ গ্রামের স্টাইলের প্রতি তখনো তার মনে একটা সম্ভ্রম ছিল, 'কিন্তু আপনি নিজেকে খোলাখুলি মেলে ধরেছেন তার জন্যে আমি আনন্দিত। এখন আমি আপনাকে জানলাম, পুরোপুরি জেনেছি। কী জানেন? আমিও আপনাকে আমার কাহিনী বলতে চাই, কিছু না রেখে ঢেকে। তারপর আপনি আমায় উপদেশ দেবেন। আপনি বুদ্ধিমান লোক; কথা দিন যে আমায় কিছু পরামর্শ দেবেন?'

বললাম, 'আহ্ নাস্তেনকা, আমি কখনোই উপদেষ্টার কাজ করি নি, বুদ্ধিমান উপদেষ্টা তো দূরের কথা, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমরা যদি বরাবর এইরকম থাকি, তাহলে সেটা খুবই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, দুজন দুজনকে খুবই বুদ্ধিমান পরামর্শ-টরামর্শ দেব! কিন্তু লক্ষ্মীটি আমার

নাস্তেনকা, কী পরামর্শ দেব আপনাকে? সোজাসুজি বলুন, আমার মন এখন ভারি খুশি, সুখী, ভয়ডর নেই আমার, বুদ্ধি খুলেছে, কথা হাতড়াতে হবে না।'

'না, না!' হেসে আমায় বাধা দিলে নাস্তেনকা, 'শুধু বুদ্ধিমান পরামর্শ নয়, আমার দরকার গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ, ভাইয়ের মতো, যেন চিরকাল আপনি ভালোবেসে এসেছেন আমায়!'

'চলবে, নাস্তেনকা, চলবে!' উল্লাসে বলে উঠলাম আমি, 'আর আমি যদি আপনাকে ইতিমধ্যেই বিশ বছর ধরে ভালোবেসে এসে থাকি তাহলেও এখনকার মতো এমন করে ভালোবাসি নি কখনো!'

'আপনার হাতটা দিন,' নাস্তেনকা বললে।

'এই নিন!' আমি বললাম হাত বাড়িয়ে দিয়ে।

'তাহলে আমার কাহিনী শুরু করা যাক!'

নাস্তেনকার কাহিনী

'আমার আধখানা ইতিহাস তো আপনার জানাই আছে, মানে আপনি জানেন যে আমার এক বুড়ি ঠাকুমা আছে...'

'বাকি আধখানাও যদি এমনি সংক্ষিপ্ত হয় তাহলে...' হেসে আমি মন্তব্য করতে যাচ্ছিলাম।

'চুপ করে শুনুন। প্রথমে একটা শর্ত: আমায় বাধা দেবেন না, নইলে আমি দিশেহারা হয়ে যাব। তাহলে শান্ত হয়ে শুনুন।'

'আমার এক বুড়ি ঠাকুমা আছেন। খুব ছোটোতেই আমি তাঁর জিম্মায় গিয়ে পড়ি কেননা আমার মা-বাবা দুজনেই মারা যান। ঠাকুমা আগে বড়োলোক ছিলেন বলেই ধরতে হয় কেননা এখনো সেই সুদিনগুলোর কথা তাঁর মনে পড়ে। তিনিই আমাকে ফরাসি শেখান এবং পরে একজন গৃহশিক্ষক রাখেন। আমার যখন পনেরো বছর বয়স (এখন আমি সতেরো), তখন পড়াশুনার পাঠ আমাদের চুকল। এই সময় আমি বেয়াদপি শুরু করি, কী যে করেছিলাম সেটা আপনাকে বলব না; শুধু এইটুকু বলি যে সেটা তেমন গুরুতর নয়। শুধু একদিন

সকালে ঠাকুমা আমায় ডেকে বললেন যে তিনি যেহেতু অন্ধ, আমার ওপর নজর রাখতে পারেন না, তাই পিন দিয়ে তাঁর পোশাকের সঙ্গে আমার ফ্রক গেঁথে দিয়ে বললেন, অবিশ্যি ভালো হয়ে যদি না উঠি তাহলে এইভাবেই ওঁর সঙ্গে বসে থাকতে হবে সারা জীবন। মোট কথা, প্রথম দিকে কিছুতেই ছাড়ান পাওয়া যেত না: কাজ করি, কি বই পড়ি, কি পড়াশুনায় বসি, সবই ঠাকুমার কাছে। আমি একবার চালাকি করার চেষ্টা করে ফেকলাকে বোঝালাম আমার জায়গায় বসতে। ফেকলা আমাদের চাকরানি, বদ্ধ কালা। ফেকলা বসলে আমার জায়গায়, ঠাকুমা ইতিমধ্যে আরাম কেদারায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আমি গেলাম অল্প দূরে আমার সখির কাছে। কিন্তু পরিণামটা হল খারাপ। আমি না থাকতে ঘুম ভেঙে যায় ঠাকুমার, কী একটা চান আমার কাছে, ভেবেছিলেন আমি তখনো লক্ষ্মীর মতো বসে আছি নিজের জায়গাটিতে। ফেকলা দেখে, ঠাকুমা কী চাইছেন, কিন্তু শুনতে তো পায় না কী চাইছেন, কী করা যায় তা নিয়ে অনেক ভেবে-চিন্তে সে পিন খুলে পালাল...'

এইখানে কথা থামিয়ে হাসতে লাগল নাস্তেনকা, আমিও যোগ দিলাম তার হাসিতে। সঙ্গে সঙ্গে সে হাসি থামাল।

'শুনুন, ঠাকুমাকে নিয়ে হাসবেন না। আমি হাসছি কারণ এটা হাসির ব্যাপার... কী করা যাবে যদি ঠাকুমা হন সত্যিই অমনি, তাহলেও আমি তাঁকে খানিকটা ভালোবাসি। তা, তখন প্রতিফল পেলাম আমি, ফের আমায় তিনি স্বস্থানে বসালেন, আর মাগো, নড়াচড়া করারও উপায় রইল না।

'যাক গে, আমি আপনাকে বলতে ভুলে গেছি যে আমাদের, মানে ঠাকুমার নিজস্ব বাড়ি আছে, মানে ছোটো একটি বাড়ি, মাত্র তিনখানা তার জানলা, সবটাই কাঠে বানানো, আর ঠাকুমার মতোই প্রাচীন। ওপরে একটু আধতলা গোছের। নতুন বাসিন্দা এসে উঠল ওই আধতলাটায়...'

'বুড়ো বাসিন্দাও ছিল তাহলে?' কথার পিঠে মন্তব্য করলাম।

'ছিল বৈকি,' জবাব দিলে নাস্তেনকা, 'আর আপনার চেয়েও সে বেশি চুপ করে থাকতে পারত। সত্যি, জিব সে প্রায় নাড়াত না। লোকটা বুড়ো, শুকনোটে, কালা, চোখে দেখে না, খোঁড়ায়, শেষ পর্যন্ত দুনিয়ায় থাকা ওর আর চলল না, মারা গেল; তখন নতুন বাসিন্দার দরকার পড়ল, কেননা ভাড়াটে ছাড়া আমাদের চলে না? ঠাকুমার পেনশনটুকুই আমাদের সম্বল।

নতুন বাসিন্দা যেন ইচ্ছে করেই হল তরুণ, স্থানীয় লোক নয়, বাইরে থেকে এসেছে। ও অনেক দড়াদড়ি না করায় ঠাকুমা ওকেই ভাড়া দিলেন; পরে জিগ্যেস করলেন আমায়, 'কী নাস্তেনকা, আমাদের নতুন ভাড়াটে কম-বয়সী নাকি?' মিথ্যে বলার ইচ্ছে হল না আমার। বললাম, 'এই একরকম, একেবারে কম বয়স তা নয়, তবে বুড়োও নয়।' 'দেখতে ভালো?' জিগ্যেস করলেন ঠাকুমা।

'ফের মিথ্যে বলতে চাইলাম না, জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ ঠাকুমা, চেহারাটা ভালোই।' আর ঠাকুমা বলেন, 'ওহ্, শাস্তি! শাস্তি! তোকে এটা বলে রাখছি নাতনি যাতে ওর দিকে তুই নজর না দিস। এহ্, কী যুগ পড়েছে! সামান্য এক ভাড়াটে, তাও আবার কিনা দেখতে ভালো; আগের কালে এমনটা হত না!'

'ঠাকুমার কেবল ঐ সেকালের কথা! সেকালে উনি ছিলেন বেশ যুবতী, সূর্যও সেকালে ছিল বেশি গরম, ক্রীম সেকালে এত তাড়াতাড়ি টকে যেত না — সবই সেকালে! আমি বসে বসে ভাবি, ঠাকুমাটা কী, নিজেই আমায় উপদেশ দিলেন, জিগ্যেস করলেন দেখতে ভালো নাকি, কম-বয়সী নাকি? সে শুধু ঐ পর্যন্ত, মনে হল বললেন, ব্যস, ফের ঘর গুনে গুনে মোজা বুনতে শুরু করলেন; পরে একেবারেই ভুলে গেলেন সব।

'একদিন সকালে ভাড়াটে আমাদের কাছে এসে বললে যে তার ঘরখানায় দেয়াল-কাগজ সেঁটে দেবার কথা দেওয়া হয়েছিল। চলল কথার পিঠে কথা, দিদিমা তো আবার কথা কইতে ভালোবাসেন, বললেন, 'যা নাস্তেনকা, আমার শোবার ঘর থেকে হিসাবটা নিয়ে আয়।' কেন জানি না আমি লাল হয়ে তক্ষুনি লাফিয়ে উঠলাম, খেয়ালই ছিল না যে পিনগাঁথা হয়ে আছি। ভাড়াটে যাতে না দেখতে পায় এইভাবে কোথায় চুপি চুপি পিন খুলব, তা না — এমনভাবে ছুটতে গেলাম যে ঠাকুমার কেদারা সরে গেল। যেই দেখলাম যে ভাড়াটে এখন আমার ব্যাপারটা সব জেনে ফেলেছে, একেবারে লাল হয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর কেঁদে ফেললাম হঠাৎ — এত লজ্জা আর দুঃখ হল সেই মুহূর্তে যে মুখ তুলে চাইবার সাধ্য ছিল না! ঠাকুমা ওদিকে চেঁচাচ্ছেন, 'দাঁড়িয়ে আছিস যে!' কান্না আমার আরো বেড়ে যায়... আমি লজ্জা পাচ্ছি দেখে মাথা নুইয়ে সে চলে গেল তক্ষুনি!

'সেই থেকে বারান্দায় একটু শব্দ শোনা গেলেই আমি মরার মতো

হয়ে যাই। মনে হয়, এই বুঝি ভাড়াটে আসছে, কী হয় বলা যায় না ভেবে পিন খসিয়ে রাখি। কিন্তু সে আর এল না। দু'সপ্তাহ কাটল; ভাড়াটে ফেকলাকে দিয়ে বলে পাঠাল যে তার কাছে ফরাসী বই আছে অনেক, সবই ভালো ভালো, পড়ার মতো: আমি সেগুলো যদি পড়ি, একঘেয়ে লাগবে না, ঠাকুমা কি চান সেটা? ঠাকুমা ধন্যবাদ সহকারে মত দিলেন, শুধু কেবলি জিগ্যেস করতে লাগলেন বইগুলোয় নৈতিকতা মানা হয়েছে কিনা, বলেন, যদি অনৈতিক বই হয় তাহলে নাস্তেনকা, তোর পড়া চলবে না, কুশিক্ষা হবে।

''কিন্তু কী শিখব ঠাকুমা? কী লেখা থাকে তাতে?'

'বলেন, 'হ্যাঁ, তাতে লেখা থাকে ধর্মভীরু মেয়েদের কিভাবে ফোঁসলায় ছোকরারা, বিয়ে করতে চায় এই অজুহাতে বার করে আনে পিতৃগৃহ থেকে, তারপর অভাগা মেয়েটিকে ছেড়ে দেয় তার ভাগ্যের হাতে, অতি শোচনীয় অবস্থায় তারা মারা যায়। 'আমি,' ঠাকুমা বললেন, 'এসব বই অনেক পড়েছি, সবই চমৎকার করে লেখা, চুপচাপে পড়তে পড়তে রাত কেটে যেত।' বলেন, 'তাই নাস্তেনকা, পড়বি না, দেখবি কী বই ও পাঠাল।'

''সবই ওয়ালটেয়ার স্কটের উপন্যাস ঠাকুমা।'

''ওয়ালটেয়ার স্কটের উপন্যাস? খুব হয়েছে, গোপন লীলারঙ্গ কিছু নেই তাতে? দেখিস, বইয়ের মধ্যে প্রেমপত্র-টত্র কিছু রেখে দেয় নি তো?'

'বললাম, 'না ঠাকুমা, তেমন চিরকুট-টিরকুট কিছু নেই।'

''মলাটের তলে দ্যাখ, গুণ্ডগুলো তাই করে।'

''না ঠাকুমা, মলাটের তলেও নেই।'

''তা বেশ!'

'তাই আমরা ওয়ালটেয়ার স্কট পড়তে শুরু করলাম, মাসখানেকের ভেতর শেষ করলাম প্রায় অর্ধেকটা। তারপর সে আরো বই পাঠাতে লাগল, পুশকিনও পাঠিয়েছিল, ফলে শেষকালে আমি বই ছাড়া আর থাকতে পারতাম না, চীনা রাজপুত্রকে বিয়ে করার ভাবনা ছেড়ে দিলাম।

'এইরকম যখন অবস্থা তখন একবার সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল আমাদের ভাড়াটের সঙ্গে। কী একটা কাজে ঠাকুমা পাঠিয়েছিলেন আমায়। ও থেমে গেল, আমি লাল হয়ে উঠলাম, সেও লাল হয়ে উঠল; তবে হেসে উঠে সম্ভাষণ জানালে, জিগ্যেস করলে ঠাকুমার স্বাস্থ্যের কথা, বললে, 'কী, বই

পড়লেন?' বললাম, 'পড়েছি।' 'তা কোনটা আপনার বেশি ভালো লাগল?' বললাম, 'আইভানহো আর পুশকিন সবচেয়ে ভালো লেগেছে।' সেবার ঐ পর্যন্তই।

'এক সপ্তাহ বাদে আবার ওর মুখোমুখি পড়ে গেলাম সিঁড়িতে। এবার ঠাকুমা পাঠান নি, আমার নিজেরই কী একটা দরকার ছিল। বেলা তিনটে তখন, এই সময়টায় বাড়ি ফেরে ভাড়াটে। বললে, 'নমস্কার!' আমিও ওকে প্রতিনমস্কার জানালাম।

''ঠাকুমার সঙ্গে সারা দিন বসে থাকতে একঘেয়ে লাগে না আপনার?'

'একথা জিগ্যেস করতেই জানি না কেন লাল হয়ে উঠলাম, লজ্জা হল, আহত বোধ করলাম বোঝা যায় এইজন্যে যে অন্য লোকেও এবার এই ব্যাপারটা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। জবাব না দিয়ে চলে যেতে চাইছিলাম, কিন্তু শক্তিতে কুলাল না।

'বললে, 'শুনুন, আপনি ভালো মেয়ে! আপনার সঙ্গে এভাবে কথা কইছি বলে মাপ করবেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি আপনার ঠাকুমার চেয়েও আপনার মঙ্গল চাই বেশি। আপনার কি এমন কোনো বান্ধবী নেই যার কাছে বেড়াতে যেতে পারেন?'

'বললাম, কেউ নেই, একজন ছিল মাশেনকা, সেও চলে গেছে প্স্কভে।

'বললে, 'আচ্ছা, আমার সঙ্গে থিয়েটারে যেতে চান?'

''থিয়েটারে? কিন্তু ঠাকুমা?'

'বললে, 'আপনি চুপিচুপি ঠাকুমার কাছ থেকে...'

'বললাম, 'না, ঠাকুমাকে ঠকাতে চাই না আমি। বিদায়।'

''তাহলে বিদায়,' তবে নিজে আর কিছু বললে না।

'শুধু দিবাহারের পর ও এল আমাদের কাছে; বসলে, অনেকখন কথা কইলে ঠাকুমার সঙ্গে: কেমন আছেন, কোথাও যাচ্ছেন কিনা, পরিচিত কেউ আছে কিনা এইসব জিগ্যেস করলে, তারপর হঠাৎ বললে, 'আজ অপেরায় বক্সের টিকিট কেটেছি: 'সেভেলিয়ার নাপিত' দেখানো হচ্ছে; পরিচিত কিছু লোক যাবে বলেছিল, কিন্তু পরে না করে দিয়েছে, টিকিট রয়ে গেছে আমার কাছেই।'

''সেভেলিয়ার নাপিত!' চেঁচিয়ে উঠলেন ঠাকুমা, 'এ সেই নাপিত যা দেখানো হত সেকালে?'

'হ্যাঁ, সেই নাপিত,' বলে সে চাইল আমার দিকে। আমি সবই টের পেয়ে লাল হয়ে উঠলাম, প্রত্যাশায় ঢিপঢিপ করে উঠল বুক!

'ঠাকুমা বললেন, 'বাঃ, জানব না কেন! নিজেই যে আমি সেকালে ঘরোয়া থিয়েটারে রোজিনার পার্টে নামতাম!'

'ভাড়াটে বললে, 'আজ যাবেন কি? টিকিটটা মিছিমিছি নষ্ট হবে।'

'ঠাকুমা বললে, 'তা বেশ যাব, না যাবার কী আছে? তবে আমার এই নাস্তেনকা থিয়েটারে যায় নি কখনো।'

'ভগবান, কী আনন্দ! তক্ষুনি আমরা তোড়জোড় করে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লাম। ঠাকুমা অন্ধ হলেও সঙ্গীত শোনার ইচ্ছে ছিল তাঁর, তাছাড়া বুড়ির মনটা ভালো: আমায় তিনি একটু আনন্দ দিতে চাইছিলেন, আমরা নিজেরা তো আর কখনো কোথাও যাই না। 'সেভেলিয়ার নাপিত' কেমন লাগল সেকথা বলতে চাই না, তবে সেদিন সারাটা সন্ধে আমাদের ভাড়াটে আমার দিকে এমন সুন্দর করে চাইছিল, এমন ভালো ভালো কথা কইছিল যে আমি তক্ষুনি বুঝলাম যে আমি একা ওর সঙ্গে থিয়েটারে যাই, সকালে এই প্রস্তাব দিয়ে ও আমায় পরীক্ষা করছিল শুধু। ওহ্, কী আনন্দ! শুতে আমি গেলাম এমন গর্ব নিয়ে, এত উৎফুল্ল হয়ে, বুক আমার এতই ঢিপঢিপ করছিল যে খানিকটা জ্বরই এসে গেল, সারা রাত 'সেভেলিয়ার নাপিত' নিয়ে ভুল বকলাম।

'ভেবেছিলাম, এরপর সে ঘন ঘনই আসতে থাকবে, কিন্তু সেটি হল না। প্রায় ছেড়েই দিল আসা। মানে, আসত হয়ত মাসে একবার, তাও শুধু থিয়েটারে যাবার নেমন্তন্ন করতে। এরপর বার দুয়েক আমরা ফের থিয়েটারে যাই, তবে তাতে আদৌ খুশি হই নি আমি। দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমি ঠাকুমার কাছে অমন খোঁয়াড়-বন্দী হয়ে আছি বলে স্রেফ করুণা হচ্ছে ওর, তার বেশি কিছু নয়। দিন যত যায়, আমার দশা দাঁড়াল এই: বসে থাকতে, বই পড়তে, কাজ করতে মন লাগে না, মাঝে মাঝে হেসে উঠি, ইচ্ছে করে ঠাকুমার পেছনে লাগি, কখনো আবার স্রেফ কেঁদে ফেলি। শেষে রোগা হয়ে গেলাম আমি, প্রায় অসুখে পড়ার জোগাড়। অপেরার মরশুম শেষ হয়ে গিয়েছিল, ভাড়াটেও আমাদের কাছে আসা বন্ধ করে দিলে একেবারে; যখন আমাদের দেখা হত—বলাই বাহুল্য সেই সিঁড়িটাতেই—এমন নীরবে, এমন গম্ভীরভাবে সে মাথা নোয়াত যেন কথা

কইতেই চায় না, নেমে যেত নিচে, একেবারে অলিন্দে, আর আমি তখনো সিঁড়ির মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে, চেরি ফলের মতো টকটকে, কেননা ওর সঙ্গে দেখা হতেই সমস্ত রক্ত উঠে আসত মাথায়।

'এবার শেষ। ঠিক এক বছর আগে মে মাসে ভাড়াটে আমাদের কাছে এসে ঠাকুমাকে বললে যে এখানকার কাজ সে সব চুকিয়ে দিয়েছে, ফের এক বছরের জন্যে তাকে যেতে হবে মস্কোয়। সেকথা শুনতেই আমি ফ্যাকাশে হয়ে মরার মতো ধুপ করে বসে পড়লাম চেয়ারে। ঠাকুমা কিছুই খেয়াল করেন নি, আর সে, আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে এইকথা বলে মাথা নুইয়ে চলে গেল।

'কী করি আমি? অনেক ভাবলাম, মন-পোড়ানি গেল অনেক, শেষে মন স্থির করে ফেললাম। কাল ওর চলে যাবার কথা, ঠিক করলাম সব শেষ করে দেব সন্ধ্যায়, ঠাকুমা যখন ঘুমতে যাবেন। ঘটলও তাই। যত গাউন ছিল, যত অন্তর্বাস দরকার সব পোঁটলা বেঁধে, সেটি হাতে নিয়ে আমি জীবন্মৃত অবস্থায় উঠে গেলাম আধতলায় আমাদের ভাড়াটের কাছে। মনে হয় সিঁড়িটা উঠতে লেগেছিল পুরো এক ঘণ্টা। যখন ওর দরজা খুললাম, আমায় দেখে সে একেবারে চেঁচিয়ে উঠল। ভেবেছিল আমি একটা প্রেতচ্ছায়া, ছুটল আমাকে জল দেবার জন্যে কেননা পায়ের ওপর খাড়া হয়ে থাকতে পারছিলাম না। বুক এমন ধুকধুক করছিল যে মাথা ব্যথা করে উঠল, আচ্ছন্ন হয়ে এল চেতনা। যখন সম্বিত ফিরল, প্রথমেই পুঁটলিটা রাখলাম ওর কাছে বিছানায়, আমিও পাশে বসলাম, তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললাম অঝোরে। ও মনে হয় তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বুঝেছিল, বিবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমার সামনে, এমন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে যে বুক আমার ফেটে যেতে লাগল।

'ও বললে, 'শুনুন, শুনুন নাস্তেনকা, কিছুই করার উপায় নেই আমার; আমি গরিব লোক: কিছুই আমার নেই, এমনকি ভালোমতো একটা থাকার জায়গাও না। আপনাকে বিয়ে করলে চালাব কী করে?'

'অনেকখন কথা কইলাম আমরা, শেষে আমি খেপে উঠলাম, বললাম যে ঠাকুমার সঙ্গে থাকতে পারছি না, পালাব ওঁর কাছ থেকে, চাই না যে উনি আমাকে পিন বিঁধে রাখুন, ও চাইলেই আমি ওর সঙ্গে চলে যাব মস্কোয়, কেননা ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না। লজ্জা, ভালোবাসা, গর্ব—

সবই একসঙ্গে উথলে উঠছিল আমার ভেতর, প্রায় একটা অঙ্গবিক্ষেপে গড়িয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম বিছানায়। ভারি ভয় হচ্ছিল প্রত্যাখ্যানে!

'কয়েক মিনিট ও বসে রইল চুপ করে, তারপর উঠে দাঁড়াল। আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে সেও সজল চোখে বলতে শুরু করলে: .

' 'শুনুন আমার লক্ষ্মী, মিষ্টি নাস্তেনকা, শুনুন। আপনার কাছে শপথ করছি, যদি কখনো বিয়ে করার মতো টাকা হয় আমার, তাহলে অবশ্যই আমার সুখদাত্রী হবেন আপনিই; আপনাকে নিশ্চয় করে বলছি, এখন কেবল আপনি আমায় সুখী করতে পারেন। শুনুন: আমি মস্কো যাচ্ছি, সেখানে থাকব পুরো এক বছর। নিজের একটা সুব্যবস্থা করে নিতে পারব আশা করি। যখন ফিরব আমার জন্যে আপনার ভালোবাসা তখনো থাকলে, শপথ করছি, সুখী হব আমরা। এখন কিন্তু অসম্ভব, আমি পারি না, কোনো একটা কথা দেবারও অধিকার নেই আমার। কিন্তু ফের বলি, এক বছরের মধ্যে না হয়ে উঠলে কখনো তো হবেই হবে। বলাই বাহুল্য যাতে আপনি আমার বদলে অন্য কাউকে পছন্দ না করেন, সেই কারণে কোনো একটা কথা দিয়ে আপনাকে বেঁধে রাখতে আমি পারি না, সে স্পর্ধা নেই আমার।'

'এইকথা বলে পরের দিন সে চলে গেল। একসঙ্গে ঠিক করলাম যে ঠাকুমার কাছে এ সম্পর্কে একটা কথাও বলা হবে না। সেইটেই তার ইচ্ছে। এবার আমার গোটা কাহিনীটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঠিক এক বছর কেটেছে, ফিরে এসেছে ও, এখানে সে আছে তিন দিন, কিন্তু, কিন্তু...'

'কিন্তু কী?' শেষটুকু শোনার অধীরতায় চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

'কিন্তু এখনো পর্যন্ত দেখা করে নি!' যেন সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে জবাব দিলে নাস্তেনকা, 'কোনো পাত্তা নেই...'

এইখানে সে থেমে গিয়ে খানিক চুপ করে থেকে মাথা নোয়ালে, তারপর হঠাৎ হাত দিয়ে নিজেকে আড়াল করে এমনভাবে ডুকরে উঠল যে আমার বুকে মোচড় দিল।

এমন পরিণতি আমি একেবারেই আশা করি নি।

ভীরু ভীরু চোরা গলায় আমি বলতে শুরু করলাম, 'নাস্তেনকা! নাস্তেনকা! ভগবানের দোহাই, কাঁদবেন না! কেন জানেন? হয়ত এখনো সে এখানে আসে নি...'

'এখানেই, এখানেই আছে সে!' আমার কথার খেই ধরে বললে নাস্তেনকা, 'এখানেই, সেটা আমি জানি। তখনই, ওর যাবার আগের সেই সন্ধেতেই আমরা একটা কড়ার করেছিলাম: আপনাকে যা-যা বললাম সেসব কথা বলার পর শর্ত করে আমরা বেড়াতে আসি এখানে, তীরের ঠিক এই রাস্তাটায়। রাত তখন দশটা; এই বেঞ্চিটাতেই আমরা বসি; তখন আর কাঁদছিলাম না, ভারি ভালো লাগছিল ওর কথা শুনতে... ও বললে যে এখানে ফেরার পর তক্ষুনি সে আসবে আমাদের কাছে আর আমি যদি ওকে প্রত্যাখ্যান না করি, তাহলে সবই আমরা বলব ঠাকুমাকে। এখন তো ফিরেছে, কিন্তু এল কৈ, এল না যে!'

ফের তার চোখ ভরে উঠল জলে।

'হায় ভগবান! দুঃখে সাহায্য করা কি যায় না?' মরিয়া হয়ে বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে উঠলাম আমি, 'বলুন নাস্তেনকা, আমি যদি ওর কাছে যাই, সে কি হয় না?..'

হঠাৎ মাথা তুলে সে বললে, 'সে কি সম্ভব?'

সচেতন হয়ে আমি বললাম, 'না, বলাই বাহুল্য না! আচ্ছা, চিঠি লিখুন-না কেন।'

'না, সে অসম্ভব, ওটা চলে না!' দৃঢ়ভাবে সে বললে, কিন্তু ততক্ষণে আবার সে মাথা নিচু করেছে, আমার দিকে চাইছে না।

'কেন চলে না, কিসের জন্যে?' নিজের ভাবনাটায় মেতে উঠে আমি বলে গেলাম। 'কিরকম চিঠি জানেন নাস্তেনকা? চিঠি তো হয় নানা রকমের। ...আহ্ নাস্তেনকা, সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন আমায়, বিশ্বাস করুন! খারাপ মন্ত্রণা আমি আপনাকে দেব না। সবই ঠিক করে নেওয়া যাবে। প্রথম পদক্ষেপ তো আপনি করেছেন, তাহলে কেন এখন...'

'সে হয় না, হয় না! তাহলে আমি যেন জোর করে ওকে বেঁধে রাখতে চাইছি বলে দাঁড়াবে...'

'আহ্, নাস্তেনকা আমার!' ওর কথায় বাধা দিয়ে বললাম, একটু হেসেও ছিলাম, তা লুকাই নি, 'হয় না যদি, তা না হোক। তবে আপনিই ঠিক, কেননা সেই তো আপনাকে কথা দিয়েছিল। তাছাড়া সবকিছু থেকে আমার মনে হচ্ছে লোকটি সজ্জন, ভালো কাজই করেছে,' নিজের সিদ্ধান্ত আর প্রত্যয়ের যৌক্তিকতায় ক্রমেই উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি বলে চললাম,

'কী সে করেছে? নিজেকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেঁধেছে। সে বলেছে, বিয়ে যদি করতে হয় তাহলে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না; অথচ প্রত্যাখ্যান করার, এমনকি এখনো, পুরো স্বাধীনতা দিয়েছে আপনাকে... সেক্ষেত্রে আপনি প্রথম এগুতে পারেন, সে অধিকার আপনার আছে, ওর চেয়ে সুবিধা আপনার বেশি, এমনকি ধরা যাক ওর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি থেকে যদি ওকে মুক্তি দিতে চান তাহলেও...'

'আচ্ছা, আপনি কী লিখতেন?'

'কী?'

'মানে ওই চিঠিটা।'

'আমি লিখতাম, 'পরম কারুণিক মান্যবরেষু...''

'ওই 'মান্যবরেষু' কথাটা একান্তই দরকার কি?'

'অবশ্য-অবশ্যই! তবে কেন? আমার মনে হয়...'

'থাক-গে। তারপর!'

''মান্যবরেষু, মাপ করবেন যে...' কিন্তু না, মাপ-টাপ চাওয়ার কোনো দরকার নেই। ঘটনাটাই সব বলবে। সোজাসুজি লিখুন:

''আমিই আপনাকে লিখছি। আমার অধৈর্য ক্ষমা করবেন। কিন্তু সারা বছর আমি আশায় বুক বেঁধে সুখে ছিলাম: এখন যে সংশয়ের দিন সইতে পারছি না, সে কি আমার দোষ? এখন, আপনি যখন এসেছেন, হয়ত আপনার সংকল্প বদলেছে। তাহলে এই চিঠি আপনাকে জানাবে যে আমি গুঞ্জন করছি না, দোষ ধরছি না আপনার। আপনার হৃদয়ের ওপর যে আমার প্রভুত্ব নেই, তার জন্যে দোষী করছি না আপনাকে; এই আমার ভাগ্য!

'আপনি উদারচেতা, আমার এই অধীর ছত্রগুলো দেখে আপনি যেন না হাসেন, না দুঃখ করেন। মনে রাখবেন যে তা লিখছে এক অভাগা বালিকা, সে একাকিনী, তাকে শেখাবার, উপদেশ দেবার কেউ নেই, নিজের হৃদয়ের ওপর জোর খাটাতে সে কখনো পারে নি। এক মুহূর্তের জন্যেও যদি আমার মনে সংশয় জেগে থাকে, সেটা ক্ষমা করবেন। আপনাকে যে অত ভালোবেসেছিল এবং ভালোবাসে, মনে মনেও তাকে আঘাত দিতে আপনি অক্ষম।''

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই, এইটেই আমি ভেবেছিলাম!' চেঁচিয়ে উঠল

নাস্তেনকা, চোখ তার চিকচিক করছে আনন্দে, 'আপনি আমার সন্দেহের নিরসন করলেন, ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন! ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে!'

'কী জন্যে? ভগবান আমায় পাঠিয়েছেন বলে?' তার আনন্দিত মুখখানার দিকে তাকিয়ে সোল্লাসে জিগ্যেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ, অন্তত সেইটুকুর জন্যেই।'

'আহ্ নাস্তেনকা! কোনো লোককে আমরা যে ধন্যবাদ জানাই সেটা অন্তত এইজন্যে যে আমরা একসঙ্গে আছি। আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাব এইজন্যে যে আমাদের দেখা হয়েছে, সারা জীবন আপনার কথা আমি মনে রাখব।'

'নিন, হয়েছে, হয়েছে, এবার শুনুন, তখন এই শর্ত হয়েছিল যে আসা মাত্র আমাকে সে জানাবে, আমার পরিচিত, ভালোমানুষ, সাধারণ লোকজনদের একজনার কাছে চিঠি রেখে আসবে, যারা এ ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু জানে না; কিংবা আমার কাছে যদি চিঠি লেখা সম্ভব না হয়, কেননা চিঠিতে সব কথা তো আর সবসময় বলা যায় না, তাহলে আসা মাত্র সেই দিনই ঠিক রাত দশটার সময় সেইখানেই আসবে যেখানে দেখা করার কথা হয়েছিল। কিন্তু ও যে এসেছে সেটা আমি জানি; আজ এই তিন দিন হল, চিঠিও নেই, ওর দেখাও নেই। সকালে ঠাকুমার কাছ থেকে চলে আসা কোনোক্রমেই সম্ভব নয় আমার পক্ষে। যে ভালো লোকদের কথা আপনাকে বললাম, আপনি নিজেই আমার চিঠিটা তাদের দেবেন কালকে; তারা পাঠিয়ে দেবে। আর যদি জবাব আসে তাহলে আপনিই সেটা নিয়ে আসবেন রাত দশটার সময়।'

'কিন্তু চিঠি, চিঠি! প্রথমে তো চিঠিটা লেখা চাই! তাহলে জবাব মিলবে পরশু।'

'চিঠি...' খানিকটা বিব্রত হয়ে জবাব দিলে নাস্তেনকা, 'চিঠি... কিন্তু...'

কথাটা সে শেষ করলে না। প্রথমে সে মুখখানা ফিরিয়ে নিলে আমার দিক থেকে, লাল হয়ে উঠল গোলাপের মতো, হঠাৎ টের পেলাম আমার হাতে এসে গেছে একটা চিঠি, বোঝা যায় সেটা বেশ আগেই লেখা, একেবারে তৈরি, সীলমোহর করা। কেমন একটা পরিচিত, মধুর, লীলায়িত স্মৃতি ঝলক দিল আমার মাথায়।

'রো-রো, জি-জি, না-না,' আমি শুরু করলাম।

'রোজিনা!' গেয়ে উঠলাম আমরা দুজনেই, উল্লাসে প্রায় আলিঙ্গন করি আর-কি, যতটা লাল হওয়া সম্ভব ততটাই লাল হয়ে উঠল নাস্তেনকা, হাসল চোখে জল নিয়ে, তার কালো আঁখি-পল্লবে তা কাঁপছিল মুক্তোর মতো।

'নিন, হয়েছে, হয়েছে! এবার আসি,' বললে সে তড়িঘড়ি করে, 'এই আপনার চিঠি, এই ঠিকানা, যেখানে পৌঁছে দেবেন। আসি, ফের দেখা হবে, কালকে।'

সজোরে আমার দুই হাতে চাপ দিল সে, মাথা নাড়লে, তারপর তীরবেগে ঝলক দিয়ে মিলিয়ে গেল তার গলিতে। এক ঠাঁইয়ে অনেকখন দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম ওকে।

'কাল! কালকে !' আমার দৃষ্টিপথ থেকে সে আড়াল হতেই কথাটা ঘুরতে লাগল আমার মাথায়।

তৃতীয় রাত্রি

আজকের দিনটা ছিল বিষণ্ণ, বাদলা, আলোর দেখা নেই, ঠিক যেন আমার ভবিষ্যৎ বার্ধক্য। অদ্ভুত সব চিন্তা পিষ্ট করছে আমাকে — তমসাচ্ছন্ন সব অনুভূতি, আমার কাছেই অস্পষ্ট সব প্রশ্ন ভিড় করে আসছে মাথায়, তার জবাব খোঁজার সামর্থ্যও নেই, ইচ্ছাও নেই। সেসব প্রশ্নের নিরসন আমার কাজ নয়!

আজ আমাদের দেখা হবে না। গতকাল যখন আমরা বিদায় নিই, আকাশ তখন ছেয়ে এসেছিল মেঘে, কুয়াশা উঠেছিল। আমি বলেছিলাম কাল দিনটা খারাপ যাবে। সে জবাব দেয় নি, নিজের বিপক্ষতা করার ইচ্ছে ছিল না তার: সে দিনটা ওর কাছে যেমন উদ্ভাসিত, তেমনি পরিষ্কার, এক চিলতে মেঘেও ঢাকা পড়ে নি তার সুখ।

বললে, 'যদি বৃষ্টি নামে তাহলে আর দেখা হবে না! আমি আসব না।'

ভেবেছিলাম, আজকের বৃষ্টিটা সে খেয়ালই করবে না, তবে এলও না।

গতকাল গেছে আমাদের তৃতীয় সাক্ষাৎ, আমাদের তৃতীয় শুক্লা যামিনী...

তবে সুখ আর আনন্দ লোককে কী সুন্দর করেই না তোলে! কী ভালোবাসায় ভরে ওঠে বুক! ইচ্ছে হয় নিজের গোটা বুকখানা ঢেলে দিই অন্যের বুকে, ইচ্ছে হয় সবকিছুই ভরে উঠুক আনন্দে, হেসে উঠুক। আর কী সংক্রামক এই আনন্দ! কাল ওর কথাগুলোর মধ্যে ছিল কতই-না সোহাগে, আমার প্রতি বুকভরা কতই-না সহৃদয়তা।... আমার জন্যে কী যত্নই না সে নিয়েছে, কত আদর করেছে আমায়, খুশি করে মন ভিজিয়ে দিয়েছে আমার। ওহ্, সুখ থেকে কতই-না রঙঢঙ দেখা দেয়! আর আমি... আমি এসবই নিয়েছিলাম একেবারে খাঁটি মনে করে; ভেবেছিলাম যে সে...

কিন্তু হায় ভগবান, কী করে তা ভাবতে পেরেছিলাম? এত অন্ধ হতে পারলাম কী করে যখন সবই পেয়ে গেছে অন্যে, কিছুই আমার নয়; যখন তার এই কোমলতা, যত্ন, ভালোবাসা... হ্যাঁ, আমার জন্যে তার এই ভালোবাসা সে তো আর কিছু নয়, কেবল অন্যের সঙ্গে অচিরে যে দেখা হবে সেই আনন্দ, নিজের সুখটা আমার ওপরেও চাপিয়ে দেবার বাসনা?.. যখন সে এল না, যখন আমরা খামোকাই অপেক্ষা করে ছিলাম তার জন্যে, তখন মুখ যে তার ভার হয়ে যায়, কেমন সংকুচিত, ভীত হয়ে ওঠে সে। তার সমস্ত ভাবভঙ্গি, সমস্ত কথাবার্তা তেমন আর অনায়াস, লীলাময়, হাসিখুশি থাকে নি। আর আশ্চর্য ব্যাপার, আমার প্রতি সে তার মনোযোগ বাড়িয়ে তুলল দ্বিগুণ, যেন তার যেটা কামনা, স্বপ্নটা যদি সফল না হয় তার জন্যে যে আশঙ্কা সেটা সে তুলে দিতে চায় আমার ওপর। আমার নাস্তেনকা এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল, এতই শংকিত হয়ে উঠেছিল যে শেষ পর্যন্ত বুঝেছিল যে আমি ওকে ভালোবাসি, আমার অভাগ্য ভালোবাসায় করুণা হয়েছিল ওর। যখন নিজেরা আমরা দুঃখী তখন অপরের দুঃখ আরো প্রবলভাবে টের পাই আমরা: অনুভূতি ভেঙে পড়ে না, কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে...

আমি ওর কাছে এসেছিলাম ভরা বুক নিয়ে, সাক্ষাতের জন্যে তর সইছিল না। এখন যা টের পাচ্ছি সেটা তখন অনুমান করি নি, ভাবি নি যে এসবের সমাপ্তিটা ওরকম হবে না। আনন্দে ঝলমল করছিল সে,

উত্তরের অপেক্ষায় ছিল। আর উত্তর, সে তো ও নিজেই। তাকে আসতে হবে, ছুটে আসবে নাস্তেনকার ডাকে। নাস্তেনকা এসেছিল আমার চেয়ে পুরো এক ঘণ্টা আগে। প্রথমটা সে সবকিছুতেই খিলখিল করে হেসেছে, হেসেছে আমার প্রতিটি কথাতেই। আমি কথা কইতে গিয়ে চুপ করে গেলাম।

ও বললে, 'জানেন কেন আজ আমার এত আনন্দ? আপনাকে দেখে কেন আনন্দ হচ্ছে এত? কেন আপনাকে এত ভালোবাসছি?'

জিগ্যেস করলাম, 'তা কেন?' বুকটা আমার কেঁপে উঠল।

'আপনাকে ভালোবাসছি কারণ আপনি আমার প্রেমে পড়েন নি। আপনার জায়গায় অন্য কেউ হলে সে অস্থির হয়ে উঠত, জেদাজেদি করত, মেতে উঠত, রোগে পড়ত, কিন্তু আপনি ভারি লক্ষ্মী!'

এই বলে সে আমার হাতে এমন চাপ দিল যে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। নাস্তেনকা হেসে উঠল।

এক মিনিট বাদে সে গম্ভীরভাবে শুরু করলে, 'ভগবান! কী বন্ধু আপনি! হ্যাঁ, ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে! আপনি এখন আমার কাছে না থাকলে কী হত আমার? কী নিঃস্বার্থপর আপনি! কত ভালোবাসেন আমায়! বিয়ে করার পর খুব বন্ধুত্ব হবে আমাদের, ভাইয়ের চেয়েও বেশি। আপনাকে আমি ভালোবাসব প্রায় ওর মতোই...'

তখন সাঙ্ঘাতিক মন-খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার, তবে হাসির মতো কী একটা যেন নড়েচড়ে উঠল আমার ভেতর।

বললাম, 'আপনার স্নায়বিক প্রকোপ ঘটেছে। আপনি ভয় পাচ্ছেন, ভাবছেন সে আসবে না।'

সে বললে, 'ভগবান আপনাকে দেখবেন! আমি যদি এতটা সুখী না হতাম তাহলে আপনার অবিশ্বাসে, আপনার ভর্ৎসনায় আমি হয়ত কেঁদেই ফেলতাম। তবে আপনি আমায় ভাবিয়েছেন, চিন্তার খোরাক দিয়েছেন অনেক। কিন্তু সেটা ভাবব পরে, আপাতত স্বীকার করছি যে আপনি ঠিকই বলেছেন। হ্যাঁ, আমি যেন ঠিক সুস্থির নই; আমি যেন কেবলি কিসের আশায় আছি, সবই খুব সহজ মনে হচ্ছে। কিন্তু যাক, যথেষ্ট হয়েছে, অনুভূতি-টুতির কথা থাক!..'

এই সময় পদশব্দ শোনা গেল, অন্ধকারে দেখা গেল পথচারীর মূর্তি,

আমাদের দিকেই সে আসছে। দুজনেই চমকে উঠলাম আমরা, নাস্তেনকা প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। আমি তার হাত ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার উপক্রম করলাম। কিন্তু ভুল হয়েছিল আমাদের: এ সে নয়।

ফের আমার হাতে হাত দিয়ে সে বললে, 'ভয় পাচ্ছেন কিসের জন্যে? কেন হাত ছেড়ে দিলেন আমার? এ্যাঁ, কী হল? এক সাথেই আমরা দেখা করব ওর সঙ্গে। আমি চাই যে ও দেখুক আমরা দুজন দুজনকে কত ভালোবাসি।'

'দুজন দুজনকে কত ভালোবাসি!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

মনে মনে ভাবলাম: 'ওহ্ নাস্তেনকা, নাস্তেনকা! এই কথা কটায় কতকিছুই না তুমি বললে! এই ভালোবাসায় নাস্তেনকা, বুক 'মাঝে মাঝে' হিম হয়ে আসে, ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে প্রাণ। তোমার হাত ঠান্ডা, আমারটা আগুনের মতো গরম। কী অন্ধ তুমি নাস্তেনকা!.. ওহ্! কোনো কোনো মুহূর্তে সুখী লোক কী অসহ্য! কিন্তু তোমার ওপর রাগ করতে আমি যে পারি না!..'

শেষে বুক আমার কান্নায় কান্নায় ভরে উঠল।

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'শুনুন নাস্তেনকা! জানেন আজ সারাটা দিন আমার কেমন গেছে?'

'কিন্তু কী হল? বলুন তাড়াতাড়ি। এতক্ষণ চুপ করে আছেন যে!'

'প্রথমত, আমি আপনার সমস্ত বরাত পালন করলাম, আপনার ভালো লোকদের কাছে গিয়ে, চিঠি দিয়ে, তারপর... তারপর বাড়ি ফিরে শুতে গেলাম।'

আমায় বাধা দিয়ে সে হেসে বললে, 'শুধু এই?'

'হ্যাঁ, প্রায় শুধু এই,' বললাম বুক বেঁধে, কেননা চোখে আমার নির্বোধ জল জমে উঠছিল, 'আমাদের এই দেখা হওয়াটার আগে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু মনে হয় যেন ঘুমই হয় নি। কী যে আমার হয়েছিল কে জানে। গেলাম আপনাকে এসব বলতে, যেন সময় আমার থেমে গিয়েছিল, এই সময়টা থেকে একটা অনুভব, একটা আবেগ আমার কাছে থাকার কথা চিরকাল, একটা মুহূর্ত যেন ছাপিয়ে যাবে সারা জীবন, সারাটা জীবন যেন স্থির হয়ে গেল আমার সামনে। ...যখন ঘুম ভাঙল, মনে হল যেন কোন একটা সঙ্গীতের সুর, বহুপরিচিত, কবে

যেন শুনেছিলাম, ভুলে গেছি, ভারি মধুর, হঠাৎ যেন মনে পড়ল আমার। মনে হল যেন আমার প্রাণ থেকে তা ছাড়া পেতে চাইছে, আর শুধু এখন...'

'ভগবান, ভগবান!' আমার কথায় বাধা দিলে নাস্তেনকা, 'এসব কী? একটা কথাও আমি বুঝতে পারছি না।'

'আহ্ নাস্তেনকা! ইচ্ছে হয়েছিল এই বিচিত্র অনুভূতির কথা আপনাকে শোনাব,' শুরু করেছিলাম আমি করুণ স্বরে, তাতে তখনো চাপা ছিল আশা, যদিও সুদূরপরাহত।

'হয়েছে, হয়েছে, থামুন!' এক মুহূর্তেই সে সব বুঝে ফেলেছে, লক্ষ্মীছাড়ি কোথাকার!

হঠাৎ সে হয়ে উঠল বাচাল, হাসিখুশি, দুষ্টু-দুষ্টু। আমার হাতখানা টেনে নিয়ে সে হেসে উঠল, চাইছিল যেন আমিও হাসি, আমার প্রতিটি বিব্রত কথাতেই তার হাসি উঠছিল খিলখিলিয়ে, অনেকখন ধরে... আমার রাগ হতে লাগল, হঠাৎ সে রঙঢঙ করে বললে:

'শুনুন, আমার খানিকটা দুঃখই হচ্ছে যে আপনি আমার প্রেমে পড়েন নি। কী যে লোক দ্যাখো দিখি, ভেবেই পাই না। তাহলেও অনুরাগী মহাশয়, আমি এমন সহজ-সরল বলে আমায় বাহবা না দিয়ে আপনি পারবেন না। আমি আপনাকে সব বলছি, মাথায় যত যত বোকামি ঝলক দেয় সবকিছু।'

'শুনুন, এখন বোধ হয় রাত এগারোটা, তাই না?' দূরে শহরের গম্বুজ থেকে থেকে মাপা তালে ঘণ্টা বাজতে শুরু করায় আমি বললাম। হঠাৎ সে থেমে গেল, হাসি রেখে গুনতে শুরু করলে।

ভীরু-ভীরু, বদলিয়ে যাওয়া গলায় সে বললে, 'হ্যাঁ, এগারোটা।'

তক্ষুনি অনুতাপ হল আমার যে ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি, ঘড়ির ঘণ্টা গুনিয়েছি, আক্রোশের প্রকোপ এসেছিল বলে অভিশাপ দিলাম নিজেকে। ওর জন্যে কষ্ট হল আমার, ভেবে পাচ্ছিলাম না কী করে দোষ স্খালন করব। ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। কেন সে আসে নি তার নানা রকম যুক্তিপ্রমাণ অজুহাত খাড়া করা গেল। এই সময়ে ওকে ঠকানো কারো পক্ষেই অসম্ভব কিছু নয়, এই সময় যেকোনো সান্ত্বনা সে শুনবে কান পেতে, একটু যুক্তি পেলেই সে খুশি হবে।

উত্তেজিত হয়ে, নিজের যুক্তির অসামান্য স্পষ্টতায় অভিভূত হয়ে

আমি বলতে লাগলাম, 'হ্যাঁ, হাস্যকর ব্যাপার, ও যে না এসে পারে না, আপনি তো আমাকেও ঠকিয়েছেন, ভুলিয়েছেন নাস্তেনকা, আপাতত সময়ের জ্ঞান আমার হারিয়েছে... শুধু ভেবে দেখুন, চিঠিটা হয়ত ও সবে পেয়েছে, ধরা যাক ওর আসা সম্ভব নয়, ধরা যাক সে জবাব দেবে, কিন্তু চিঠি তো আর কালকের আগে আসবে না। কাল ভোর হওয়া মাত্র আমি তার কাছে যাব এবং আপনাকে জানাব। হাজার রকমের অবস্থান্তর ভেবে দেখুন, চিঠি যখন এসেছিল তখন সে হয়ত বাড়ি ছিল না, এখনো পর্যন্ত সে হয়ত সেটা পড়েই ওঠে নি। সবই তো হতে পারে।'

নাস্তেনকা বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি সেটা ভাবি নি।' সে বলে চলল তার সেই মুখর গলায়, কিন্তু তাতে শোনা যাচ্ছিল কেমন একটা দুরান্ত, তালকাটা চিন্তা। বললে, 'শুনুন, কালকে যত তাড়াতাড়ি পারেন ওর কাছে যাবেন, কিছু একটা উত্তর পেলে তক্ষুনি আমায় জানাবেন। কিন্তু জানেন আমার ঠিকানা?' নিজের ঠিকানা সে বলতে লাগল বার বার করে।

হঠাৎ সে আমার কাছে হয়ে উঠল ভারি কোমল, ভারি ভীরু। ...আমি যা বলছি তা যেন খুব মন দিয়ে সে শুনছিল, কিন্তু আমি কিছু একটা জিজ্ঞাসা করলে সে চুপ করে থাকত, বিব্রত বোধ করত, মুখ ফিরিয়ে নিত আমার কাছ থেকে। আমি চেয়ে দেখলাম ওর চোখের দিকে, ঠিক তাই: কাঁদছে।

'কিন্তু সে কি সম্ভব? সম্ভব? ইস্, কী আপনি ছেলেমানুষ, কী ছেলেমানুষি!.. ঢের হয়েছে!'

হাসার চেষ্টা করল সে, শান্ত হতে চাইল, কিন্তু থুতনিটা ওর কাঁপছিল, দুলে উঠছিল বুক।

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর সে বললে, 'আমি আপনার কথা ভাবছি। আপনি এত ভালো যে সেটা অনুভব করতে না পারলে আমার তো পাষাণ হয়ে যাওয়ার কথা... শুনুন, কী ধারণা হয়েছে আমার? আমি আপনাদের দুজনকে তুলনা করে দেখেছি। কেন সে, আপনি নন কেন? কেন সে আপনার মতো নয়? আপনার তুলনায় সে মন্দ যদিও তাকে ভালোবাসি আপনার চেয়ে বেশি।'

আমি কিছুই বললাম না, মনে হয় কিছু একটা কথা সে আশা করছিল।

'আমি অবিশ্যি ওকে এখনো হয়ত পুরো বুঝি নি, সবটা জানি না। জানেন, আমার সবসময় যেন ভয় হত ওকে; সর্বদাই ও ভারি গুরুগম্ভীর, যেন গর্বিত, অবিশ্যি আমি জানি যে ওটা লোক-দেখানো, প্রাণের ভেতর ওর আমার চেয়েও বেশি কোমলতা। ...মনে আছে যখন আমি পুঁটলি বেঁধে এসেছিলাম তার কাছে তখন কিভাবে সে চেয়ে দেখেছিল আমার দিকে। তাহলেও বড়ো বেশি শ্রদ্ধা করি ওকে, সেটা তো আমরা সমান সমান নই বলে?'

বললাম, 'না, নাস্তেনকা, না! তার কারণ আপনি ওকে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, নিজের চেয়েও তাকে ভালোবাসেন আরো বেশি।'

সরলমতি নাস্তেনকা বললে, 'ধরা যাক তাই, কিন্তু জানেন, কী আমার ধারণা হয়েছে? শুধু ওর সম্পর্কে নয়, সাধারণভাবে বলছি, কথাটা অনেক দিন থেকেই মনে নড়াচড়া করছে। শুনুন, কেন আমরা সবাই ভাই-ভাইয়ের মতো নই? কেন আমাদের সবচেয়ে সেরা লোকটা অন্যদের কাছ থেকে কী যেন লুকিয়ে রাখে, সে কথা বলে না কাউকে? কেন এক্ষুনি, তার মনের মধ্যে কী আছে সেটা সে সোজাসুজি বলবে না, যদিও সে জানে যে নেহাৎ উলুবনে মুক্তা ছড়াচ্ছে না? কেন সবাই এমন ভাব করে যেন সে আসলে যা, তার চেয়েও সে অনেক কঠোর, সবাই যেন ভয় পাচ্ছে নিজের অনুভূতিতে আঘাত দিতে যদিও সে তা খুলে বলবে অচিরেই...

'হ্যাঁ নাস্তেনকা, আপনি ঠিক কথাই বলছেন; তবে সেটা ঘটে নানা কারণে,' বললাম ওকে বাধা দিয়ে, যদিও নিজের অনুভূতি আমি তখন যতটা চেপে রেখেছিলাম, তেমন আর কখনো হয় নি।

'না, না!' গভীরভাবে সে বললে, 'যেমন এই আপনি, অন্যের মতো আপনি নন! আমি অবিশ্যি ঠিক জানি না কী ভাবছি, সেটা কী করে আপনাকে বলি। কিন্তু, যেমন এই আপনি, — অন্তত এই এখন... আমার মনে হচ্ছে আপনি আমার জন্যে কী একটা আত্মোৎসর্গ করছেন।' আমার দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে ভয়ে ভয়ে সে বললে, 'এইসব কথা বলছি বলে আমায় মাপ করুন, আমি তো একটা সাধারণ মেয়ে, দুনিয়ার অনেককিছুই দেখি নি, সত্যি অন্যভাবে কথা বলতে আমি পারি না,' বললে সে কী একটা ভাবাবেগ চেপে, কাঁপা কাঁপা গলায়, সেইসঙ্গে চেষ্টা করলে মুখে হাসি ফোটাতে, 'কিন্তু আমি আপনাকে বলতে চাইছিলাম যে আমি আপনার

কাছে কৃতজ্ঞ, আমিও এই অনুভূতিটা বুঝি... ওহ্, ভগবান এর জন্যে আপনার মঙ্গল করুন! আপনার স্বপ্নজীবী সম্পর্কে আপনি যা সেদিন বলেছিলেন সেটা একেবারে ভুল, মানে বলতে চাইছি যে ওটা আপনার বেলায় খাটে না, আপনি নিজেকে যা দেখিয়েছেন তার চেয়ে একেবারেই অন্য লোক আপনি। যদি আপনি কখনো কাউকে ভালোবাসেন, তাহলে ভগবান যেন আপনাকে সুখ দেন! আর মেয়েটির জন্যে আমার কোনো কামনা নেই, কেননা আপনাকে পেয়ে সে সুখী হবেই। আমি তা জানি, আমি নিজেই তো মেয়ে, আমি যা বলছি, সেটায় আপনার বিশ্বাস করা উচিত...'

চুপ করে গেল সে, সজোরে চাপ দিল আমার হাতে। ব্যাকুলতায় আমিও কিছু বলতে পারলাম না। কয়েক মিনিট কাটল।

শেষে মুখ তুলে সে বললে, 'হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে, আজকে সে আসবে না। রাত হয়ে গেছে অনেক!..'

'কাল সে আসবেই,' বললাম নিশ্চিত স্বরে, দৃঢ়কণ্ঠে।

'হ্যাঁ,' বললে সে খুশি হয়ে, 'আমি নিজেই বুঝতে পারছি আসবে সে কালকেই। তাহলে আসি, কাল দেখা হবে! যদি বৃষ্টি হয় তাহলে হয়ত আসব না। কিন্তু পরশু আসব, আমার যাই হোক না কেন আসবই। অবশ্য-অবশ্যই এখানে থাকবেন, আপনাকে দেখতে চাই, সব বলব আপনাকে।'

পরে যখন বিদায় নিলাম, সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার চোখে চোখে স্পষ্টাস্পষ্টি তাকিয়ে বললে:

'আমরা তো এবার থেকে চিরকালের মতো একসঙ্গে, তাই না?'

ওহ্, নাস্তেনকা, নাস্তেনকা! যদি জানতে এখন কী নিঃসঙ্গ আমি!

যখন ন'টা বাজল, আমি আর ঘরে বসে থাকতে পারলাম না, পোশাক-টোশাক পরে বেরিয়ে পড়লাম, যদিও তখন বাদলা চলেছে। গেলাম সেইখানে, বসলাম আমাদের বেঞ্চটায়। ওদের গলিতে ঢু মারার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু লজ্জা হল। ওদের জানলার দিকে না তাকিয়েই, ওদের বাড়ির দিকে দু'পা না এগিয়েই ফিরে এলাম। বাড়িতে এলাম এমন মন-পোড়ানি নিয়ে যা কখনো হয় নি। কী স্যাঁতসেঁতে, বিছছিরি দিন! ভালো আবহাওয়া থাকলে আমি সারাটা সময় ওখানে বেরিয়ে বেড়াতে পারতাম...

কিন্তু কাল, আগামী কাল! কাল সে আমায় সব বলবে।

তবে চিঠি আসে নি। কিন্তু তাই তো হওয়ার কথা। ওরা আছে একসঙ্গে।

চতুর্থ রাত্রি

ভগবান, কী যে এসবের পরিণতি! কী পরিণতি!

এসেছিলাম রাত ন'টায়। ছিল সে আগেই, দূর থেকেই ওকে দেখতে পেয়েছিলাম, দাঁড়িয়ে ছিল সেই প্রথম বারের মতো, রেলিঙে কনুই ভর দিয়ে, আমার আসার শব্দ তার কানে যায় নি।

বহু কষ্ট নিজের উত্তেজনা চেপে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'নাস্তেনকা!'

দ্রুত সে ফিরে চাইল আমার দিকে। বললে:

'কিন্তু চিঠি! কই, তাড়াতাড়ি দিন চিঠিটা!'

আমি কিছু হতভম্ব হয়ে চাইলাম তার দিকে।

'কিন্তু চিঠিটা কই? চিঠি এনেছেন?' রেলিঙ চেপে ধরে সে পুনরাবৃত্তি করলে।

শেষে বললাম, 'নেই, চিঠি নেই আমার কাছে। সে কি এর মধ্যে আসে নি?'

ভয়ানক ফ্যাকাশে হয়ে গেল নাস্তেনকা, অনেকখন নিশ্চল হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে; ওর শেষ আশা আমি চূর্ণ করে দিলাম।

'যাক গে, ভগবান ওকে দেখবেন।' বললে সে ভেঙে পড়া গলায়, 'ও যদি আমায় এমনভাবে ফেলে রেখে যায়, ভগবান ওকে দেখবেন।'

চোখ নামিয়ে নিল সে, পরে চেয়েছিল আমার দিকে চাইতে, পারলে না। আরো কয়েক মিনিট সে জোর করে তার ব্যাকুলতা চেপে রাখার চেষ্টা করলে, তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে রেলিঙের থামে কনুই ভর দিয়ে কেঁদে ফেললে অঝোরে।

'হয়েছে, হয়েছে!' বলতে যাচ্ছিলাম আমি, কিন্তু ওর দিকে চেয়ে কিছু বলার শক্তি আমার আর ছিল না, তাছাড়া বলতামই বা কী?

কাঁদতে কাঁদতে সে বললে, 'সান্ত্বনা দেবেন না আমায়, ওর কথা কিছু বলবেন না। বলবেন না যে ও আসবে, আমায় সে অমন নিষ্ঠুরভাবে, অমন অমানুষের মতো ত্যাগ করে নি। কিন্তু কেন, কিসের জন্যে? আমার চিঠিতে, আমার হতভাগ্য চিঠিখানায় তেমন কিছু ছিল কি?..'

কান্নায় চাপা পড়ে গেল তার কণ্ঠস্বর, ওর দিকে তাকিয়ে বুক আমার ভেঙে যাচ্ছিল।

ফের সে শুরু করলে, 'ওহ্, কী অমানুষিক নিষ্ঠুর! একটা লাইনও সে লিখল না, একটা লাইনও না। অন্তত এটুকু তো জানাতে পারত যে আমার কোনো দরকার নেই ওর কাছে, আমায় সে প্রত্যাখ্যান করছে: পুরো তিন দিনের মধ্যে একটা লাইনও নেই। কী অনায়াসে বেচারি অসহায় একটি মেয়েকে সে অবমানিত লাঞ্ছিত করতে পারে, যার একমাত্র দোষ এই যে সে তাকে ভালোবাসে। ওহ্, এই তিন দিন কী না আমায় সইতে হয়েছে! ভগবান! যখন মনে পড়ে যে আমি নিজেই প্রথমে গেছি ওর কাছে, নিজেকে নত করেছি ওর সম্মুখে, কেঁদেছি, মিনতি করেছি অন্তত এক বিন্দু ভালোবাসার জন্যে... আর এসবের পর!.. শুনুন,' ও ফিরল আমার দিকে, চকচক করে উঠল ওর কালো চোখ, 'না, এ হতে পারে না, এমনটা হতে পারে না; এ যে অস্বাভাবিক! হয় আপনি নয় আমি প্রতারিত হয়েছি। হয়ত চিঠিই সে পায় নি? হয়ত এখনো পর্যন্ত কিছুই জানে না সে? কী করে তা হতে পারে, নিজেই ভেবে দেখুন, ভগবানের দোহাই, আমায় বলুন, আমায় বোঝান, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, আমার সঙ্গে সে যা করেছে অমন বর্বরের মতো আচরণ সে করতে পারে কী করে! একটা কথা পর্যন্ত নয়! কিন্তু দুনিয়ার শেষ লোকটির প্রতিও তো অনুকম্পা হয়। হয়ত কিছু তার কানে গেছে, কেউ কিছু বলেছে আমার সম্পর্কে?' আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনার, আপনার কী মনে হয়?'

'শুনুন নাস্তেনকা, আপনার তরফ থেকে কাল আমি যাব ওর কাছে।'

'তারপর?'

'আমি সবকিছু জিগ্যেস করব ওকে, সবকিছু বলব।'

'তারপর!'

'আপনি চিঠি লিখে দিন। না করবেন না নাস্তেনকা, না করবেন না!

আপনার আচরণের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে আমি বাধ্য করব তাকে, সে সব জানবে, আর যদি...'

'না বন্ধু, না,' আমায় বাধা দিয়ে সে বললে, 'যথেষ্ট হয়েছে! আমার কাছ থেকে আর একটি কথা, একটি কথাও নয়, একটি লাইনও নয় — যথেষ্ট হয়েছে! আমি ওকে ভু-লে যা-ব...'

কথাটা সে শেষ করলে না।

'শান্ত হন, শান্ত হন নাস্তেনকা, বসুন এখানে,' ওকে বেঞ্চিতে বসিয়ে আমি বললাম।

'আমি শান্তই আছি। খুব হয়েছে, এটা এমনি। এই চোখের জল শুকিয়ে যাবে। আপনি কি ভাবছেন আমি আত্মহত্যা করব, ডুবে মরব?'

বুক আমার ভরে উঠেছিল, কথা বলব ভেবেছিলাম, পারলাম না।

আমার হাত ধরে সে বলে চলল, 'আচ্ছা বলুন তো, আপনি তো ওইরকম ব্যবহার করতেন না? যে নিজে যেচে এসেছে তাকে ত্যাগ করতেন না? তার দুর্বল, নির্বোধ হৃদয় নিয়ে নির্লজ্জ ঠাট্টা করতেন না তার চোখের সামনে? আপনি তো তাকে বাঁচিয়ে রাখতেন? আপনি তো কল্পনা করতে পারতেন যে সে একা, নিজেকে সে সামলাতে পারে না, আপনার প্রতি ভালোবাসা সে পারে না দমন করতে, তার তো দোষ নেই... কিছুই সে যে করে নি, তার জন্যে দোষ নেই তার! ওহ্, ভগবান, ভগবান...'

নিজের আকুলতা আর চেপে রাখতে না পেরে শেষ পর্যন্ত চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'নাস্তেনকা, নাস্তেনকা! আপনি ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছেন আমায়! আপনি হলাহল নিক্ষেপ করছেন আমার হৃদয়ে, আমায় আপনি মারছেন! আমি আর চুপ করে থাকতে পারছি না, অবশেষে আমায় বলতেই হবে, জানাতেই হবে বুকে আমার কী উথলে উঠছে...'

এই বলে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। সে আমার হাত ধরে চেয়ে রইল অবাক হয়ে।

অবশেষে সে বললে, 'কী হল আপনার?'

দৃঢ়কণ্ঠে আমি বললাম, 'শুনুন নাস্তেনকা, শুনুন! আমি এখন যা বলব তা সবই ছাইভস্ম, অবাস্তব, আহাম্মকি! আমি জানি যে এটা কদাচ সফল হবার নয়, কিন্তু চুপ করে থাকতে আমি পারছি না। যার জন্যে

আপনি এখন কষ্ট পাচ্ছেন তার নামে আগে থেকেই মিনতি করছি আপনাকে, ক্ষমা করবেন আমায়!..'

'কিন্তু কী কী?' কান্না থামিয়ে সে বললে, একদৃষ্টে চেয়ে রইল আমার দিকে, বিচিত্র একটা কৌতূহল চিকচিক করে উঠল তার বিস্মিত চোখে, 'কী হল আপনার?'

'এটা বাস্তব হবার নয়, কিন্তু আপনাকে আমি ভালোবাসি নাস্তেনকা! তা এখন তো যা বলবার বলেই ফেললাম,' হাত নেড়ে আমি বললাম, 'এবার আপনি দেখবেন, এক্ষুনি যেভাবে কথা বলছিলেন সেভাবে কথা কইতে পারেন কিনা, শেষত আমি যা বলব সেটা আপনি শুনতে পারবেন কিনা...'

নাস্তেনকা বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু কী হল, কী হল তাতে? কিন্তু আমি তো আগে থেকেই জানতাম যে আপনি আমায় ভালোবাসেন, শুধু আমার মনে হয়েছিল আপনি নেহাৎ সাধারণভাবে এমনি ভালোবাসছেন আমায়। ...ভগবান! ভগবান!'

'প্রথমটা সাধারণই ছিল নাস্তেনকা, কিন্তু এখন, এখন... আপনি যখন পোঁটলা বেঁধে ওর কাছে গিয়েছিলেন, আমি এখন ঠিক আপনার সেই অবস্থায় পড়েছি। তার চেয়েও খারাপ নাস্তেনকা, কেননা তখনো সে কাউকে ভালোবাসে নি, আর আপনি ভালোবাসেন।'

'আপনি এসব কী আমায় বলছেন! আমি শেষ পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারছি না আপনাকে। কিন্তু শুনুন, কী উদ্দেশ্যে এটা, মানে কী উদ্দেশ্যে নয়, কেন এমন হঠাৎ... ভগবান! বোকার মতো কী সব বলছি! কিন্তু আপনি...'

একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল নাস্তেনকা। গাল ওর টকটক করে উঠল; চোখ নামিয়ে নিলে।

'কী যে করি নাস্তেনকা, কী আমি করতে পারি! আমারই দোষ, আমি অনাচার করেছি... কিন্তু না, না, আমার দোষ নেই নাস্তেনকা; এটা আমি টের পাচ্ছি, অনুভব করছি, কেননা আমার মন বলছে আমি ঠিকই করেছি, কেননা কিছুতে আমি আপনাকে আঘাত দিতে পারি না, কিছুতেই অপমান করতে পারি না আপনাকে! আমি ছিলাম আপনার বন্ধু, এখনো সেই বন্ধুই রইলাম, কিছুই বদল হয় নি আমার। এই দেখুন আমার চোখে

এখন জল আসছে নাস্তেনকা। ঝরুক সে জল, ঝরুক — কারো তো কোনো ক্ষতি করছে না তা। এ জল শুকিয়ে যাবে নাস্তেনকা...'

আমায় বেঞ্চিতে বসাবার চেষ্টা করে সে বললে, 'আহ্, বসুন-না, বসুন, ওহ্ ভগবান!'

'না! নাস্তেনকা, আমি বসব না। আমি এখানে আর থাকতে পারি না, আমাকে আর সইতে পারবেন না আপনি; আমি সব কথাটা বলে চলে যাব। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আপনি কখনো জানতেই পেতেন না যে আমি আপনাকে ভালোবাসি। নিজের গোপন কথাটা আমি গোপনই রাখতাম। এখন, এই মুহূর্তে নিজের স্বার্থপরতায় আপনাকে জ্বালাতে যেতাম না আমি। না! কিন্তু এখন আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আপনি নিজেই কথাটা বলেছেন, আপনিই দোষী, সবকিছুতেই দোষ আপনার কিন্তু আমি দোষী নই। আপনি আমাকে খেদিয়ে দিতে পারেন না...'

'আরে না, না, কেন তাড়াব আপনাকে, তাড়াব না বৈকি!' যথাসম্ভব নিজের বিব্রত ভাব লুকাবার চেষ্টা করে বললে নাস্তেনকা, বেচারি।

'আপনি আমায় তাড়িয়ে দেবেন না? দেবেন না! অথচ আমি নিজেই আপনার কাছ থেকে পালাতে চাইছিলাম। চলেই আমি যাব, শুধু আগে সবকথাটা বলে নেব আমি, কেননা আপনি যখন আপনার কথাগুলো বলছিলেন, আমি বসে থাকতে পারছিলাম না, আপনি যখন এখানে কাঁদলেন, আপনি যখন কাঁদলেন এইজন্যে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করলেন, (কী জন্যে সে কথাটা আমি বলব নাস্তেনকা), এইজন্যে যে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে, এইজন্যে যে আপনার ভালোবাসাকে পায়ে ঠেলা হচ্ছে, তখন আমি বুঝলাম, জানলাম, টের পেলাম আপনার জন্যে আমার বুকভরা ভালোবাসা কতখানি নাস্তেনকা, কতটা ভালোবাসা!.. আর এত কষ্ট হল আমার যে সে ভালোবাসা দিয়ে সাহায্য করতে পারছি না আপনাকে... বুক আমার ফেটে যাচ্ছিল এবং আমি, আমি... চুপ করে থাকতে আমি আর পারি না, আপনাকে বলতেই হত নাস্তেনকা, বলতেই হত!..'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন আমাকে, এইভাবেই কথা বলুন আমার সঙ্গে!' দুর্বোধ্য একটা ভঙ্গি করে বললে নাস্তেনকা, 'আপনার বোধ হয় আশ্চর্য

ঠেকছে যে আমি এইভাবে কথা কইছি আপনার সঙ্গে, কিন্তু... বলুন! আমি বলব পরে! সব আমি বলব আপনাকে।'

'আমার ওপর আপনার করুণা হচ্ছে নাস্তেনকা, নিতান্ত করুণা, বন্ধু আমার! তবে যা গেছে তা গেছেই। যা বলে ফেলেছি তা আর ফেরত নেবার নয়! তাই না? থাক, আপনি এখন সব জানলেন। মানে ওটা হল যাত্রাবিন্দু। তা বেশ, এখন এসবই বেশ চমৎকার দাঁড়াল; শুধু শুনুন। আপনি যখন এখানে বসে কাঁদছিলেন, আমি মনে মনে ভাবছিলাম (ওহ্, কী ভাবছিলাম তা বলতে দেওয়া হোক আমায়!), ভাবছিলাম যে (কিন্তু সে তো হবার নয় নাস্তেনকা), ভাবছিলাম যে আপনি... ভাবছিলাম আপনি হয়ত কোনোক্রমে... মানে সুদূরপরাহত কোনো একটা উপায়ে, ওকে আর ভালোবাসছেন না। তাহলে আমি—সেটা আমি গত কাল গত পরশুও ভেবেছিলাম নাস্তেনকা — তাহলে আমি এমনকিছু করতাম, অবশ্যই করতাম যাতে আপনি আমায় ভালোবাসেন, আপনি নিজেই তো বলছিলেন নাস্তেনকা যে আপনি আমায় প্রায় পুরো ভালোবেসে ফেলেছেন। কিন্তু তার পরে? মানে এইটুকুই প্রায় সবখানি যা আমি বলতে চাইছিলাম; শুধু এইটুকু বলা বাকি রইল যে একার যদি ভালোবাসেন, শুধু এইটুকু তার বেশি কিছু নয়! শুনুন বন্ধু আমার—কেননা হাজার হলেও আপনি তো আমার বন্ধু — শুনুন, আমি অবিশ্যি সাধারণ গরিব লোক, অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সেটা আসল কথা নয়, আমি কেমন যেন কিছুতেই ঠিক কথাটা বলতে পারছি না নাস্তেনকা, আমার সব এলোমেলো হয়ে গেছে বলে, শুধু আপনাকে আমি এত ভালোবাসতাম, এত ভালোবাসতাম যে আপনি যদি ওকে, যাকে আমি চিনি না, তাকে তখনো ভালোবাসতেন, তখনো ভালোবেসে যেতেন তাহলেও খেয়াল হত না যে আমার ভালোবাসা আপনার পক্ষে কোনো একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু আপনি যদি টের পেতেন, প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতেন যে আপনার কাছেই স্পন্দিত হচ্ছে একটা কৃতজ্ঞ, একটা কৃতজ্ঞ হৃদয়, একটা আতপ্ত হৃদয়, যা আপনার জন্যে... ওহ্ নাস্তেনকা, নাস্তেনকা! কী যে আপনি করলেন আমার!..'

বেঞ্চি থেকে ক্ষিপ্র ওঠে নাস্তেনকা বললে, 'দোহাই, কাঁদবেন না, আপনি কাঁদছেন, এ আমি চাই না। উঠুন, চলুন আমার সঙ্গে,' নিজের রুমাল দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সে বললে,

'নিন, এবার চলুন; হয়ত আপনাকে কিছু বলব আমি। ...এখন যখন ও আমায় ফেলে রাখল, আমার কথা যখন ভুলে গেল যদিও এখনো ওকে আমি ভালোবাসি (আপনাকে মিথ্যে বলতে চাই না)... কিন্তু শুনুন, আমার কথাটার জবাব দিন। ধরুন, আমি যদি আপনার প্রেমে পড়ি, মানে যদি শুধু এমনি-এমনি... ওহ্, বন্ধু আমার! কী যে আমার মনে হয় যখন ভাবি আপনাকে কী অপমান-ই না করেছি যখন হেসে উঠেছিলাম আপনার প্রেমের কথায়, আপনি যে প্রেমে পড়েন নি তার জন্যে তারিফ করেছিলাম আপনার, কী যে আমার তখন মনে হয়!.. ভগবান! কেমন করে যে এটা আমি আগে থেকে দেখতে পাই নি, দেখতে পাই নি, কী বোকাই-না ছিলাম, কিন্তু... যাক গে, ঠিক করেছি সব বলব...'

'শুনুন নাস্তেনকা, কী জানেন? আমি চলে যাব আপনার কাছ থেকে, এই হল কথা! স্রেফ আপনাকে শুধু কষ্ট দেওয়া হবে। এই তো আমাকে উপহাস করেছেন বলে আপনার বিবেকদংশন শুরু হয়েছে, কিন্তু আমি চাই না, আমি চাই না যে আপনি আপনার নিজের দুঃখটা ছাড়া... অবশ্যই আমার দোষ নাস্তেনকা, কিন্তু বিদায়!'

'দাঁড়ান, আমার কথাটা শুনুন: অপেক্ষা করে থাকতে পারবেন আপনি?'

'কিসের অপেক্ষা?'

'আমি ওকে ভালোবাসি; কিন্তু ওটা কেটে যাবে, কেটে যেতেই হবে, কেটে না গিয়ে পারে না, এখনই তো কেটে যেতে শুরু করেছে, সে আমি টের পাচ্ছি। ...কে জানে, হয়ত আজই সব চুকে যাবে, কারণ ওর ওপর আমার ঘৃণা হচ্ছে, কারণ ও আমাকে নিয়ে হেসেছে যেক্ষেত্রে আপনি এখানে কেঁদেছেন আমার সঙ্গে, কারণ ওর মতো আপনি প্রত্যাখ্যান করতেন না আমায়, কারণ আপনি আমায় ভালোবাসেন কিন্তু ও ভালোবাসে না, কারণ শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই ভালোবাসব আপনাকে... হ্যাঁ, ভালোবাসি! ভালোবাসি যেমন আপনি আমায় ভালোবাসেন; আমি তো নিজেই সেটা আগেই বলেছি আপনাকে, আপনি নিজেই শুনেছেন — ভালোবাসি কারণ আপনি ওর চেয়ে ভালো, কারণ আপনি ওর চেয়ে মহৎ, কারণ কারণ ও...'

বেচারির উত্তেজনাটা হয়েছিল এত প্রবল যে কথাটা সে শেষ করতে পারল না, আমার কাঁধে, পরে আমার বুকে মাথা দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আমি সান্ত্বনা দিলাম ওকে, বোঝালাম, কিন্তু থাকতে পারল না সে; ক্রমাগত সে চাপ দিচ্ছিল আমার হাতে আর ফোঁপানির মাঝে মাঝে বলছিল: 'দাঁড়ান, দাঁড়ান; এই এক্ষুনি থেমে যাবে! আমি আপনাকে বলতে চাইছিলাম... ভাববেন না যে কান্না এটা... ওটা দুর্বলতার দরুন, দাঁড়ান, এক্ষুনি কেটে যাবে...' অবশেষে ও কান্না থামিয়ে চোখ মুছল, ফের চলতে লাগলাম আমরা। আমি কথা কইতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ও আরো বহুক্ষণ ধরে আমায় সবুর করতে বলছিল। চুপ করে রইলাম আমরা। ...অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে বলতে লাগল...

'শুনুন,' শুরু করল সে ক্ষীণ কাঁপা কাঁপা গলায় কিন্তু হঠাৎ তাতে কী-একটা বেজে উঠল যা সোজা গিয়ে বিঁধল আমার বুকে, মধুর একটা বেদনায় টনটন করতে থাকল সেখানে, 'ভাববেন না আমি ভারি অস্থিরমতি, লঘুচিত্ত, ভাববেন না যে আমি অত অনায়াসে ভুলে যেতে, ত্যাগ করতে পারি।... সারা বছর আমি ভালোবেসেছি ওকে, ভগবানের দিব্যি, কখনোই, কখনোই এমনকি মনের গহনেও ওর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনীর মতো কিছু করি নি। ও সেটাকে অবজ্ঞা করেছে। হেসেছে আমাকে নিয়ে — ভগবান দেখবেন ওকে! কিন্তু ও আমাকে দাগা দিয়েছে, অবমাননা করেছে আমার হৃদয়ের। আমি — আমি ভালোবাসি না ওকে, কেননা আমি তাকেই ভালোবাসতে পারি যে উদারহৃদয়, আমায় বোঝে, যে উন্নতমনা; কেননা আমি নিজেই সেইরকম, ও আমার যোগ্য নয় — কিন্তু যাক গে! ভগবান ওকে দেখুন! নিজের প্রত্যাশায় পরে কখনো প্রতারিত হওয়ার চেয়ে, কেমনধারা ও লোক সেটা পরে কখনো জানার চেয়ে এ বরং ও ভালোই করল। ...হ্যাঁ, ঠিকই! কিন্তু কে জানে বন্ধু আমার,' আমার হাতে চাপ দিয়ে সে বলে চলল, 'কে জানে আমার এই গোটা প্রেমটাই হয়ত আবেগের, কল্পনার একটা ছলনা, হয়ত তা শুরু হয়েছে দুরন্তপনা আর আজেবাজে ব্যাপার থেকে, ঠাকুমার শাসনে ছিলাম বলে? হয়ত আমার ভালোবাসা উচিত ওকে নয়, আর কাউকে, যার মমতা হবে এবং, এবং... কিন্তু থাক গে, থাক গে ওকথা,' উত্তেজনায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে নাস্তেনকা কথাটা থামিয়ে দিলে, 'আমি আপনাকে শুধু বলতে চাইছিলাম... বলতে চাইছিলাম যে আমি যে ওকে ভালোবাসি (না, না, ভালোবাসতাম) তা সত্ত্বেও, আপনি যদি পরে আরেকবার বলেন যে... আপনি যদি অনুভব করেন যে আপনার

প্রেম এতই বড়ো যে আমার হৃদয় থেকে অবশেষে অতীতকে আপনি উপড়ে ফেলতে পারেন... যদি আপনার মায়া হয় আমার ওপর, বিনা সান্ত্বনায়, বিনা আশায় একাকী আমাকে যদি আমার ভাগ্যের হাতে ফেলে রাখতে না চান, আপনি যদি চান যে এখন আমায় যেমন ভালোবাসছেন চিরকাল তেমনি করেই আমায় ভালোবেসে যাবেন, তাহলে শপথ করছি যে কৃতজ্ঞতা... আমার ভালোবাসা অবশেষে আপনার ভালোবাসার যোগ্য হবে। ...এবার আমার হাত নেবেন কি?'

ফোঁপানির দমকে রুদ্ধশ্বাসে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'নাস্তেনকা, নাস্তেনকা!.. ওহ্ নাস্তেনকা!..'

নিজের ওপর কোনোক্রমে জোর খাটিয়ে সে বলে যেতে লাগল, 'নিন, হয়েছে, হয়েছে! এবার সবই তো হয়ে গেল! মানে যা বলবার সব এবার বলা গেছে; তাই না? তাই? মানে, আপনিও সুখী, আমিও সুখী; এ নিয়ে আর একটি কথাও নয়; সবুর করুন, কৃপা করুন আমায়। ...দোহাই ভগবান, অন্যকিছু একটা বলুন!..'

'হ্যাঁ নাস্তেনকা, হ্যাঁ! এবার আমি সুখী, আমি... কিন্তু নাস্তেনকা, অন্য বিষয়ে কথা কইব, শিগগিরই বলব; হ্যাঁ, আমি তৈরি...'

কিন্তু আমরা ভেবে পেলাম না কী বলি, হাসলাম আমরা, কাঁদলাম, অসংলগ্ন অর্থহীন কথা বললাম হাজার হাজার; কখনো হাঁটছিলাম ফুটপাথ দিয়ে, কখনো আবার ফিরে আসছিলাম, পেরিয়ে যেতে গেলাম রাস্তা, তারপর থেমে গিয়ে আবার ফিরে এলাম নদীতীরে; আমরা হয়ে গিয়েছিলাম শিশুর মতো...

আমি বললাম, 'নাস্তেনকা, আমি এখন থাকি একা, কিন্তু কাল... তবে অবিশ্যি জানেনই তো নাস্তেনকা, আমি গরিব, আমার মোট সম্বল কেবল বারোশ', কিন্তু ওটা কিছু নয়...'

'বটেই তো ওটা কিছু নয়, পেনশন পান ঠাকুমা, আমাদের তিনি অসুবিধায় ফেলবেন না। ঠাকুমাকে সঙ্গে নিতে হবে।'

'অবশ্যই নিতে হবে ঠাকুমাকে... কিন্তু ঐ মাত্রিওনা...'

'ও হ্যাঁ, আমাদেরও তো রয়েছে ফেকলা!'

'মাত্রিওনা ভালো লোক, শুধু একটা তার খুঁত: কল্পনাশক্তি ওর নেই নাস্তেনকা, একেবারেই নেই; কিন্তু ওটা কিছু নয়!..'

'তাহলেও দুজনেই ওরা আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে; শুধু আপনি কাল উঠে আসুন আমাদের ওখানে।'

'সেকি? আপনাদের কাছে! বেশ আমি রাজি...'

'হ্যাঁ, আপনি ভাড়া নেবেন। আমাদের ওপরে একটা আধতলা-ঘর আছে, সেটা খালি; ভাড়াটে ছিল, বুড়ি, খানদানী, চলে গেছে আর আমি জানি যে ঠাকুমা যুবক কাউকে নিতে চান। আমি বলেছিলাম, 'যুবক কেন ঠাকুমা?' উনি বললেন, 'এমনি, আমি তো বুড়ি, শুধু ভাবিস না নাস্তেনকা আমি তোর বিয়ের ঘটকালী করতে চাইছি।' আমারও বুঝতে বাকি রইল না, ওটা ওই জন্যেই...'

'আহ্ নাস্তেনকা!..'

দুজনেই হেসে উঠলাম আমরা।

'নিন, হয়েছে, হয়েছে। কিন্তু কোথায় আপনি থাকেন? ভুলেই গেছি।'

'ওইখানে, ওই সাঁকোটার কাছে, বারান্নিকভদের বাড়িতে।'

'সেই বড়োমতো বাড়িটা?'

'হ্যাঁ, বেশ বড়ো।'

'হ্যাঁ, জানি বেশ ভালোই বাড়িখানা। তাহলেও শুনুন, ও বাড়িটা ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে আসুন আমাদের কাছে...'

'কালই নাস্তেনকা, কালই; ফ্ল্যাটের জন্যে আমার কাছে ওদের কিছু পাওনা আছে, তবে সেটা কিছু নয়।... শিগগিরই বেতন পাব আমি...'

'আর জানেন, আমি হয়ত টিউশানি করব, নিজেও পড়ব, টিউশানিও করা যাবে...'

'বাঃ, চমৎকার... আমিও নাস্তেনকা, বোনাস পাব শিগগির...'

'তাহলে কালকে আপনি হচ্ছেন আমার ভাড়াটে...'

'হ্যাঁ, আর আমরা দেখতে যাব 'সেভেলিয়ার নাপিত', ফের তা দেখানো হবে শিগগিরই।'

হেসে নাস্তেনকা বললে, 'হ্যাঁ যাব, তবে না, 'নাপিত' নয়। বরং অন্যকিছু...'

'তা বেশ, অন্যকিছুই হবে, সেই বরং ভালো, অথচ আমি ভেবে দেখি নি...'

এইসব বলে আমরা দুজনেই হাঁটতে লাগলাম যেন একটা ঘোরের

মধ্যে, কুয়াশার ভেতর, যেন আমরা নিজেরাই জানি না কী আমাদের হচ্ছে। কখনো থামি, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলি অনেকখন, আবার হাঁটতে শুরু করি, ভগবান জানেন যাচ্ছি কোথায়, ফের হাসি, ফের চোখের জল।... হঠাৎ নাস্তেনকার ইচ্ছে হয় বাড়ি যাবার, তাকে আটকে রাখার সাহস পাই না আমি, বাড়ি পর্যন্ত পেঁৗছে দিতে চাই; রাস্তা ধরি আমরা, হঠাৎ পনের মিনিট বাদেই দেখি আমরা ফিরেছি নদীতীরে, আমাদের বেঞ্চিটার কাছে। কখনো সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, জল গড়ায় চোখ দিয়ে; আমি ভয় পাই, গা হিম হয়ে আসে... কিন্তু সে আমার হাতে চাপ দিয়ে টেনে নিয়ে যায় বেড়াতে, বকবক করতে, কথা কইতে...

শেষ পর্যন্ত নাস্তেনকা বললে, 'না, এবার আমার বাড়ি যাবার সময় হয়েছে; অনেক রাত হয়ে গেছে মনে হয়, খুব ছেলেমানুষি করা গেছে, আর না!'

'হ্যাঁ, নাস্তেনকা, শুধু এখন আর আমার ঘুম আসবে না, বাড়ি যাব না আমি।'

'আমারও মনে হয় ঘুম আসবে না; শুধু আমায় বাড়ি পেঁৗছে দিন...'

'অবশ্যই!'

'কিন্তু এখন তো আমরা নিশ্চয় বাড়ি পর্যন্ত যাব।'

'অবশ্যই-অবশ্যই...'

'সত্যি বলছেন?.. কেননা বাড়ি তো কখনো ফিরতেই হবে!'

হেসে বললাম, 'সত্যি বলছি।'

'তাহলে চলুন যাই!'

'চলুন।'

'আকাশটার দিকে চেয়ে দেখুন নাস্তেনকা, দেখুন, দেখুন! কাল দিনটা হবে অপরূপ; কী নীল আকাশ, কী চাঁদ! ঐ দেখুন, ঐ হলুদ মেঘটা এবার চাঁদকে ঢেকে দেবে, দেখুন, দেখুন!.. না, পাশ দিয়ে চলে গেল। দেখুন-না!..'

কিন্তু চাঁদ দেখছিল না নাস্তেনকা, নীরবে সে দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে। মিনিটখানেক বাদে সে কেমন যেন ভীরুর মতো নিবিড় হয়ে ঘেঁষে এল আমার কাছে। আমার হাতে খড়খড় করছিল ওর হাত। ওর দিকে চাইলাম আমি... ও আরো ঘন হয়ে ভর দিলে আমার দেহে।

এইসময় আমাদের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল একটি যুবক। হঠাৎ থেমে গেল সে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলে আমাদের, তারপর ফের এগিয়ে এল কয়েক পা। বুক আমার কেঁপে উঠল...

অস্ফুট স্বরে জিগ্যেস করলাম, 'নাস্তেনকা, কে ও নাস্তেনকা?'

'ও-ই!' ফিসফিসিয়ে জবাব দিল সে, আরো থরথরিয়ে সে ঘেঁষে এল... পায়ের ওপর প্রায় খাড়া থাকতে পারছিলাম না আমি।

'নাস্তেনকা! নাস্তেনকা! তুমি নাকি!' আমাদের পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর কানে এল, যুবকটি এইসময় আরো কয়েক পা এগুল আমাদের দিকে...

ভগবান, কী চিৎকার! কিভাবে কেঁপে উঠল নাস্তেনকা! কিভাবে আমার হাত ছাড়িয়ে ঝটপটিয়ে ছুটে গেল তার দিকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণহীনের মতো চেয়ে রইলাম ওদের দিকে। নাস্তেনকা কিন্তু ওকে হাতখানা দিতে না দিতেই, ওর আলিঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পড়তেই আবার হঠাৎ ফিরল আমার দিকে, ঝড়ের মতো, বিদ্যুতের মতো এসে দাঁড়াল আমার কাছে, আমি সচেতন হয়ে ওঠার আগেই দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে আমার গলা, সজোরে তপ্ত চুম্বন দিলে আমায়, তারপর একটা কথাও না বলে ছুটে গেল ওর কাছে, ওর হাত ধরে ওকে নিয়ে চলল নিজের সঙ্গে সঙ্গে।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকখন চেয়ে রইলাম ওদের দিকে। ...শেষে আমার দৃষ্টির অন্তরালে দুজনেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রভাত

আমার যামিনীগুলোর অবসান হয় প্রভাতে। দিনটা ছিল বিছছিরি। বৃষ্টি পড়ছিল, বিষণ্ণ টোকা দিচ্ছিল আমার শার্সিতে; ঘরটা ছিল অন্ধকার, বাইরেটা গোমড়া। মাথা ব্যথা করছিল, ঘুরছিল; জ্বর সেঁধচ্ছিল আমার দেহে।

'তোমার চিঠি গো, শহরের ডাকঘর থেকে পিয়ন দিয়ে গেল,' আমার দিকে ঝুঁকে মাত্রিওনা বললে।

'চিঠি! কার কাছ থেকে?' চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠলাম চেয়ার ছেড়ে।

'আমি তা জানি না গো, দেখ হয়ত লেখা আছে কার কাছ থেকে।'

সীলমোহর ভেঙে ফেললাম। এটা ওর কাছ থেকেই!

নাস্তেনকা আমায় লিখেছে: 'ওহ্, মাপ করবেন, মাপ করবেন আমায়, নতজানু হয়ে মিনতি করছি, মাপ করুন! আমি আপনাকেও আর আমাকেও প্রতারণা করেছি। ওটা ছিল একটা স্বপ্ন, একটা ছায়াভাস... আর আপনার জন্যে মন-কেমন করেছে আমার; ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আমায়!..

'আমার দোষ নেবেন না, কেননা আপনার কাছে আমি কোনো দিক থেকেই বদলে যাই নি; আমি চেয়েছিলাম যে আপনাকে ভালোবাসব, এখনো ভালোবাসছি, ভালোবাসার চেয়েও বেশি। হায় ভগবান! যদি আমি একসঙ্গেই ভালোবাসতে পারতাম আপনাদের দুজনকেই! হায়, আপনি যদি হতেন সে!'

আমার মাথায় ঝলক দিয়ে গেল, 'হায়, ও যদি হত আপনি!' তোমার কথাটাই আমার মনে পড়ে গেল!

'ভগবান দেখছেন এখন আমি আপনার জন্যে কী না করতে চাই! জানি আপনার ভারাক্রান্ত লাগছে, কষ্ট হচ্ছে। আপনার অপমান করেছি আমি, কিন্তু আপনি তো জানেন, যে আঘাত পেতে হয়েছিল, ভালোবাসলে সেটা কেউ মনে পুষে রাখে না। আর আপনি তো আমায় ভালোবাসেন!

'ধন্যবাদ জানাই! হ্যাঁ! ধন্যবাদ জানাই এই ভালোবাসার জন্যে। কেননা আমার স্মৃতিতে তা মুদ্রিত হয়ে গেছে একটা মধুর স্বপ্নের মতো, ঘুম ভাঙার পরেও যা মনে থাকে অনেকখন, কেননা সেই মুহূর্তটা আমি চিরকাল মনে রাখব যখন ভাইয়ের মতো নিজের অন্তরখানা আপনি মেলে ধরেছিলেন আমার কাছে, আর আমার ভাঙা বুকটা দান হিশেবে গ্রহণ করেছিলেন অমন মহাপ্রাণের মতো তাকে বাঁচিয়ে রাখতে, শুশ্রূষা করে সারিয়ে তোলার জন্যে। ...যদি আমায় ক্ষমা করেন তাহলে আপনার স্মৃতি আমার ভেতর সমুন্নত হয়ে থাকবে চির কৃতজ্ঞতায়, আমার অন্তর থেকে কখনো তা মুছে যাবে না। ...সে স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখব, বিশ্বস্ত থাকব তার প্রতি, তার অমর্যাদা করব না, নিজেকে ঠকাব না: এটি বড়োবেশি চিরকালীন। গতকালই তা ফিরে এসেছে তার কাছে যার যাবজ্জীবনের ধন এটি।

'দেখা হবে আমাদের, আপনি আসবেন আমাদের কাছে, আমাদের আপনি ত্যাগ করবেন না, আপনি থাকবেন আমার বরাবরের বন্ধু, ভাই। ...আর যখন আপনি আমায় দেখতে পাবেন, হাত বাড়িয়ে দেবেন আমার দিকে... তাই না? হাত বাড়িয়ে দেবেন, আপনি তো আমায় ক্ষমা করেছেন, সত্যি না? 'আগের মতোই' আপনি আমায় ভালোবাসেন?

'ওই, ভালোবাসুন আমায়, ফেলে রাখবেন না, কেননা এই মুহূর্তে আপনাকে কী ভালোই না বাসছি, কেননা আমি আপনার ভালোবাসা পাবার যোগ্য, ওটা আমার অর্জন... ওগো বন্ধু আমার! আগামী সপ্তাহে আমার বিয়ে হবে ওর সঙ্গে। ও ফিরেছে আমার প্রতি প্রেম নিয়েই, কখনো আমায় সে ভোলে নি। ...ওর সম্পর্কে এইকথা লিখলাম বলে রাগ আপনি করবেন না যেন। তবে আমরা দুজনেই আপনার কাছে আসতে চাই; আপনি ওকে ভালোবাসবেন, তাই না?..

'আমাদের ক্ষমা করবেন, মনে রাখুন আর ভালোবাসুন আপনার

নাস্তেনকাকে।'

চিঠিটা বারবার করে পড়লাম অনেকখন ধরে; চোখে জল আসতে চাইছিল। শেষ পর্যন্ত চিঠি খসে পড়ল হাত থেকে, আমি মুখ ঢাকলাম।

মাত্রিওনা শুরু করলে, 'যাদুমণি! ও যাদুমণি!'

'কী হল বুড়ি?'

'সিলিঙ থেকে মাকড়শার জাল সব ঝেড়ে ফেলেছি; এবার বিয়ে করলেই হয়, লোকজনকে নেমন্তন্ন করো, এই তো সময়...'

মাত্রিওনার দিকে তাকালাম। ...বুড়ি এখনো চাঙ্গা, 'নবীনা', কিন্তু কেন জানি হঠাৎ মনে হল চোখে তার স্তিমিত দৃষ্টি, মুখভরা বলিরেখা, কুঁজো হয়ে গেছে, স্থবিরা। ...কেন জানি মনে হল আমার এই ঘরখানা বুড়ির মতোই বুড়িয়ে গেছে, রং চটে গেছে দেয়াল আর মেঝের, নিষ্প্রভ হয়ে গেছে সবকিছু; মাকড়শার বংশবৃদ্ধি হয়েছে আরো বেশি। জানি না কেন, যখন জানলা দিয়ে তাকালাম, মনে হল যেন সামনের বাড়িটাও থুত্থুড়ে আর ম্যাড়মেড়ে মেরে গেছে, খসে খসে পড়ছে থামের পলেস্তারা, কার্নিস কালচে

হয়ে ফেটে ফেটে গেছে আর জবলজবলে গাঢ় হলুদ রঙের দেয়ালগুলো হয়ে পড়েছে ছোপ-ধরা...

হয়, কালো মেঘের আড়াল থেকে হঠাৎ উঁকি দিয়ে রোদ আবার চাপা পড়েছিল জলদের তলে, আর ফের সবকিছু নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল আমার চোখে; কিংবা হয়ত ভারি নিরানন্দ, বিষণ্ণ হয়ে আমার সামনে ভেসে উঠেছিল আমার ভবিষ্যতের গোটা পরিপ্রেক্ষিত আর নিজেকে আমি ঠিক সেই মূর্তিতে দেখতে পেয়েছিলাম যা আমি হয়েছি আজকে ঠিক পনের বছর পরে, ওই ঘরখানাতেই বুড়িয়ে গেছি, আছি তেমনি একাকী, সেই মাত্রিওনার সঙ্গেই, এতগুলো বছরের মধ্যেও যার জ্ঞানগম্যি কিছু বাড়ে নি।

তাই বলে কি আঘাত মনে রাখি নাস্তেনকা! তাই বলে কি তোমার ঝলমলে নিশ্চিন্ত সুখের ওপর কালো মেঘ ডেকে আনব, তিক্ত ধিক্কার দিয়ে তোমার মন কষ্টে ভরে দেব, গোপন দংশনে তা বিঁধব, পরমানন্দের মুহূর্তে স্পন্দিত করাব তা যন্ত্রণায়, তাই বলে কি ওর সঙ্গে বেদীর দিকে যাবার সময় তোমার কালো চুলের কুন্ডলে মেদুর যে ফুলগুলি গুঁজেছিলে তার অন্তত একটাকেও দলা-মোচড়া করব। ...ওহ, কখনো না! কখনো না! হ্যাঁ, তোমার আকাশ হবে নির্মেঘ, হ্যাঁ, তোমার মধুর হাসি উজ্জবল আর নিশ্চিন্ত, অন্য একটা নিংসঙ্গ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তুমি যে পরমানন্দ আর সুখের মুহূর্ত দান করেছ, তার জন্যে ঈশ্বর আশীর্বাদ বর্ষণ করবে তোমার ওপর!

ঈশ্বর! পরমানন্দের পুরো একটা মিনিট! মানুষের সারা জীবনের পক্ষেও এটা কি কম?..

বিশ্ববিশ্রুত ফিওদর দস্তয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১) সম্পর্কে মহান প্রলেতারীয় লেখক মাক্সিম গোর্কি বলেছিলেন যে তাঁর এমন সব লোকের সারিতে স্থান পাবার মতো প্রতিভা যাঁদের নাম — শেকস্পিয়র, দাঁতে, গ্যেটে, তলস্তয়।

'অভাজন' (১৮৪৫) আর 'শুক্লা যামিনী' (১৮৪৮) তরুণ দস্তয়েভস্কির প্রথম দিককার রচনা, তখনো তিনি জার আমলের কয়েদখাটুনি আর নির্বাসনে (১৮৪৯-১৮৫৯) পিষ্ট হন নি।

১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'মৃত্যুগৃহ থেকে নোট', উপন্যাস 'বঞ্চিত লাঞ্ছিত', বহু আখ্যান ও ছোটো গল্প, পরে বেরয় তাঁর সুবিদিত দার্শনিক-মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসগুলি: 'অপরাধ ও শাস্তি' (১৮৬৬), 'ইডিয়ট' (১৮৬৯), 'নাবালক' (১৮৭৫), 'কারামাজভ ভাইয়েরা' (১৮৮০) — এগুলিতে বিশ্বখ্যাতির অধিকারী হন লেখক।

দস্তয়েভস্কির সমস্ত রচনাতেই একটি অনিবার্য সাধারণ প্রসঙ্গ বিদ্যমান: মানুষের জন্যে, তার পঙ্গুকৃত জীবনের জন্যে বেদনা, বঞ্চিত ও লাঞ্ছিতদের দুঃখ-কষ্টের জন্যে ব্যথা। জার আমলের অভিশাপ থেকে সহৃদয়তা ও সত্যের প্রোজ্জ্বল জগতে উত্তরণের পথ খুঁজেছেন লেখক।

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো